ESSAYS IN BENGALI
VOL. III
BY
Swami Dharmananda Mahavarati.

Author of "Siddhanta Samudra" or a social history of Hindoo castes and subcastes (six volumes) ; "Banger Brahman Rajbansa" (A family History of Rajas and Maharajas) ; "Prabandhabali" or Essays in Bengali (Three volumes); "MooktaMadhab" (A devotional drama); "Mahisya-sidhanta" (Antiquities of Mahisya caste) ; "Yogi and His Message" (English); "Christianity and its relation to Pouranik Hindooism" (English); "Buddhism : A study". (English); and Translator of St. Paul's Epistle to the Hebrews from English and Greek.

Age quid agas ; Athanasius contra Mundane.

With a portrait of the author.

Calcutta—1907.

সূচী।

নির্ঘণ্ট।

"ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, কোন্ কোন্ পত্র বা পত্রিকার কোন্ কোন্ সংখ্যায় তাহা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কোন্ কোন্ স্থানে শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয় কর্ত্তৃক তাহা লিখিত হইয়াছিল, অনেক সাধু পুরুষের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।—এই সকল প্রবন্ধ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রবন্ধ প্রকাশের তারিখের সহিত লিখনের তারিখ বিভিন্ন।—প্রকাশক। ১। মাহাত্মশৈশা। ভারতী, পৌষ, ১৩০৮। (কলিকাতা, ইডেন গার্ডেন)। ২। অজহর। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৮। (আজিমগঞ্জ, রায় বাহাদুর সেতাবচাঁদের বাটী)। ৩। সম্পূর্ণ আদর্শ। সুধা। ১ম খণ্ড, ১ম সং। (লালবাগ, মোক্তার জগচ্চন্দ্র বাবুর বাটী।) ৪। শ্রীনাথদ্বার। ভারতী, মাঘ, ১৩০৯। আরাবল্লী পর্ব্বতোপরিস্থিত চিতোর দুর্গমধ্যে। ৫। দ্বিতীয়যুগের নবদ্বীপ। উৎসাহ। মাঘ। ১৩০৮। (নবদ্বীপ)। ৬। সংযম সামর্থ্য। উৎসাহ, চৈত্র, ১৩০৮। (ব্রহ্মপুত্র নদবক্ষে বাষ্পীয় তরণীর মধ্যে।) ৭। বাবা ব্রহ্মানন্দ। আরতি, ফাল্গুন, ১৩০৮। (মেদিনীপুর জেলান্তর্গত উত্তরমার্কণ্ডপুর গ্রাম।) ৮। ইটের বই। নব্যভারত, শ্রাবণ, ১৩০৮। (লালবাগ, জগচ্চন্দ্র বাবুর বাটী)। ৯। সাসারামের রোজা। সাহিত্য, মাঘ, ১৩০৮। রাণাঘাট। ১০। হিন্দুশব্দতত্ত্ব। ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৮। কলিকাতা, মহতাশ্রম। ১১। বউ কথা কও। বামাবোধিনী পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। (গোপগিরি, মেদিনীপুর)। ১২। পদচিহ্ন। সুধা। বৈশাখ, ১৩০৯। (দিকপাইত গ্রাম, ময়মনসিংহ)। ১৩। রেতীমায়ী। নবপ্রভা। ফাল্গুন, ১৩০৮। শ্রীরামপুর হস্পিটাল। ১৪। অদৃষ্ট খণ্ডন। সুধা, ১ম খ, ১ম সং। (মুর্শিদাবাদ।) ১৫। রাণীভবানীর পত্র। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩০৮। (কটকনগর। পুলিশইনেষপেক্টর অনঙ্গ বাবুর বাসা।) ১৬। বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। প্রবাসী। ভাদ্র, ১৩০৮। কালীঘাট, কলিকাতা। ১৭। শাক্ত ও বৈষ্ণব। সুধা। ১ম খ, ৩য় সংখ্যা। নবদ্বীপ। ১৮। ব্রহ্মশব্দ তত্ত্ব। সুধা। মাঘ। ১৩০৮। নবদ্বীপ। ১৯। কাশীদাসের সংস্কৃতাভিজ্ঞতা। ভারতী। শ্রাবণ, ১৩০৯। উত্তরমার্কণ্ডপুর

গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর। ২০। ফ্রেজারী বাবা। সমালোচনী। বৈশাখ ১৩০৯। তারকেশ্বর। ২১। ভাগবতের গ্রন্থকার। ভারতী, ভাদ্র, ১৩১০ কটকনগর, ব্রজসুন্দর বাবুর বাটী। ২২। নাগোর সমাধি। বীরভূমি। বৈশাখ, ১৩০৯। (কলিকাতা, ষ্ট্রাণ্ড রোড, বন্ধুবর মহেন্দ্র বাবুর আড়ত) ২৩। ফটিক জল। আরতি, পৌষ ১৩০৯; (বরিশাল। জমিদার বিহারী বাবুর বাটী) ২৪। মশালী মাতা; পন্থা, ফাল্গুন, ১৩০৮; চুচুড়া, গভর্ণমেণ্ট-হস্পিটাল ২৫। আদর্শ বৈষ্ণব; গৌড়ভূমি; চৈত্র ১৩০৮; (দিকপাইত গ্রাম; ময়মনসিংহ); ২৬। অদ্ভুত বৃক্ষ; বিশ্বজননী; বৈশাখ ১৩০৯; কলিকাতার নিমতলা ঘাটস্থ ৺আনন্দময়ীর মন্দিরে। ২৭। সতী শ্যামাসুন্দরী; সখি; পৌষ, ১৩০৮; মুর্শিদাবাদ। ২৮। আমাদের ভিতর ও বাহির; নব্যভারত অগ্রহায়ণ, ১৩১০; কালকাতা, অক্‌শফোর্ডমিশন প্রাসাদ। ২৯। মেওয়ার রাজ্য; নবপ্রভা; আষাঢ় ১৩০৯; উত্তরমার্কণ্ডপুর মেদিনীপুর জেলা; ৩০। হিন্দুর ভাবী দশা; ভারতী; ফাল্গুন ১৩০৮; গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর); ৩১। লুপ্ত হিন্দুরাজ্য; প্রবাসী; ভাদ্র; ১৩১০; ভিক্টোরিয়া হষ্টেল, হারিশন রোড কলিকাতা; ৩২। শারদীয় পূজা; আরতি; কার্ত্তিক ১৩০৯; পুরুলিয়া মোক্তার অরুণ বাবুর বাটী; ৩৩। ঈশ্রাইলের ইশা; ভারতসুহৃদ্। ফাল্গুন ১৩০৯; কলিকাতা, সেণ্টপল্‌স্ কেথিড্রেল উদ্যানে; ৩৪। লঙ্কাদ্বীপে; সুধা, ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা; (মুর্শিদাবাদ) ৩৫। গোঁসাইজির ছুঁচ; নব্যভারত; বৈশাখ, ১৩১১; y. m. c. A. অট্টালিকা,, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৩৬। কৈলাশপতি কপিশাঞ্জন; আরতি; শ্রাবণ ১৩০৯; কাশীধাম; ৩৭। অযোধ্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র; হিন্দুপত্রিকা; আশ্বিন; ১৩১০; সরযূতট, অযোধ্যা; ৩৮। কপালে আগুন; নব্যভারত; কার্ত্তিক; ১৩১০; অকস্‌ফোর্ডমিশন প্রাসাদ, কলিকাতা; ৩৯। মহামতি মহম্মদ; আলোচনা, আশ্বিন; ১৩০৯; পাণ্ডুয়ার সুপ্রাচীন ও সুবৃহৎ মশজীদাভ্যন্তরে; ৪০। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সুধা; ফাল্গুন ১৩০৮ সাল। নবদ্বীপ ৪১। চোখগেল; সুধা; জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯; বরিশাল, জমিদার বিহারী বাবুর বাটীর উদ্যান; ৪২। গদাই ঠাকুর; সমালোচনী; বৈশাখ ১৩১০। কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার তরুতলে। ৪৩। বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু; হিন্দুপত্রিকা পৌষ ১৩১২; কলিকাতা, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৪৪। উত্তরা খণ্ড; নব্যভারত; জ্যৈষ্ঠ ১৩১০; ভিক্‌টোরিয়া হোষ্টেল, কলিকাতা; ৪৫। বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ; ভারতী; আষাঢ় ১৩০৯;

গোয়ালন্দ, ৪৬। মশ্‌তান সা। উৎসাহ। আষাঢ় ১৩০৯। তারকেশ্বর। ৪৭। ওঁকার দ্বীপ; বামাবোধিনী পত্রিকা; অগ্রহায়ণ ১৩০৯; বালেশ্বর, রাজা বৈকুণ্ঠ নাথের প্রাসাদ; ৪৮। ইগাৎ পুরী; প্রকৃতি, ১৩০৯; মহতাশ্রম,কলিকাতা; ৪৯। শ্রীকৃষ্ণের নর দেহ; বান্ধব, পৌষ ১৩১২। কলিকাতা, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। ৫০। হেরড সাহেবের হাকিমি,নব্যভারত, ফাল্গুন,১৩১০ সাল। Y. M. C. A. Buildings,কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫১। মঙ্গলামাতা; পন্থা, আষাঢ় ১৩০৯। আজিমগঞ্জ, রায় বাহাদুর সেতাব চাঁদের বাটী। ৫২। পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ; নব্যভারত,আষাঢ়, ১৩১০। মিরট,কালী মন্দির। ৫৩। এক পেয়ালা মদ; প্রকৃতি; অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল; মহৎ আশ্রম, কলিকাতা; ৫৪। কুমারিকা অন্তরীপে; প্রবাসী; মাঘ, ১৩০৯ সাল; বীর-ভূম নগর; ৫৫। জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ; প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩০৯ সাল; মহতা-শ্রম, কলিকাতা; ৫৬। নবাব সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ; ভারতসুহৃদ, শ্রাবণ, ১৩০৯। কলিকাতা, ষ্ট্রাণ্ড রোড, মহেন্দ্র বাবুর আড়ত; ৫৭। দেওজি শর্ম্মা; ভারত সুহৃদ্ ভাদ্র ১৩০৯; গোরাবাজার, নফরদাস বাবু জমিদার মহাশয়ের বাটী; ৫৮। জুতা আর গুঁতা; নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩১০; কলিকাতা, অক্‌শফোর্ড মিশন হৌউশ; ৫৯। মকদুম জাঁহানীয়া; প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩১২ সাল; আগ্রার তাজমহলোদ্যান; ৬০। তমালবনের তরু; ভারতী ১৩১৩, মাঘ; কলি-কাতা, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, সেকেণ্ড লেন। ৬১। অজয়সর্দ্দার; ভারতী ১৩১৩, শ্রাবণ; রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৬২। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী; সাহিত্য-সংহিতা; শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল; সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৬৩। ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র গায়ত্রী; সাহিত্য-সংহিতা, ১৩১৩ সালের মাঘ; কলিকাতা, ক্লাইব ষ্ট্রীট, রায় বাহাদুর সেতাব বাবুর বাসাবাটী; ৬৪। কালীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়; নব্যভারত, ১৩১৩ চৈত্র; কানপুর জিলান্তর্গত বিঠুর রাজবাটী; ৬৫। বেলুচিমুলুক; বঙ্গদর্শন; চৈত্র ১৩০৯ সাল্; নরসিংহগড় রাজবাটী (চৈবাসা); ৬৬। বিবাহের ফলাফল, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩০৯ সাল; সাঁইতা জমিদারী কাছারী; ৬৭। রোঁয়াছেঁড়া পণ্ডিত; প্রদীপ, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ; বনবিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া জেলা); ৬৮। অশোক ও তুনতুন্; প্রদীপ ১৩১১ আশ্বিন; হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত

ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তকাবলীর তালিকা।

১। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" (১ম খণ্ড) মূল্য ১৷৷৹ টাকা, ডাকমাশুল এক আনা। ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, মূল্য ১টাকা, মাশুল এক আনা। ৩। ঐ তৃতীয় খণ্ড, মূল্য ও মাশুল ঐ। ৪। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। মূল্য মাশুল ঐ। ৫। মুক্ত মাধব (আধ্যাত্মিক নাটক) মূল্য আট আনা, মাশুল এক আনা। ৬। সিদ্ধান্ত সমুদ্র। এই বিরাট গ্রন্থ দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত। আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদয় হিন্দু জাতির প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে গোপ, সদ্গোপ, গন্ধবণিক এবং মাহিষ্য; দ্বিতীয় খণ্ডে সুবর্ণবণিক, তৃতীয় খণ্ডে বারুই, চতুর্থ খণ্ডে বৈদ্য, পঞ্চম খণ্ডে তিলি, তাম্বুলী, উগ্রক্ষত্রিয় ও ময়রা; এবং ষষ্ঠ খণ্ডে সাহা জাতির ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তম খণ্ড যন্ত্রস্থ, ইহাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির প্রকাণ্ড ইতিহাস মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ১৷৹ ২য় খণ্ড ৷৹ তৃতীয় খণ্ড ৷৹ চতুর্থ ঐ, পঞ্চম বার আনা, ষষ্ঠ আট আনা। (উপরোক্ত সমুদয় পুস্তক কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।)

৭। "Yogi and His message" মূল্য ৷৹ মাশুল এক আনা। মেশর্স থাকার স্পীঙ্ক এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা। ৮। "Christianity and its relation to Pouranic Hindooism" মূল্য ১৲ টাকা। ৯। "Buddhism: a Study." মূল্য ১৲ টাকা। ১০। মাহিষ্য সিদ্ধান্ত। (বিনামূল্যে বিতরিত) ১১। "ইব্রিয়দিগের প্রতি সাধু পৌলের পত্র"। (বিনামূল্যে বিতরিত)।

Swami Dharmananda Mahavarati.

বিশ্ব পর্য্যটক

শ্রীমৎ বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের (যুবাকালে

অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা।

a photo received from
ie in Australia.

KUNTALINE PRESS

ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।

তৃতীয় খণ্ড।

বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্যিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সত্যযুগে হিন্দুর একবিংশতি-হস্ত-পরিমিত দেহ এবং এক লক্ষ বর্ষ পরমায়ু ছিল। কাল-প্রভাবে কলুষাধিক্যবশতঃ, উত্তরোত্তর মানবদেহের স্থূলতা, শক্তি ও দৈর্ঘ্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পরমায়ুর পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-যুগত্রয়ে এবম্প্রকারে ক্রমান্বয়ে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্যবর্গ ক্ষীণদেহ এবং স্বল্পায়ু হইয়া গিয়াছে। য়িহুদী ও খ্রীষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্বুবর্ণযুগে (সত্যযুগে) অতীব দীর্ঘাকার এবং বহুবর্ষজীবী মানবের অস্তিত্বের কথা পাঠ করা যায়। পুরাতন সাহিত্য এবং প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি আমরা ইতি-হাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, অথবা ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া, যদি আমরা কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে উপনীত হই, তাহা হইলেও সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, হিন্দুর পরমায়ু ক্রমশঃ পরিমাণে হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দীর্ঘজীবন বা স্বল্পজীবন লইয়া আলো-চনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না; হিন্দুজাতির পরমায়ুর অবস্থা সম্বন্ধে আলো-চনা করাই আমার উদ্দেশ্য; অবান্তরভাবে খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শিক প্রভৃতির সহিত হিন্দুর তুলনা করিবার সময়ে, অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ অল্প বা অধিক পরিমাণে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুর পরমায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা গিয়াছে।

হিন্দুরাজত্বের অবসান হইলে, মুসলমানেরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। প্রায় সপ্তশতাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া যবনেরা ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালে বহুসংখ্যক সুলেখক ও চিন্তাশীল পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, অনেক গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। "তবকৎ-এ-

নসিরি” নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের চিন্তাশীল লেখক মোলানা মিন্-হাজ্-দ্দীন লিখিয়াছেন—“তুলনায় আমি দেখিতে পাই, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর পরমায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। হিন্দু ও ইশ্‌লাম, ইহারা উভয়েই একই দেশে এবং একই প্রকার প্রকৃতির জল ও বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া বাস করে, কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমানাপেক্ষা হিন্দু অধিক দিন বাঁচে। আমার বোধ হয়, মুসলমান গড়ে ৭৬ বৎসর বাঁচিলে, হিন্দুরা গড়ে ১০২ বর্ষ কাল বাঁচে।” আকবরের পণ্ডিতসভায় ফৈজী নামে এক প্রগাঢ় পণ্ডিত প্রধান সদস্য ছিলেন; ইনি ভারতবর্ষীয় যবনদিগের মধ্যে কালিদাস। ফৈজি মহাশয়, পারস্য, আরব্য, তুর্কী, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ভগবদ্‌গীতা এবং রামায়ণের পারস্য অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবরের মতে “মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর পরমায়ুর পরিমাণ অধিক।” ইনি লিখিয়াছেন—“হিন্দু ও মুসলমান ইহারা উভয়েই এক দেশের লোক এবং একই সম্রাটের অধীন। মুসলমান জাতি এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, ইহাদের কেহই সুরা পান করে না। ইশ্‌লাম মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষিক পদার্থসমূহ ভোজ্যরূপে ব্যবহার করে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাহা স্পর্শও করে না; সাধারণতঃ হিন্দুরা নিরামিষাশী, কিন্তু তথাপি তাহারা বিশেষ বুদ্ধিমান, নিরোগ ও দীর্ঘজীবী।” জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবল্ ফজল—তাঁহার “আইন আকবরি” গ্রন্থে লিখিয়াছেন “এদেশের সর্ব্বত্রই দেখা যায়, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা দীর্ঘজীবী। কেবল তাহাই নহে, মৃত্যুর সংখ্যাও হিন্দুর মধ্যে তুলনায় কম। মহামারীর সময়েও হিন্দুর মৃত্যুসংখ্যা অধিক হয় নাই। এক স্থানে সমান সংখ্যায় হিন্দু ও মুসলমান ছিল, কিন্তু সেখানে দেখা গিয়াছে, দশজন ইশলাম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, একজন হিন্দু মরিয়াছে। যেখানে হিন্দুর পরমায়ু গড়ে নব্বই, সেখানে মুসলমানের পরমায়ু গড়ে ৭৮ অপেক্ষা অধিক নহে।”

হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্বকালে, এদেশে সেন্সস্ (লোক-সংখ্যা) নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল না, সুতরাং সে সময়ে সেন্সস্ গৃহীত হয় নাই; তথাপি ইশ্‌লামের ভারতেতিহাসে ও অন্যবিধ গ্রন্থাদিতে তৎকালীয় রাজ্যের লোকসংখ্যার নমুনা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মুসলমান্-শাসনকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুদিগের পরমায়ুর পরিমাণ কি প্রকার ছিল, নানা উপায়ে তৎসম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিসম্বাদী না হইলেও এস্থলে সংযোজনা করিয়া দিলাম, ইহাতে

একটু নমুনা পাওয়া যাইতে পারে। এই তালিকা মুসলমানদিগের লিখিত ইতিহাস ও গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে।

স্থানভেদে হিন্দুর সম্প্রদায়।	গড়ে পরমায়ুর সংখ্যা।		
১। দার্‌উল্ সুল্‌তানতী হিন্দু (অর্থাৎ খাস্ দিল্লীবাসী হিন্দু)	৮৪ বর্ষ	৫। মাড়োয়ার	৬৮ বর্ষ
২। সহর—এ—আলা (আগ্রার হিন্দু)	৮১ ঐ	৬। সুবে বেল্‌গম	৬৭ ঐ
৩। ফতেগড় পরগণা	৮০ ঐ	৭। গুলবর্গা	৬৬ ঐ
৪। সেকেন্দ্রাবাদ	৭০ ঐ	৮। সুবে সোমালী (উত্তর প্রদেশ)	৬৪ ঐ
		৯। কানহাড়া (কর্ণাট্ট)	৬০ ঐ
		১০। কাশ্মীর	৫৭ ঐ
		১১। সুবেবাঙ্গলা (বঙ্গদেশ)	৫৪ ঐ
		১২। সুবে বেহার	৫৩ ঐ

মুসলমানদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ফরাসী পর্টুগিজ, দিনেমার, আইরীশ, ওলন্দাজ, মুর (১) প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষকে "বে-ওয়ারিশমালের মুলুক্" (২) ভাবিয়া পঙ্গপালের ন্যায় এদেশে আগমন করিয়াছিল। তাহারা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানবিহীন মনুষ্যের ন্যায়—দিক্ বিদিক বিচার না করিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত এদেশে সাময়িক শাসনস্থাপন ও লুণ্ঠন ক্রিয়ার অবতারণা করে। তদনন্তর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যের সূত্রপাত হয়। বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনসংগ্রহ করা, ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কোম্পানীর সময়েও যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিত। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা পাইলেই ইহারাও রাজ্য বিস্তার এবং শাসনস্থাপনের নামে প্রভূত অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত, এদেশ এক প্রকার অরাজক অবস্থায় পতিত ছিল। সেই সময়ে মহীশূর-লুণ্ঠন, কর্ণাট-লুণ্ঠন, ওয়ারেণ হেষ্টীংশ কর্ত্তৃক বিবিধ রাজবংশের অপমান ও সর্ব্বনাশ, বেহার ও বেনারসের উপদ্রব, বেল্লোর ও বারাকপুরের বিদ্রোহ, অম্বায়ানার সেনা-বিপ্লব, মুর্শীদাবাদের উৎপাত, নন্দকুমারের অন্যায় প্রাণদণ্ড, ক্লাইব কর্ত্তৃক ছলনা প্রভৃতি—অনেক নিরানন্দকর ঘটনায় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস

(১) আইরীশ ও মুরেরা এদেশের সাময়িক শাসনকর্ত্তা ছিল, একথা ইতিহাসে লিখিত আছে।

(২) অধিকারিহীন রাজ্য।

পরিপূর্ণ হয়। এই অশুভ কালে, আমরা ভারতবর্ষবাসী হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত অবস্থার সমাচার সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হই নাই। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, মহাজনদিগের (বৈশ্যবৃত্তি-অবলম্বী লোকের) অবস্থা তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অধিকতর দীর্ঘজীবী ছিল। তদনন্তর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃটীশসম্রাটের শাসন স্থাপিত হওয়ায়, আমরা আমাদের অবস্থা অনেক পরিমাণে তুলনায় বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। খ্রীষ্টীয় ১৮৬০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৯০১ পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের হিন্দুর পরমায়ুর পরিমাণ কি প্রকার দাঁড়াইয়াছে, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা বুঝা যাইতে পারে।

দেশভেদে হিন্দু	পরমায়ু গড়ে।
১। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালবার-উপকুলবাসী	৫০ বর্ষ
২। মহীশূর, কর্ণাট ও আর্কটনিবাসী	৪৪ ঐ
৩। দাক্ষিণাত্য	৪৬
৪। মহারাষ্ট্র-জাতি	৪৫
৫। গুজরাট, কাটিয়াবাড় ও কচ্ছদেশীয়	৪৬
৬। মেওয়ার ও মাড়োয়ারবাসী	৪৩
৭। মধ্যভারত ও [illegible]সী	৪৭
৮। মধ্যপ্রদেশীয়	৩৭
৯। উড়িষ্যাবাসী	৩৩
১০। আসামনিবাসী	৩০
১১। পাঞ্জাব প্রদেশীয়	৪৩
১২। সিন্ধুপ্রদেশীয়	৫৩
১৩। পশ্চিমোত্তর প্রদেশস্থ	৪১
১৪। বিহারবাসী	৪০
১৫। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী	৩৬

তালিকাটিকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান হিন্দুজাতির উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করি, তদ্‌যথা—

জাতি	বর্ষ গড়ে
১। মালয়ালী হিন্দু	৫০ বর্ষ গড়ে।
২। মাদ্রাজী	৪৬ „
২। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী (সমুদয়)	৪৭½ „
৪। রাজপুত	৪৩ „
৫। উড়িয়া	৩৩ „
৬। আসামী	৩০
৭। বেহারী	৪০
৮। পঞ্জাবী	৪৩
৯। হিন্দুস্থানী	৪১
১০। বাঙ্গালী	৩৬
১১। সিন্ধি	৫৩

উপরিউক্ত তালিকাপাঠে, পাঠক মহাশয়েরা একটা নবীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। এই সিদ্ধান্ত বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিতে পারে। ঐ তালিকায় বুঝা গেল, ভারতবর্ষীয় হিন্দুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী

সিন্ধু প্রদেশের হিন্দু; তাহার পরে ত্রিবাঙ্কুড়, কোচিন ও মালাবার উপকূলবাসী। তাহার পরে মালবা এবং তদনন্তর ক্রমান্বয়ে কর্ণাটী, মেওয়ারী, মাড়োয়ারী, কচ্ছী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, কাটিয়াবাড়ী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও বিহারী। বাঙ্গালী হিন্দু কেবল আসামী ও উড়িয়া হইতে অধিকতর দীর্ঘজীবী; তদ্ভিন্ন আর সমুদয় সম্প্রদায় হইতে স্বল্পজীবী। মধ্যপ্রদেশের হিন্দু, প্রায় বাঙ্গালীর সমতুল্য, কেবল সামান্ত অংশাধিক। বঙ্গবাসী হিন্দুর পরামায়ুর পরিমাণ দেখিলেন কি? বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু যে দিনে দিনে কমিয়া আসিতেছে, ইহা প্রামাণিক কথা এবং ধ্রুব সত্য। অনেকে বলিতে পারেন, বঙ্গদেপের লোকসংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক সংখ্যা হইতে অধিক, সুতরাং বাঙ্গালী সমাজে দীর্ঘজীবন থাকাই সম্ভব। যাঁহারা এইরূপ যুক্তি উথাপন করেন, সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য ম্যাল্‌থস্ সাহেব তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কথা কহিয়া নিরুত্তর করিয়া দিয়াছেন। (Malthus on Population দ্রষ্টব্য)। ম্যাল্‌থস্ সাহেব বলেন "পরিজ্ঞাত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা দেশের জনসংখ্যা হিসাব করিয়া দেখান যাইতে পারে, যে সমাজের লোকসংখ্যা অধিক, সে সমাজে যে দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যাও বহুল, ইহা সত্য নহে। দীর্ঘজীবন এবং লোকসংখ্যার বহুলতার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই।" অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীমৎ বকল্ সাহেব (Buckle's History of Civilisation গ্রন্থে) ম্যাল্‌থস্ সাহেবের ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নানা দেশের লোকসংখ্যা ও ঐ সংখ্যক লোকের আয়ুর পরিমাণ দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, দীর্ঘ বা স্বল্প আয়ুর সহিত লোকসংখ্যার অল্পতার বা বহুলতার সম্পর্ক নাই। এই উভয় সাহেবের কথা যে সমীচীন, তাহা স্বীকার করা যায়। নানা দেশে সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী ভ্রমণাবস্থায় আমি নিজে দেখিয়াছি এবং অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, উপরিউক্ত অভিমত সম্পূর্ণ সত্য ও সঙ্গত। মনে কর, এক ব্যক্তি অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিবাহিত হইল; বিংশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া, ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত এই ব্যক্তির একাদশটি অপত্য (সন্তানসন্ততি) জন্মিল, এবং তদন্তর ৩৯ বৎসর বয়সে এই ব্যক্তি ভবধাম হইতে চলিয়া গেল। ঐ গ্রামে আর এক ব্যক্তি ৪২ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া, ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক ৪৬ বৎসর বয়সে ভবলীলা সম্বরণ করিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সন্তান সন্ততির সংখ্যা অধিক বলিয়া কি সে দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছিল? উত্তর—না। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহা ব্যক্তি সম্বন্ধে

খাঁটে, তাহা জাতি সম্বন্ধেও খাঁটে। বংশীবদন ভট্টাচার্য্য ১০ বৎসর বয়সে, কৈলাসকামিনীকে বিবাহ করে, তখন শ্রীমতী কৈলাসের বয়স ৫ বৎসর মাত্র। বংশীবদনের ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৈলাসকামিনীর বয়স ১৩ বৎসর, এই সময় ইহাদের এক পুত্র জন্মিল। তদনন্তর দুই বৎসর অন্তর সন্তান বা সন্ততি জন্মিয়া, বংশীবদনের ৪০ বৎসর বয়সে, পুত্রকন্যার সংখ্যা আটটী হইল। এক-চল্লিশ বর্ষ বয়সে বংশীর মৃত্যু হইল। ঐ স্থানে একজন ইংরাজ বসতি করিত ;—সে ব্যক্তি ৩৬ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া, ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক পুত্র উৎপাদন করতঃ ৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই ব্যক্তির সন্তানের সংখ্যা মোটে একটি বলিয়া কি এব্যক্তি স্বল্পজীবী? তাহা নয়। বংশীবদনের পুত্রকন্যার সংখ্যা অধিক বলিয়া কি সে স্বল্পজীবী? তাহাও নহে। প্রকৃত কথা এই যে, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জন-সংখ্যা প্রভৃতির সহিত পরমায়ুর সম্পর্ক নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে সংখ্যায় কেহ পরাজিত করিতে পারিত না ; কারণ তুলনায় ভারতবর্ষের সমুদায় প্রদেশাপেক্ষা বঙ্গের লোকসংখ্যা অধিক। সমুদয় ভারতবাসীকে একত্রে দাঁড় করাইয়া দিলে দেখিবে, একজন বাঙ্গালী গড়ে ছয় জন ভারতবাসীর সমতুল্য। অথচ বঙ্গদেশে কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য নিয়মের কঠোরতা, জলবায়ুর দোষ, ম্যালেরিয়ার প্রবলতা প্রভৃতি যেমন আছে, অন্যদেশে তাহা নাই। তাহা হইলেই বুঝা গেল, পরমায়ু ক্ষীণ হইবার অন্য কোন বিশিষ্ট কারণ আছে। স্থূল কথায় বলা যায়, আমরা নিজে আমাদের যেরূপ শত্রু, প্রকৃতির কোমলতা বা কঠোরতা আমাদের উন্নতি বা অবনতির সেরূপ শত্রু নহে। যাহা হউক্, ইহা ধ্রুব সত্য যে, সত্য হইতে ত্রেতা এবং ত্রেতা হইতে দ্বাপর ও কলিযুগে—হিন্দুর পরমায়ুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়া আসিয়াছে। অন্যদিক্ দিয়া হিসাব করিলেও জানা যায়, হিন্দুরাজত্বে হিন্দুর যে পরমায়ু ছিল, মুসলমান্-শাসনে তাহা ছিল না ; ইংরাজের রাজত্বে তাহা অপেক্ষাও অল্প হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু এইরূপে ক্রমশঃ ক্ষীণায়ু হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গবাসী হিন্দুপুরুষের পরমায়ুর পরিমাণ আরও একটু পরিষ্কারভাবে দেখাইতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত তালিকায় এ বিষয় আরও পরিস্ফুট হইতে পারিবে।

বাঙ্গালী হিন্দু	পরমায়ুর পরিমাণ (গড়ে)	১১ বর্ষ কাল হইতে বিংশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত বয়স্ক লোক সমূহের
১ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে দশ বৎসর		১৫২ ঐ

বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যত বালক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের পরমায়ু গড়ে ৮ বৎসর
২১ হইতে ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ৩১½ ঐ
৩৬ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ৩০ ঐ
৫০ হইতে ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত ২৭ ঐ

উপরিউক্ত তালিকায় যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা এই ;—১ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যত লোক আছে, তাহারা গড়ে প্রত্যেকে কত বৎসর বাঁচে। অন্যান্য বর্ষীয় লোকদিগের সম্বন্ধেও ঐ হিসাবে পরমায়ু গড়ে গণিয়া লওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যু-সংখ্যা যদি হিসাব করা যায়, তাহা হইলে তালিকাটা এইরূপ হয় যথা—

(কেবল পুরুষের)—

বয়স	মৃত্যু-সংখ্যা (শতকরা)
১ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের লোক	৩২ জন
১৩ হইতে ২১ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমের লোক	২৯ জন
২২ হইতে ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের লোক	২৭ ঐ
৩৭ হইতে ৫৫ পর্য্যন্ত বয়সের লোক	৪৮ ঐ
৫৬ হইতে ৬৫ পর্য্যন্ত বয়সের লোক	৬১

বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রীলোকের মৃত্যু-সংখ্যা।

স্ত্রীলোক	শতকরা গড়ে
কুমারী (সাধারণতঃ)	১১ জন
বালবিধবা	১০
বয়স্কা বিধবা	৭
শিশুকন্যা	১৬
সধবা (যুবতী)	২৩
সধবা (বৃদ্ধা)	২১

এই তালিকায় যাহা বুঝা যায়, তাহাতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সধবা অপেক্ষা বিধবার এবং বিবাহিতার অপেক্ষা কুমারীর পরমায়ু অধিকতর দীর্ঘ।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুর পরমায়ু কিরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত তালিকায় কতকটা তাহা বুঝা যাইতে পারে।

জাতির নাম	পরমায়ু (গড়ে)
ইংরেজ	৫৮ বৎসর
ফরাসী	৫১ „
পর্টুগিজ	৭৫ „
আমেরিকান	৬১ „
জাপানী	৪৯ বৎসর
তিব্বতী	৯৮ „
তাতার	৭৮ „
আফগানিস্থান	৭০ „
আরব	৮০ „

ইটালীবাসী	৬২ বৎসর	মরক্কো	৮৮ বৎসর
মিশরবাসী (মুসলমান)	৬৮½ "	য়িহুদী	৪৬ "
তুর্কী (মুসলমান)	৬০ "	আর্ম্মেণী	৪০ "
পারস্যবাসী (মুসলমান)	৬৩ "	বুয়র	৬৮ "
জর্ম্মণি	৭৬ "	ভারতবাসী (হিন্দু)	৩৮¼ "
চীন	৯৬ "		

উপরিউক্ত তালিকায় বুঝা যায় খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর পরমায়ু কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমি মুসলমান ঐতিহাসিক-দিগের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, মোগল শাসনকালে মুসলমানা-পেক্ষা হিন্দুর পরমায়ু অধিক কালব্যাপী ছিল, কিন্তু এখন সে কথা আর খাটে না; বর্ত্তমান যুগে মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী। কেবল তাহাই নহে, নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ হিন্দু অপেক্ষা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে তদ্যথা।—

খ্রীষ্টান	(মোটে)—৬২ বৎসর		শিখ	ঐ	৪১ ঐ
বৌদ্ধ	ঐ	৮১ ঐ	জৈন	ঐ	৪৯ ঐ
মুসলমান	ঐ	৫৩ ঐ	হিন্দু	ঐ	৩৮½ ঐ

অনন্তর বর্ণাশ্রমানুসারে হিন্দুর পরমায়ু দেখুন নিম্নলিখিত তালিকায় বুঝিতে পারিবেন, শূদ্রের পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ব্রাহ্মণের পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা কম।

শূদ্র	(গড়ে পরমায়ু) ৪২ বৎসর	ক্ষত্রিয়	৩৭¼ ঐ
বৈশ্য	৩৯ বর্ষ	ব্রাহ্মণ	৩৫

ইহাতে আরও বুঝা গেল, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর পর-মায়ু অধিক। অনন্তর বিষয়কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে হিন্দুর জীবনের অল্পতা বা দীর্ঘতা অনুধাবন করুন। এই তালিকা কেবল বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

শিক্ষক	৩৫ বৎসর (গড়ে)	লেখক ও গ্রন্থকার	৩৯ বৎসর
উকিল ও মোক্তার	৪১ ঐ	বক্তা ও প্রচারক	৩৭ ঐ
কৃষক	৪৫ ঐ	দোকানদার	৪৭ ঐ
		গবাদিপালক (রাখাল)	৪৯ বর্ষ
চিকিৎসক	৪২ ঐ	কেরাণীবাবু	৩১½ ঐ
সম্বাদপত্র সম্পাদক	৪০ ঐ	ভিক্ষুক	৪৪ ঐ

অনন্তর বাঙ্গালী হিন্দুর জাতিভেদ অনুসারে পরমায়ুর হিসাবটা জানিয়া রাখা উচিত।

(গড়ে)		ব্রাহ্মণ	২৮¼ ঐ
গোয়ালা	৬১ বৎসর	কায়স্থ	৩২ ঐ
সদ্গোপ	৪৭ ঐ	বৈদ্য	৩০ ঐ
তাঁতি	৩৬ ঐ	কলু	৩৯ ঐ
দর্জ্জী	৩৮ ঐ	ধোবা	২৮ ঐ
বারুই	৪৯ ঐ	নাপিত	৪৬ ঐ
গন্ধবণিক	৫৭ ঐ	চাষাধোবা	৩১ ঐ
স্তুবর্ণবণিক	৪২ ঐ	মালাকার	৫৮ ঐ
মাহিষ্য	৪০ ঐ	দপ্তরী	৩১
ময়রা	৩৫ ঐ	বাগ্দী	৩৫
তিলি	৩৪ ঐ	ডম	৩৪
তাম্বুলী	৫৪ ঐ	মিস্ত্রি	৩৩½
যুগী	৫১ ঐ	সূত্রধর	৩৩½
কর্ম্মকার	৪৩ ঐ	চণ্ডাল	৪৪
স্বর্ণকার	৩৫ ঐ	কাঁসারী	৩৩½

এস্থলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতির একটু বিশেষভাবে পরমায়ু সম্বন্ধে তালিকা দেওয়া গেল ; তদ্যথা—

(গড়ে)		মড়ুইপোড়া ব্রাহ্মণ	৩৪
পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ	৩৮ বৎসর	বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ	৪৫
দাক্ষিণাত্য বৈদিক	৪২	রাঢ়ী ব্রাহ্মণ	৪৮
গৌড়াদ্য বৈদিক	৩৭½	উত্তররাঢ়ী কায়স্থ	৩৬
মধ্যস্থ ব্রাহ্মণ	৫১	দক্ষিণারাঢ়ী কায়স্থ	৪৩
ভাট, আচার্য্য ও অগ্রদানী	৪৬	বঙ্গজ কায়স্থ	৪০

বাঙ্গালী হিন্দু ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সীতে বাস করেন। প্রেসিডেন্সী বা বিভাগ অনুসারে ইঁহাদের পরমায়ুর অল্পতা বা দীর্ঘতা দেখুন।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ (গড়ে)	৪০ বৎসর	চট্টগ্রাম ঐ	৪১ ঐ
বর্দ্ধমান বিভাগ	৪৪ ঐ	রাজসাহী ঐ	৪৩ ঐ
ঢাকা ঐ	৩৯¼ ঐ		

ইহার পরে আর একটা প্রয়োজনীয় কথা বাকি আছে ধর্ম্মসম্প্রদায়

অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দু কিরূপ পরমায়ু লাভ করে, তাহাও দেখাইতে আকাঙ্ক্ষা করি।

শাক্ত	৫৪	নির্গ্রন্থী	৬০
শৈব	৬৮	কর্ত্তাভজা	৬৫
গাণপত্য। (বাঙ্গালায় নাই)—০		তান্ত্রিক	৩৯
সৌর (বাঙ্গালায় নাই)——০		উদাসী	৬২
বৈষ্ণব	৮৯ বর্ষ	নাস্তিক	৩১
সন্ন্যাসী	৭৪	দণ্ডী	৭০
পরমহংস	৯৯ বৎসর	অবধূত	৮০
ব্রহ্মচারী	৭৬	গোস্বামী	৭৮
অঘোড়ী	৫৮		

বলা বাহুল্য, গৃহী এবং অগৃহীর মধ্যে বৈষ্ণবের পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বীরাচারী, বামমার্গী, দক্ষিণাচারী, ভৈরবী—চক্রধারী প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পরমায়ু অল্প। বিবাহিতাপেক্ষা অবিবাহিতের জীবন দীর্ঘ; গৃহী অপেক্ষা অনিকেতন পুরুষের পরমায়ু অধিকতর। যোগী (প্রকৃত সাধক জনের) পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম।

বাঙ্গালী হিন্দু তুলনায় অন্যান্য দেশীয় হিন্দু অপেক্ষা স্বল্পজীবী। ইহার কারণ কি? এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নের একটা সদুত্তর হওয়া আবশ্যক। আমাদের আয়ুহীনতা নিশ্চয়ই আতঙ্কের বিষয় বলিতে হইবে; সুতরাং এতদ্বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত আবশ্যক। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। নগরবাসী অপেক্ষা পল্লীগ্রামবাসী অধিকতর দীর্ঘজীবী এবং সাহেব-সাজা ভ্রষ্ট-বাবু অপেক্ষা পিতা-পিতামহ-পিতৃপুরুষ প্রভৃতির প্রথাবলম্বী ধর্ম্মভীরু হিন্দুর জীবনকাল দীর্ঘ। ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষের এবং জাতীয় ভাববর্জ্জক যথেচ্ছাচারী লোকের পরমায়ু দিনে দিনে অল্প হইয়া যায়, ইহা ধ্রুবসত্য। স্বদেশ-শত্রু ব্যক্তির এবং নাস্তিক মনুষ্যের পরমায়ু মহাপাপীর আয়ুকাল অপেক্ষাও কম, ইহা ধ্রুব সত্য। সুরাপায়ী অপেক্ষা সুরা কর্ত্তৃক অদুষ্ট পুরুষ দীর্ঘজীবী এবং আমিষাশী হিন্দু অপেক্ষা নিরামিষাশী হিন্দুর আয়ুকাল অধিক। বৈদ্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালায় যশোহর জিলার বৈদ্য তুলনায় দীর্ঘজীবী। বণিকের মধ্যে গন্ধবণিকের পরমায়ু অধিক। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে গোয়ালা জাতির অধিকতম পরমায়ু। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের আয়ুকাল দীর্ঘতর। এস্থলে ইহাও

বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বী নিশ্চিন্ত পুরুষাপেক্ষা, পরাধীন ও দরিদ্র পুরুষ স্বল্পজীবী। জাতি সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। স্বাধীন জাতি পরাধীন জাতি অপেক্ষা অধিকতর সুখী, নিশ্চিন্ত এবং দীর্ঘজীবী। হিন্দুর তুল্য পরাধীন ও সর্ব্বস্বভ্রষ্ট জাতি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। সমুদয় পৃথ্বীমণ্ডলে আপনার বলিয়া দাবী বা গৌরব করিবার এক হস্ত পরিমিত ভূমিও হিন্দুর নাই। মুসলমানের দাসত্ব এবং ইংরাজের গোলামীতে অভ্যস্ত হইয়া হিন্দু একেবারে ক্ষীণায়ু হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের হিন্দু দরিদ্র, ক্ষীণতনু, ক্ষীণায়ু, সম্পূর্ণ পরাধীন এবং সতত ভীত। কেবল বিদেশীয় ভাব ও প্রথার অনুকরণে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া, হিন্দুজাতি একেবারে জাতীয়ত্ব ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে। ইংরাজের অধীন পার্শীক, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং অন্যান্য জাতিও ভারতে বাস করে, কিন্তু হিন্দুর মত কেহই এত দূর জাতীয়ত্ব হারায় নাই। আহারে, পরিচ্ছদে, চিন্তায়, জীবনযাপনক্রিয়ায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়, রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে, সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুজাতি বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ: হিন্দুর অবনতির ইহা মুখ্য কারণ। বাঙ্গালী হিন্দুতে এই সকল অমার্জ্জনীয় অপরাধ পূর্ণ ষোল আনা মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই অন্যান্য ক্ষীণজীবী হিন্দু অপেক্ষাও বাঙ্গালী হিন্দু আরও ক্ষীণজীবী।

বাঙ্গালীর কেরাণী বাবু সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পায়ুসম্পন্ন জীব। ইহাদের জীবনকে একটা অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখান যাইতে পারে, বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু হ্রাস হইবার কারণ কি। অন্নাভাবে শীর্ণ এবং চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ বাঙ্গালী কেরাণীর অবস্থা দেখিলে মনে হয়, যেন দাশরথী রায় পাঁচালিকার মহাশয় ইঁহাদের দুঃখেই দুঃখিত হইয়া গাহিতেছেন—

"তারা! কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল্।
প্রাতঃকালে উঠি, কত যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশী! জানিস্ কত ছল!"

উপবাসী বাঙ্গালী কেরাণী বাবুর অবস্থা ঠিক ঐরূপ। "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" এই উভয়-সঙ্কট অবস্থায় ইহারা পতিত। এইরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাঙ্গালী কেরাণীর পরমায়ু

হীনতার কারণ জানিতে পারিলে, সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু জাতির স্বল্পায়ু হইবার কারণ কতক পরিমাণে বুঝা যায়। আমি এক্ষণে তাহাই লইয়া কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

অসময়ে পুত্র জন্মিলে অথবা অসময়ে শস্যোৎপাদন হইলে যেমন সে পুত্র ও শস্য হীনবীর্য্য হয়, অসময়ে আহার, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, বিষয়কর্ম্ম ইত্যাদিতেও মানব দেহের স্ফূর্ত্তি, বিকাশ ও বীর্য্যহীনতা ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালী কেরাণী বাবুর শারীরিক অবস্থা যেরূপই থাকুক, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া আফিস্ গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। বাসায় বা ঘরে যাহা কিছু তৈয়ার হইতে পারে, তাহাই মুখে দিয়া, রেলগাড়ীতে, পদব্রজে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে তিনি আফিস্ অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়েন। আহারের পর একটু বিশ্রামের সময় থাকে না; আহারের পরেই রেল্ গাড়ীতে, শকটে অথবা পায়ে হাঁটার জন্য দেহের চাঞ্চল্য জন্মে এবং পাকস্থলী স্থির থাকে না; ইহাতে জীর্ণকারিণী শক্তির হীনতা জন্মিয়া যায়। তদনন্তর এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমস্ত দিন "হনুমন্ত পোষাক" পরিয়া আফিস্ গৃহে বসিয়া থাকিতে হয়; নিরানন্দদায়ক কার্য্যে প্রতিদিন একই প্রকার প্রথায় কলম চালাইতে হয়, এবং নানা কারণে দুশ্চিন্তায় সর্ব্ব সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আফিস্ ঘরে বহির্দ্দেশীয় নির্ম্মল বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। 'হনুমন্ত পোষাক' পরিধানের জন্য গায়ে স্বেদ জমিতে থাকে; গাত্রে নির্ম্মল বায়ুর স্পর্শ পর্য্যন্ত ঘটে না। পরিচ্ছদাদিতে স্বেদের মলিনতা ও দুর্গন্ধ অবশ্যই থাকিয়া যায়; সময় মত তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য ধোবাকে পয়সা দিবার যথেষ্ট ক্ষমতাও থাকে না। সমস্ত দিন প্রায় অর্দ্ধাশনে কাটিয়া যায়; সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যাহা আহার্য্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা দেহ, মন ও আত্মার পরিপুষ্টি জন্য যথেষ্ট নহে; কারণ কেরাণীর আয় অধিক নহে। দিবাকালে বিশ্রাম হয় না, দেহখানি বিছানার উপরে রাখিয়া অঙ্গ সমূহকে বিস্তার করার সুখ ও সুবিধা ঘটে না। রাত্রিকালে নিদ্রাতেও মনের শান্তি নাই, কারণ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা আফিস্ গমনে বিলম্ব হইলে ভয়ের কারণ থাকে। তদ্ভিন্ন আফিসের কার্য্যের কিছু গোলযোগ থাকিলে, রাত্রিতেও বাসায় বসিয়া কলম পিষিতে হয়। সময় মত আহার, বিশ্রাম, শয়ন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন, মল ও মূত্রত্যাগ, দেহ ও মনের শ্রান্তিদূর, ইত্যাদি কিছুই ঘটে না; অথচ আর্থিক অবস্থাও উন্নত নহে। এখন জিজ্ঞাসা করি, এরূপ লোকের দীর্ঘজীবন লাভ কি সম্ভব?

যে সকল কারণে মানুষের পরমায়ু ক্ষয় পায়, বাঙ্গালী কেরাণী বাবুতে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান।

তাহার পরে একবার বিলাতফেরৎ বাবুর দিকে চাহিয়া দেখুন, অথবা "অকারণে সাহেব-সাজা" এবং অনার্য্য ভাবসম্পন্ন ম্লেচ্ছপ্রকৃতির বাবুর দলের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। চব্বিশ ঘণ্টা চা,কাফি, চোকোলেট্, কোকো, লাইমেড্; মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত গরম পোষাক পরিধান, বিলাতী খানার ব্যবহার, যথেচ্ছাচারীর মত আহার ও বিহার এবং বিচরণ; ক্রমাগত উগ্রপাক মৎস্য, মাংস ও ডিম্বের বিবিধ প্রকার ভোজ্য ভক্ষণ, তীব্র সিগারেট, চুরুট, পাইপ, পাঁয়রুটি প্রভৃতির অনবরত ব্যবহার প্রভৃতিতে এই কঠোর মেজাজের লোকগুলা কি একটা অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এদিকে দয়া, ধর্ম্ম, কোমলতা, ঈশ্বরভীরুতা, স্বদেশপ্রীতি, আত্মীয়সম্ভাষণ, কুটুম্ব-প্রতিপালন, পরোপকার প্রভৃতির ত কথাই নাই! উগ্র স্বভাবে দিবা-রাত্রি উন্মত্ত! ইহা ভিন্ন ব্রাণ্ডি, রম্, আব্‌সাণ্ডে, জীণ্, হুইস্কী প্রভৃতির খুব চলন আছে; আর কুক্কুট, হংস, পারাবত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাহারও বদনান্তরে গো ও শূকরমাংস পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। বল দেখি, এতটা অত্যাচারে পরমায়ু কি দীর্ঘ হইতে পারে? ইংলণ্ড-ফেরত বাঙ্গালী বাবু যেমন অদ্ভুত জীব, পাঞ্জাব, বোম্বে বা মাদ্রাজের বিলাত-ফেরৎ লোক তাহার এক-চতুর্থাংশও অদ্ভুত নহে। বাঙ্গালার "ইংলণ্ড-ফেরৎ বাবু" সম্পূর্ণ অনার্য্য, সম্পূর্ণ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণ প্রকারে বিদেশীয় বিষে জর্জ্জরিত। ইহাদের সংসর্গও সুখ-কর নহে। দুই একজন কদাপি যে ভাল মানুষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় পিতা মাতার পুণ্যে অথবা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-বলে!

তাহার পরে আর একদিক দিয়া দেখুন। যাহারা বিলাত যায় নাই, বিলাতের মানচিত্র পর্য্যন্ত দেখে নাই বলিলেই হয়, তাহাদেরও অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন। ছেলেবেলা হইতে অকারণে চোখের জন্য চশ্‌মা ব্যবহার, বিলাতী উগ্রদন্তমঞ্জনে দন্ত পরিষ্কার, মস্তকে চব্বিশ ঘণ্টা বিলাতী তীব্র তৈল, এসেন্স, ব্রশ্ ও পশ্বাস্থিনির্ম্মিত চিরুণির ব্যবহার, দিবা-রাত্রি মোজা বা ষ্টকীংএর সহিত জুতা, সমস্ত রাত্রি কেরোসিন তৈলের ল্যাম্পের সহিত সখ্যতা, বিলাতী পোষাক, বিলাতী খানা, চা, কাফি, সিগারেট্, চুরুট ইত্যাদির ব্যবহার, মদিরা পান, আহার ও মৈথুনের সুনিয়ম ভঙ্গ, শাস্ত্রের অবমাননা, কুশিক্ষা, যথেচ্ছাচার-ভোজন প্রভৃতিতে পরমায়ু কি কখনও দীর্ঘ হওয়া সম্ভব?

তাহার পরে দেখুন, এদেশে অন্নাভাব ও অর্থাভাব। বাবুগিরি এবং বিলাসে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সমগ্র দেশবাসী নিত্য নিত্য অকারণে বিবিধ প্রকার অন্যায় অভাবের কল্পনায় চিন্তিত হইয়া আছে। লোকের বাবুগিরি বশতঃ demands বেশি, অথচ টাকা নাই। সময় মত বৃষ্টি হয় না, সময় মত শস্য হয় না, শস্যের পরিমাণও কম, সুতরাং লোক হীনবীর্য্য না হইবে কেন? তদ্ভিন্ন পুনঃ পুনঃ এতদ্দেশীয় শাস্ত্রবিহিত সুনিয়মসমূহ লঙ্ঘন করিয়া, প্রাচীন আর্য্য ও সনাতন প্রথা সমূহ অমান্য করিয়া বিদেশীয় ভাবে, দেহ, মন ও আত্মার ক্রমশঃ অবনতিই ঘটিতেছে। সমস্ত দেশ দরিদ্র, সমস্ত দেশ গোলামী প্রবৃত্তিতে উচ্ছৃঙ্খল, অথচ বিলাসের স্রোত খুব প্রবল! সকল বিষয়েই আমরা আমাদের প্রাচীন সুনিয়মসমূহ ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছি। সমগ্র দেশ পরাধীন, নানা কারণে লোকের মনে শান্তি, স্ফূর্ত্তি বা সুখ নাই। দেশের কিরূপ অবস্থা, তাহা বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় প্রণীত নিম্নলিখিত কবিতায় কতকটা বুঝা যায়—

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ?
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল, টেনা, ডোর-কপিন?
ছুঁচ্ সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।
দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হোয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ॥"

পাঠক মহাশয়! বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা বুঝিলেন ত? বাস্তবিকই ইহা নিতান্ত নিরানন্দ ও নিতান্ত নিরাশার কথা, কিন্তু তথাপি উপায় বা আশা নাই কি? আমরা যদি নিজে নিজে সংশোধিত হইবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে

ভরসা কোথায়? আমাদিগকে আমাদের নিজের অবস্থা বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, নতুবা উপায়ান্তর নাই। শ্রীমৎ-ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানমাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তুশত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

(গীতা। ৬অ। ৫।৬ শ্লোঃ)

তাহা হইলেই বুঝা গেল, নিজের চেষ্টায় আমাদিগকে আত্মোদ্ধার করিতে হইবে। নিজের উদ্ধারের চেষ্টা নিজে না করিলে উদ্ধারের উপায় নাই। অতএব ভাই! আইস, আমরা এক্ষণে আত্মনির্ভরী হইয়া, নিষ্কামভাবে, ঈশ্বর ও স্বদেশের দিকে চাহিয়া, এই মহাকল্যাণকর হিতব্রতে ব্রতী হইয়া মানবজীবন সার্থক করি। পরিশেষে ইহাও কহা কর্ত্তব্য যে, কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পাপ হইতে স্বতন্ত্র না হইলে, পরমায়ু দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই ঈশ্বরের কৃপা; যেখানে ঈশ্বর এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ত্তমান, সেইখানেই দীর্ঘ জীবন, সুখ, শান্তি, জয়, শ্রী, বিভব এবং পরিণামে মোক্ষ।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতি র্মম॥"

এই সংসারে আমাদের আশা ও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ (ভগবান), সুতরাং ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় ধর্ম্মভীরু, উৎসাহী, উদ্যোগী ও নির্ভীক হইতে হইবে।

বিগত একশত পঞ্চাশ বৎসর কাল মধ্যে, আমাদের দেশের ও জাতির যে কত প্রকারে অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া যদি বঙ্গদেশের অধিবাসীরা বোধগম্য করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজে বুঝিবেন যে, এবম্প্রকার অবনতির স্রোত ক্রমাগত যদি আরও সার্দ্ধৈকশত বর্ষকাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ও অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইতে বাঙ্গালী জাতি সম্পূর্ণ ভাবে উৎসন্ন যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, শারীরিক সামর্থ্য, মানসিক বল, মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা, আধ্যাত্মিক তেজ, জাতীয় ধনের পরিমাণ, কৃষি, বাণিজ্য,

ব্যবসায়, শিল্প, স্বাধীনবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সকল বিষয়েই বাঙ্গালী যেন অবনত ও অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি কেবল বঙ্গবাসী হিন্দুর পরমায়ু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, সুতরাং অন্য বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে প্রস্তাবের শীর্ষোক্ত বিষয়েরই অনুধাবনায় আবদ্ধ রহিলাম। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার পরমায়ুর অবস্থা শোকাবহ; দীর্ঘজীবী, দীর্ঘকায়, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবলদেহী ও শান্তমনা বাঙ্গালীর সংখ্যা বৎসর বৎসর কম হইয়া আসিতেছে। যে সকল কার্য্য দ্বারা দেহের সমুদয় ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের সম্পূর্ণ পরিচালনা হইতে পারে, সেই সমুদয় কার্য্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। মনের শান্তি, হৃদয়ের সরলতা ও আনন্দ এবং আত্মার উৎকর্ষবিধানকারী বিদ্যা ও অভ্যাস সমূহ আর নাই বলিলেই হয়। চাকুরী, গোলামী, অকারণে বিদেশীয় ভাবের পোষকতা, অপরিমিত ব্যয়, বিলাস, সৌখীনতা, অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা, অর্থাভাব, বিলাতী আচার ব্যবহার, অনাবশ্যক অভাব-বোধ, তামসিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গালী নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। যাহা হউক, ইহা ধ্রুব সত্য যে, সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী ক্রমে স্বল্পজীবী হইয়া আসিতেছে। নিম্নে কতকগুলি শ্রেণীর লোকের আয়ুর পরিমাণ দেখুন—

শ্রেণী	গড়ে পরমায়ু	শ্রেণী	গড়ে পরমায়ু
বাঙ্গালী জমিদার	৩১ বৎসর	বেকার (কর্ম্মহীন)	২৯৳
বাঙ্গালী প্রজা (নদীতীরবাসী মাত্র)	৪৫	মাঝি (নৌকাবাহক)	৪৭
শিক্ষক	৩৪	গোশকটচালক	৩৯
বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের লোক	৩৬½	চিত্রকর	৪৮
চাকরীজীবী	৩২	ব্যাধ (শিকারী)	৪০½

উপরোক্ত তালিকায় চাকুরে, বেকার, জমিদার এবং বঙ্গসাহিত্যের সেবক—এই কয়েক শ্রেণীর লোকের পরমায়ু তুলনায় আরও কম, ইহার কারণ যথাসময়ে ব্যাখ্যা করিব। নিম্নলিখিত তালিকায়, চাকুরে বাবুরা কোন্ কোন্ আফিসে কেরাণীগিরী করিয়া কিরূপে পরমায়ুর পরিমাণ কমাইতেছেন, তাহা অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করুন।

বিভাগের নাম	পরমায়ু (গড়ে)।	বিভাগের নাম	পরমায়ু (গড়ে)
পোষ্ট আফিশ	২৮	আবকারী	৪৯
পুলিশ	৩৫	মুন্সেফ ও সবজজ	৪২
		জেল বিভাগ	৪৪

ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের অফিশ	২৯$\frac{৩}{৫}$	দেওয়ানী আদালতের কেরাণী	৩৮
জমিদারী গোমস্তাগিরি	৪৯$\frac{১}{৪}$	জমিদারের দেওয়ান বা নায়েব	৫২
মুদ্রাযন্ত্রের কম্পোজিটর	৩১	দোকানের মুহুরী	৫৩$\frac{১}{২}$
রেজেষ্ট্রী বিভাগ	ঐ	টেলিগ্রাফ আফিশ	৩২$\frac{৩}{৫}$
বাজার সরকার	৫১	ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট	৪০$\frac{১}{২}$
কমিসেরীয়েট বিভাগ	৪৭	রেলওয়ে বিভাগ	৩৯$\frac{৩}{৪}$
সৈনিক (কেরাণী মাত্র)	৪৬$\frac{১}{২}$	পাটের কল অথবা অন্যবিধ কলের কারখানার লোক।	৩৮
ফৌজদারী আদালতের কেরাণী	৩৯		

নিম্নলিখিত তালিকায় আরও কয়েকটা বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙ্গালীর পরমায়ু পরিমাণ বুঝা যাইবে—

শ্রেণী	পরমায়ু (গড়ে)।	শ্রেণী	পরমায়ু (গড়ে)।
১। ভ্রমণকারী বাঙ্গালী (যথা বৈরাগী, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ইত্যাদি)	৬১ বর্ষ	৫। ফেরিওয়ালা	০
২। ভিখারী	৫৯$\frac{১}{২}$	৬। জমিদারের পাইক, গ্রামের চৌকিদার এবং বাবুর খানসামা	৫৩
৩। জাহাজের চাকুরে (গমনশীল জ, নৌকা, প্রভৃতির লোক)	৫৮	৭। গৃহস্থের চাকর ও চাকরাণী	৫২$\frac{১}{২}$
৪। দালাল	৫৭$\frac{৩}{৪}$	৮। ছাত্রাবস্থায় বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা	২৯

এবারে নিম্নে যে তালিকা দেওয়া যাইতেছে, তদ্দারা কোন্ প্রকার রোগে প্রত্যেক সহস্রে কত বাঙ্গালী মৃত্যু মুখে পতিত হয়,তাহা জানা যাইতে পারে।

রোগের নাম	প্রতি সহস্রে গড়ে মৃত্যু।	রোগের নাম	প্রতি সহস্রে গড়ে মৃত্যু।
জ্বর প্লীহা যকৃৎ	৩২$\frac{৩}{৫}$	স্বাস্থ্যকর আহারাভাবে দুর্ব্বলতা	১৯$\frac{৩}{৪}$
মাদক দ্রব্য সেবনে	ঐ	অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম	
হৃদ্‌রোগ	১৩$\frac{৩}{৫}$	উন্মত্ততা	
বহুমূত্র	৬$\frac{১}{২}$	ঘৃণিত রোগ	
স্নায়বিক দুর্ব্বলতা	১৯	উদরী ও অজীর্ণ	১৮$\frac{১}{২}$
দুর্ভিক্ষ	৪৩	পক্ষাঘাত	১$\frac{১}{২}$
বিসূচিকা ও মহামারী	১১	বাতব্যাধি	১
বসন্তরোগ	৪	ক্ষয় ও কাস রোগে	৩$\frac{৩}{৪}$

উপরি উল্লিখিত তালিকা সমূহে যে সকল বিষয়ের ও যে সকল সংখ্যার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া না বুঝাইলে, অনেক পাঠ-

কের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কঠিন হইবে বলিয়া বিবেচনা করি; এই জন্য এস্থলে ইহার একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলাম।

বাঙ্গালী জমিদার তালুকদার ও পত্তনিদারের পরমায়ু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে—শুনিয়া, অনেকে বিষাদিত হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু দেখি না। যে সকল তামসিক কারণে বাঙ্গালার জমিদারেরা নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাহা শত সহস্রাধিকবার অনেকের দ্বারা পরিষ্কার রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই অসুখদায়ক প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করা আমি অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। যে সকল ভূমিপগণ সাধারণ প্রকৃতির জমিদার হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিজের এবং স্বদেশ, স্বজাতি, স্বসমাজ ও প্রজাপুঞ্জের হিতে রত, আমি তাঁহাদিগের নাম এই তালিকাভুক্ত করি নাই। তাঁহারা পরমারাধ্য পরমেশ্বরের করুণায় মহত্তর ব্রতে ব্রতী থাকিয়া, সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন পূর্ব্বক ইহকাল ও পরকালের পথ উজ্জ্বল করুন; ভগবানের সমীপে আমার ইহাই সবিনয় প্রার্থনা।

কেরাণী কুলের পরমায়ুর পরিমাণ হ্রাস হইবার শতাধিক কারণ বর্ত্তমান। স্বল্প বেতন, যথোচিত আহার্য্যের অভাব, অতিরিক্ত খাটুনী, অফিসগৃহে উপযুক্ত বায়ুর অল্পতা, চিন্তা, নিয়ত অভাব, ভয়, অপমান, মনঃকষ্ট প্রভৃতি প্রভৃতি বহুবিধ হেতু বিদ্যমান দেখা যায়। কেরাণীর রীতিমত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, দেহরক্ষার যত্ন, মস্তিষ্ক বা মানসিক উন্নতি, ভগবৎ-আলোচনার অবকাশ, এই সকল প্রায়ই হয় না। পোষ্টাফিশ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্-অফিশ প্রভৃতি স্থানের বাবুদিগের সর্ব্বদাই এই অসুখজনক অভিযোগ শুত, এবং অনুন্নত অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাছে অফিশ যাইতে বিলম্ব হয়, এজন্য যামিনী বিগত না হইতেই শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নান ও আহারের প্রয়োজন, এবং যে সময়টা শাস্ত্রমতে ভোজনের সময় নহে, সে সময়ে আহার করিয়া পদব্রজে, অশ্বযানে অথবা ট্রামে কিম্বা ট্রেণে বাবুদিগকে যাতায়াত করিতে হয়। আহারের পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা এতদ্দেশীয় জলবায়ু অনুসারে বিধেয়, ভোজনের পরেই সর্ব্বশরীর সরস হয়, সুতরাং এবম্প্রকার শারীরিক গতি সর্ব্ববিধায় অবৈধ।

বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা লেখক, গ্রন্থকার, সম্পাদক প্রভৃতি রূপে দর্শন দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় উচ্চপদস্থ এবং উচ্চবেতনভোগী, তাঁহাদের অবস্থা উন্নত থাকে বটে,

কিন্তু যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা অথবা কেবল সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৮ জন দরিদ্র অথবা নিয়ত অভাবের সহচর।

এ দেশে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের অবস্থা দিনে দিনে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা বলেন, তরুণ ছাত্রদিগকে ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের কু-প্রথানুসারে অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তজ্জন্য মন ও মস্তিষ্ক এবং দেহ প্রকৃতাবস্থায় থাকে না; তাঁহাদের উক্তি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সেকালে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে, হিন্দুছাত্রগণ বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, বিশেষতঃ রঘুনাথের "দীধিতি"র ন্যায় ভয়ানক কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কখন চোখে চশমা দেয় নাই, চা বা কাফি খায় নাই, পোলাও কালিয়া কোর্ম্মা প্রভৃতি ভোজন করে নাই; অথচ তেমন উন্নত মন, উর্ব্বর মস্তিষ্ক এবং দেবোচিত স্বভাব, এখনকার ছেলেদের একশতের মধ্যে এক জনেরও আছে কি না সন্দেহ। ক্রমাগত বিদেশীয় ভাবে দেহ ও মনকে জর্জ্জরিত করিয়া, বিদেশীয় আহার, পরিচ্ছদ, ভোজন-প্রথা, বিদেশীয় তামসিক আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মহীনতা, ভক্তিহীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতিতে বাঙ্গালী ছাত্র নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই সকল কুপ্রথা ও কুভাব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়া, বাঙ্গালীকে উৎসন্নের সাগরে লইয়া যায়। বাঙ্গালী ছাত্রের পরমায়ু হ্রাস হইয়া যাইতেছে। পাঠ্যাবস্থায় অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। জেলবিভাগ ও পুলিস-বিভাগের বাঙ্গালীর অবস্থা প্রায় ছাত্রসমতুল্য। হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, বেহারী বা অপর জাতীয় লোকদিগের মধ্যে, যাহারা বঙ্গদেশে জেল-বিভাগ বা পুলীশ বিভাগে কার্য্য করে, তাহাদের পরমায়ু ও স্বাস্থ্য বাঙ্গালীর অপেক্ষা ভাল। বাঙ্গালী পুলীশ ইনেষপেক্টরাপেক্ষা হিন্দুস্থানী কনষ্টবল অধিকতর সবল ও সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী। জেলখানা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তামসিকতা ও ম্লেচ্ছাচার, সকল স্থানেই বাঙ্গালীকে উৎসন্নাবস্থায় লইয়া যাই-তেছে। মুদ্রাযন্ত্রের কম্পোজিটরগণের বেতন অল্প, অথচ চক্ষুর ব্যবহার অত্যন্ত অধিক; নানা কারণে বাঙ্গালী কম্পোজিটরের চক্ষু শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া যায়। দরিদ্র কম্পোজিটরের পরমায়ু গড়ে ৩০ বৎসর মাত্র।

বাঙ্গালাদেশ ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত। বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পায়। ভাদ্র হইতে পৌষের অৰ্দ্ধেক দিবস পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রবলতা দেখা যায়। এই সময়ে অনেক লোক মরে। জ্বর, প্লীহা ও যকৃত বঙ্গবাসীর

ঘরের বিশিষ্ট শত্রু। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতিতে অল্প লোক মরে না। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের, এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবের কুফল। উপযুক্ত পুষ্টিকর আহারের অভাবেও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্মে। স্বাস্থ্যকর আহার্য্যাভাবেও অনেক বাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগ প্রায় সকল ঘরেই আছে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এ দেশের অনেক বড় বড় লোক বহুমূত্র রোগে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কতকগুলি ঘৃণিত রোগ বাঙ্গালীর প্রায়ই সহচর। শতকরা প্রায় ৪৭ জন বঙ্গবাসী ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগকে পোষণ করেন। শতকরা প্রায় ২৭ জন মেহ-রোগভোগী, এবং শতকরা প্রায় দুই জন অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত।

যাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালাদেশে কন্যা ও পুত্রের জন্মসংখ্যা বঙ্গদেশের উন্নতির অন্যতর প্রমাণ, তাঁহারা ভ্রান্ত। জনসংখ্যা অধিক হইলে, জন্মসংখ্যাও অধিক হয়, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। মনে কর, নটবর-পুর গ্রামে ৩০০ লোকের বসতি, এবং হরিপুরে এক সহস্র লোকের বাস। প্রথম গ্রামের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা তথাকার উত্তম জল বায়ুর জন্য সুন্দররূপে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করে। শস্যের প্রচুরতা ও সুলভতার জন্য শান্তিতে থাকে। রাজা বা জমীদারের অত্যাচার নাই বলিয়া নিরাপদে থাকে। তথায় চোর বা ডাকাইতের উপদ্রব নাই, জলকষ্ট দেখা যায় না, প্রত্যেক অধিবাসী সাত্বিক ভাবে জীবন যাপন করে। সুতরাং সেখানে জন্মসংখ্যা অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় গ্রামটী আকারে বৃহৎ এবং জন সংখ্যায় বিরাট্ হইলেও ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা, দূষিত জল বায়ু, চোর ডাকাইতের উপদ্রব, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, রাজার অত্যা-চার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ কারণে—এক্ষণে দৈহিক ও মানসিক পীড়ায় জর্জ্জরিত। সুতরাং এবম্প্রকার স্থানে জন্মসংখ্যা অল্প হওয়া এবং মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়া কি অসম্ভব বা আশ্চর্য্য? জাপান ও ইউরোপের জন্মসংখ্যা এবং বিবাহ-সংখ্যার তালিকা দিয়া, এই কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝা-ইতে ইচ্ছা করি। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা অধিক বলিয়া, "বঙ্গদেশ সুখী ও উন্নত" এরূপ উক্তি ও যুক্তি সত্য নহে। বঙ্গদেশের জন্মসংখ্যার আধিক্যও ইহার উন্নতির পরিচয় নহে। বরং আমাদের দেশে জন্মসংখ্যার আধিক্য বশতঃ অনেক দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী বাঙ্গালী জন্মিতেছে। তুলনায় বঙ্গদেশ অধিকতর কামাতুর। এদেশে একাদশ বর্ষীয়া বালিকার অথবা ষোড়শ বৎসরের তরুণ বালকের সন্তান হয়। এই সকল সন্তানের মধ্যে শতকরা ৮৭ জন অকালে

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। জন্মসংখ্যার আধিক্য যে অশান্তি ও দুঃখের অন্যতর কারণ, নিম্নলিখিত তালিকা তাহার প্রমাণ—

দেশের নাম	জন্ম	বিবাহ			
ফ্রান্স	২১	১৫	জাপান	৩২	৮
বেলজিয়ম	২৭	৭	জর্ম্মন্ সাম্রাজ্য	৩৩	৭
সুইজরলণ্ড	২৭½	৭	অষ্ট্রীয়া	৩৫	৭
ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড	২০½	১৪	স্পেন	৩৬	৮
			হংগেরী	৩৬½	৮
			ইউরোপীয় রুসিয়া	৪৯	৯
ইটালী	৩১	৭	পর্টুগাল	৫১	১১

ইংলণ্ডদেশ এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্, এখানে কিছুরই অভাব নাই। সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতার ইহা আদর্শ। ইংলণ্ডে বিবাহসংখ্যা গড়ে ১৪, জাপান বা ইউরোপের আর কোনস্থানে এই সংখ্যা নাই, কিন্তু তথাপি তুলনায় ইংলণ্ডে সর্ব্বদেশাপেক্ষা জন্মসংখ্যা কম কেন? পর্টুগালে বিবাহ সংখ্যা ১১, কিন্তু জন্মসংখ্যা ৫১ !! রুষিয়ার বিবাহ সংখ্যা ৯, কিন্তু জন্ম সংখ্যা ৪৯ !! অথচ রুষিয়ার তুল্য দরিদ্রদেশ ইউরোপে নাই।

ইংরাজি ১৯০১ অব্দের সেন্সস রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখা যায়, ভারতবর্ষে হিন্দু-বিধবার সংখ্যা প্রায় দুই কোটী। ইহার মধ্যে দশ লক্ষ স্ত্রীলোক পঞ্চদশ বৎসরের অনধিক বয়স্কা,১৮ সহস্র স্ত্রীলোক ৬ বৎসরের অনধিকবয়স্কা, ইত্যাদি। The Census Reports further disclose that while the number of Hindoo widows has been increasing, the aggregate number of the Hindoo population has been proportionately decreasing, the Hindoos showing a decrease of ten lakhs in ten years, while Mahomedans and Christians have multiplied by more than ten percent. দশবর্ষকাল মধ্যে, দশ লক্ষ হিন্দু কমিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; অল্পবয়সে বিবাহ যেমন বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে, তেমনি সমাজকে নানা কারণে দুঃখময় এবং গৃহস্থকে অশান্তির ভাগী করিয়া তুলে। বালবিধবার সংখ্যা-বৃদ্ধি অকালমৃত্যুর অন্যতর উজ্জ্বল প্রমাণ। আচার্য্য বার্কলে সাহেব কহিয়াছেন "A high birth-rate is an indication of poverty than of prosperity. The birth-rate grows higher as the struggle for existence gets

keener. * * * * * Taking all these stubborn facts into consideration one is bound to believe that a high birth-rate is the index of poverty and a keen struggle for existence even if the whole post of political economists stands in serried phalanax against the theory.

ইংলণ্ডের জনসংখ্যা খুব অধিক, বিবাহের সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শস্য, ধন, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, সুবিধা, স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি যথেষ্ট, তথাপি ইংলণ্ডের লোক-সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে কথা তুলিব না,—কিন্তু "সিমোষ্টার পাইয়নিয়র" নামক সমাচার-পত্রে একজন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" (দৈনিক-সংস্করণ) ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ সংখ্যা দেখুন।

"আফ্রিকা-সমর সংঘটন হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে, মান্‌চেষ্টার সেনানিবাসে একাদশ সহস্র ইংরাজ সৈন্যদলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিল; পরীক্ষায় দেখা গেল, কেবল এক সহস্র লোক সেনার কার্য্য করিতে উপযুক্ত! স্কট্‌লণ্ডের হাইলণ্ডের লোক এবং আয়র্লণ্ডের গ্রাম্য-লোক-সমূহ বলবান্ ও কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু খাঁটি ইংরাজ (ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ) বাভেরিয়া টাইরোলিশ প্রসিয়া ফরাসী পার্ব্বতীয় লোক—মন্টিনিগ্রানীয়ন, রাসিয়ান্ এবং পিরাকিউটীশদিগের সহিত যুদ্ধে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। এক সহস্র ইংরাজ সেনার মধ্যে,প্রায় ৪৩৪ জন নিয়ত হাঁসপাতালে থাকে। জর্ম্মনিতে কেবল ১৭ জন সেনা চিকিৎসালয়ভুক্ত। ফরাসী সেনার এক সহস্র মধ্যে ৪৩ জন লোক পীড়িতাবস্থায় ছুটি লয়। ইংরাজসেনা প্রতি সহস্রে ২০৩ জন পীড়ায় ছুটি লইতে বাধ্য হয়। ইংরাজি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের সেনাদলভুক্ত হইতে হইলে, ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি দৈহিক দীর্ঘতা দেখাইতে হইত। ১৮৮৩ অব্দে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হওয়ায়, ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি লোক লওয়া হয়। ১৯০০ অব্দে কেবল পাঁচ ফিট উচ্চ লোককে সেনা-দলে গ্রহণ করিতে অধ্যক্ষগণ বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লোকের শারীরিক ওজন, দেহের দীর্ঘতা এবং স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে অবনত হইতেছে।" ইত্যাদি।

যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই, বাঙ্গালীর দৈহিক অবনতি যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, এই দৈহিক অবনতিও পরমায়ু-হ্রাসের অন্যতর কারণ। বাঙ্গালীর দেহের দীর্ঘতা গড়ে ৪২ ফিট্। শারীরিক ওজন গড়ে ৩৯ সের। মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, পঞ্জাবী, বেহারী ও রাজপুত প্রভৃতি সকল জাতি হইতে বাঙ্গালী ক্ষুদ্রকায় এবং লঘুদেহী। বঙ্গবাসী ভ্রাতার আয়ুর পরিমাণ গড়ে ৩৬ বৎসর ৭ মাস। অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি ?

উত্তরাখণ্ড।

হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সমূহ মধ্যে উত্তরাখণ্ড ভারতীয় পূর্ব্বমহিমা, পূর্ব্বগৌরব, পুরাকালীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-বিশ্লেষণের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান আশ্রম বলিয়া পরিগণিত। কোকিলকণ্ঠ কবিকুল-চূড়ামণি বাল্মীকি, বেদ চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা মহামতি বেদব্যাস, ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমৎ ভাগবতের ঋষিকুলধুরন্ধরগণ, মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিত, পারমার্থিক বলে বলবান শুকদেব, শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী সনাতন, তপঃপ্রভাবশালী নারদ, কলির ব্যবস্থাকর্ত্তা যোগীবর পরাশর, দর্শনশাস্ত্রবিদ্ উর্ব্বর-মস্তিষ্ক জৈমিনি প্রভৃতি পুরাকালীয় আর্য্য মনীষীবৃন্দ এক সময়ে উত্তরাখণ্ডে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আধ্যাত্মিক তেজে সমস্ত পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তরাখণ্ডেই দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত এবং এই স্থানেই সতী-পিতা দক্ষ নরপতির রাজত্ব ও আলয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। মানসসরোবর, চম্পক সরোবর, গৌরী-ভূমি, কেদারনাথ, কনখল, হরিদ্বার প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রমণীয় দৃশ্য সমূহ উত্তরাখণ্ডেই অবস্থিত এবং ভুবন-বিখ্যাত বদরিকাশ্রম, গঙ্গোত্তরী, গোমুখী ও "বসুধারা" প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি সমূহ উত্তরাখণ্ডের সীমাকে অতীব মনোহারিণী এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতরা করিয়া রাখিয়াছে। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী (গঙ্গা) উত্তরাখণ্ড হইতেই নিঃসৃতা হইয়া ভারতের নানা স্থানে প্রকীর্ণ কলেবরে "পতিতপাবনী" নামে প্রখ্যাতা হইয়াছেন। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ হিমালয়ের শত সহস্র যোজন-ব্যাপী মহাসীমা মধ্যে উত্তরাখণ্ড কি সুন্দর, কি শাশ্বত, কি পবিত্র ! ! কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন অতীব শোভাময়, অথবা স্বদেশবৎসল মহানুভব পুরুষের বিবেচনায় সমগ্র পৃথিবী মধ্যে

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি যেমন প্রিয়তমা, হিন্দুশাস্ত্র মতে ভাগীরথী-প্রসূতি উত্তরাখণ্ড ভূমি তেমনি শোভাময়ী, তেমনি পবিত্রা এবং তেমনি প্রিয়তমা। হিন্দুর শাস্ত্র হইতে উত্তরাখণ্ডের নাম লুপ্ত বা অন্তর্হিত হইলে, হিন্দুর প্রায় অর্দ্ধেকটা ধর্ম্মনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উত্তরাখণ্ড নামক মহাতীর্থ হিন্দুর প্রাণের প্রাণ স্বরূপ এবং সেই জন্যই ইহা শাস্ত্রমতে স্বর্গভূমি অথবা কৈলাস।

ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উত্তরাখণ্ডে গমন করিতে হইলে যেরূপ কষ্ট, যেরূপ অসুবিধা এবং যেরূপ অযথা উপদ্রব সহ্য করিতে হয়, হিংলাজ ভিন্ন ভারতের আর কোনও তীর্থে ইহার শতাংশের একাংশও সহ্য করিতে হয় না। এমন দূরবর্ত্তী ও দুর্গম পথে পঞ্চ-চত্বারিংশ বয়ক্রমের পরে গমন করা একেবারেই অসম্ভব; যাঁহারা কৃশ, বৃদ্ধ, অথবা সহজে কাতর কিম্বা সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকে এই পার্ব্বত্য পথে আসিতে আমি বিনীতভাবে নিষেধ করি। যাঁহাদের উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার সুবিধা হয় নাই, তাঁহাদের জন্য এই প্রশস্ত প্রদেশের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমার বিবেচনায়,হরিদ্বার হইতে উত্তরাখণ্ড গমন করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক। আমি হরিদ্বারে নৌকাযোগে গঙ্গা নদী পার হইয়া, পাণ্ডাদিগের সঙ্গে, প্রায় একমাস ছয় দিনে উত্তরাখণ্ডে পৌছিয়াছিলাম। সঙ্গে পাণ্ডা না থাকিলে এই পথে ভ্রমণ করা সুকঠিন, অথবা ব্রজনকারী সন্ন্যাসী কিম্বা পথিক-দিগের সঙ্গেও যাওয়া যাইতে পারে। যাত্রীরা একাকী যায় না। পদব্রজে সুদূর পথ অতিক্রম করিতে হয়; অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তি অথবা অন্য প্রকার যানের সম্পূর্ণ অভাব। এক প্রকার ছোট "ঝোলা"য় আরোহণ করিয়া যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা এত ব্যয়সাধ্য এবং এমন অসুবিধাজনক যে, এক সহস্র পুরুষের মধ্যে একজনের ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। অনেক সময়ে এই ঝোলা পাওয়া যায় না; বর্ষা ও শীত ঋতুতে এই পথে যাত্রী আসিতে অসমর্থ হয়, কারণ বর্ষায় সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া যায় এবং শীতে বরফ পতন জন্য পথ বন্ধ থাকে। আনক স্থানে আদৌ পথ নাই, অতি কষ্টে পাহাড়ে আরো-হণ এবং পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে হয়। স্থানে স্থানে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। এই পথে কেবল আস্তিকের আশা ও ধর্ম্মভাব একমাত্র সহায়। পথে দস্যু-ভয় নাই, এই প্রদেশ নিরাপদ। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে গঙ্গো-ত্তরী ও গোমুখী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটী স্থানে-

স্থই বিশেষ উল্লেখ করিবার আকাঙ্ক্ষা করি। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী নদীর ইহাই উৎপত্তি স্থান। বদরিকাশ্রম হইতে এই দুইটী স্থানে পথিকেরা গমন করিয়া থাকেন; হিন্দি ভাষায় বদরিকাশ্রমের অপর নাম "বদ্‌রী নারায়ণ"। হরিদ্বার হইতে বদ্রীনারায়ণ যাইতে হইলে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা লেখনীর বর্ণনায় বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। এরূপ দুর্গম তীর্থক্ষেত্রে কেবল ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুজাতিই আগমন করিতে পারে, এজন্য হিন্দুর বলবতী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জগতের ইতিহাসে চিরকালই গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। পথের মধ্যে একটী ভয়ানক স্থান দড়ির ঝোলার সহায়তায় পার হইতে হয়, এই মহাভীষণ স্থানের নাম "লছমন-ঝোল"। এই অত্যদ্ভুত স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেক পথিক নিজের "শ্রাদ্ধ ক্রিয়া" সম্পন্ন করিয়া রাখেন, কারণ "লছমন-ঝোলা" অতিক্রম কসিয়া প্রাণ রক্ষা করা আর ব্যাঘ্র-বদন-বিবর হইতে বাঁচিয়া আসা প্রায় একই কথা। সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতার এক সুপ্রসিদ্ধ বদান্য মাড়োয়ারী মহাজনের যত্নে ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ঐ স্থানে সম্প্রতি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং পথিকের আর ঐ স্থানে ভয়ের কারণ নাই।

হিমালয় পার্ব্বত্য প্রদেশের যে মহাসীমায় গঙ্গোত্তরী তীর্থ অবস্থিত, তাহা গড়োয়াল রাজার অধিকার-ভুক্ত এবং তিরি পরগণার তাক্‌নৌর মৌজার শাসনাধীন। এখানকার পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ চতুর্ব্বিংশ সহস্র ফিট, এই শৃঙ্গের নাম গঙ্গোত্রী সহাঙ্গ। এই শৃঙ্গের অপর দিকে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে, সর্দ্দার অমরসিংহের যত্নে লোহিত বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত গঙ্গোত্তরী মন্দিরের সন্নিকটে, শোভাময় হিমাচলের গাত্রভেদ করিয়া পতিতপাবনী ভাগীরথী ক্ষুদ্রাকারে নির্গতা হইয়াছেন। এই "জলধারা"র এক পার্শ্বে মহারাজা ভগীরথ এবং অপর পার্শ্বে মহাদেবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অল্প দূরে রজতময়ী গঙ্গাপ্রতিমা, প্রস্তর নির্ম্মিত শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং আরও একটু দূরে হরগৌরীর সুন্দর যুগল মূর্ত্তি অবস্থিত আছে। ইহারই পার্শ্বে পর্ব্বত-গুহায় সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং ঋত্বিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদিগের বসতি। এই ব্রাহ্মণেরা অবিবাহিত এবং অগ্নিহোত্রী।

গঙ্গোত্তরীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যপুঞ্জ এরূপ রমণীয় যে, তাহা মহাকবির লেখনীর সহযোগে অথবা র‍্যাফেলের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করের তুলিকায়, কিম্বা অর্ফিউশ বা নারদের বীণায় শতাংশের একাংশও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত

হইতে পারে না। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর, গঙ্গোত্তরীর অপূর্ব্ব শোভায় মন প্রাণ মোহিত হইয়া যাইবে; তুষারাচ্ছাদিত শিখরমালা, শিখরের পাদদেশে নানা জাতীয় প্রসূন পাদপ, নিম্নে বহুবিধ বর্ণের অদ্ভুত প্রস্তররাজি, সম্মুখে মনোমোহন আকাশের অবর্ণনীয় শোভা এবং অদূরে রুদ্রাচল নামক গিরিরাজের "সুধা-ধবল" নামক শৃঙ্গের প্রাকৃতিক কারুকার্য্য, পথিককে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রায় করিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরী গিরি শিখরমালা, তুষারময় মুকুটে মস্তকাচ্ছাদন করিয়া অনন্ত আকাশের দিকে প্রকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পথে দিবাকরের দিব্যালোক প্রাপ্ত হইয়া বিমল কিরণমালার সুবর্ণ জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হেমকান্তি ধারণ করিয়াছে; সে দৃশ্য কি অপূর্ব্ব,কি মনোমোহন!! কুলুকুলু শব্দকারিণী ভাগীরথীর নির্ম্মল হিম নীর প্রপাতে রাশি রাশি প্রস্তরপুঞ্জ বিগত-মল হইয়া শুভ্র রজতের ন্যায় চক্‌চক্‌ করিতেছে; যে ব্যক্তি তাহা দেখে নাই, নির্ম্মলতার ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অতীব হিমপাত নিবন্ধন অটল অচলের যে সকল স্থানে বৃক্ষ লতাদি জন্মিতে সমর্থ হয় না, গঙ্গোত্তরী সে সে অংশের অন্তর্ভূত নহে, এইজন্য এ অঞ্চলে তরুলতা ও ব্রততী দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, তুষারক্ষেত্রে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে না, তাঁহারা এস্থানে আগমন করিলে হিমানী-আবৃত ভূমিখণ্ডে নানা বর্ণের অত্যাশ্চার্য্য প্রসূনপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বিগত-ভ্রম হইতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং লোকালয় দেখিয়া বিস্মিত হইতে পারেন।

গঙ্গোত্তরী প্রান্তরে গঙ্গার সর্ব্বপ্রধান বিস্তার ৪২ হাতের অধিক নয়; গভীরতা কটিদেশ পর্য্যন্ত। এই স্থান হইতে পর্ব্বতের উপর দিয়া কাশ্মীর গমন করা যায়, এবং পথিমধ্যে "যশীমঠ" নামক শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী-মঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশীমঠের নিম্নে অলকানন্দা নদী প্রবাহিতা, ইহাই ভাগীরথীর সর্ব্ব প্রথম শাখা। এই পথের জলবায়ু অতীব শীতল, স্থানে স্থানে পর্ব্বত শিখর চিরকাল তুষারাবৃত থাকে, এই অঞ্চলে সবুজবর্ণের পত্র দৃষ্ট হয় না। এখান হইতে আনুমানিক তিন শত ছত্রিশ ক্রোশ দূরে আমি একটী বৃহদাকার গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানকার জলবায়ু খুব শীতল নহে। ঐ গ্রামের নাম ভর্ত্তিহি। কোনও কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভ্রমক্রমে ইহাকে ভারত বা ভারতী লিখিয়াছেন। এই স্থানের অধিবাসীরা গৌরবর্ণ এবং অতীব সুন্দর। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আকৃতিতে পার্ব্বতীয়

ভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকগুলি অধিবাসী মৃগনাভি, পশুচর্ম্ম, পার্ব্বত্য লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করে। এই স্থানে অলকানন্দের "ধাওলী" (ধবলী) নামক এক শাখা প্রবাহিত হইয়াছে। পশুদিগের মধ্যে ম্যাগ ও মেষ এবং উদ্ভিদ-জাতির মধ্যে কয়েক প্রকার ফল বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। গঙ্গোত্তরীর ন্যায় এখানে কতকগুলি হ্রদ আছে, তাহা বরফের জলে প্রায় বার মাসই পূর্ণ থাকে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ্রদের গভীরতা ৭১ ফিটের অধিক নহে।

ভর্ত্তিহি গ্রাম হইতে গঙ্গোত্তরী ক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিয়া আমি একদল ব্রাহ্মণ-পথিকের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। ইহারা হরিদ্বার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। কলসে গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজল লইয়া গিয়া দেশ-দেশান্তরে ইহারা বিক্রয় করিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরীর নিম্নে কেদারগঙ্গা-নাম্নী একটী বেগবতী নদী গঙ্গার অন্ত-শাখা বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছে, জল-ভার-বাহী-ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রায় এই স্থান হই-তেই জলোত্তোলন করিয়া থাকে। কেদার ও জাহ্নবীর সঙ্গমস্থল গৌরীকুণ্ড নামে প্রখ্যাত। এই সঙ্গমস্থলে একটী প্রস্তরময় সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গোত্তরী মন্দির এই স্থানেই অবস্থিত। সঙ্গমস্থলে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে ব্রহ্মা, ভবানী, গণেষ এবং মহাকালীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গঙ্গোত্তরীর মন্দির উচ্চতায় ২০ ফিটের অধিক নহে। ভাগীরথী এই স্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া, এই স্থানের নাম "গঙ্গোত্তরী" বা গঙ্গাবতরণ। প্রবাদ আছে, মহারাজা ভগীরথ গঙ্গানয়ন-কামনায় এই স্থানেই উপবেশন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা দ্বারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। এই মহাপ্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডকে সন্ন্যাসীরা দেখাইয়া দিয়া বলিয়া থাকেন, "ইহাই ভগীরথের তপাসন।" পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, গঙ্গানদীর একটী শাখা হিমা-চল ভেদ করিয়া তির্ব্বতদেশে পতিত হইয়াছে, কিন্তু সে দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর বসতি বলিয়া ঐ শাখা "পবিত্রা" বলিয়া গণ্য হয় নাই।

গোমুখী হইতে গঙ্গোত্রী প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। গঙ্গোত্রী গিরি হইতে ভাগীরথী নির্গতা হইয়া "মণিবন্ধ" পর্ব্বতের একস্থানে অকস্মাৎ ভয়ানক প্রতি-রোধ বশতঃ অতীব সঙ্কীর্ণাবস্থায় পতিতা হইয়াছেন। পুরাণে প্রবাদ আছে, এই স্থানেই ঐরাবত গজেন্দ্র, ভাগীরথীর পথরোধ করিয়াছিল। এই পার্ব্বত্য পথের অপর পার্শ্বে ভাগীরথীর তিনটী শাখা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন পথ হইতে অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে আসিয়া ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে, এই জন্য পথ সঙ্কীর্ণ হইলেও বেগ অত্যন্ত প্রবল। অত্যন্ত প্রবল বেগ বশতঃ গিরি গাত্র ভেদ

করিয়া গঙ্গা নিতান্ত সূক্ষ্ম ধারায় (কিন্তু মহাগর্জ্জনশব্দ সহকারে) বহির্গত হইতেছে। সে স্থানের আকৃতি গাভীর মুখের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, এই কারণ বশতঃ উহার নাম গোমুখী। হিন্দু রাজারা সুবিমল সুবর্ণ, পরিশুদ্ধ রজত এবং বহুমূল্য রত্ন মাণিক্য দ্বারা ঐ মুখ বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এখানে রৌপ্য-নির্ম্মিত বৃহদাকার গো-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রহরী নিযুক্ত আছেন, অল্পদূরে "শত পান্থ" শিখর দেখা যায়। এস্থান হইতে ক্রোশ চতুষ্টয় পরে কেবল নিরবচ্ছিন্ন তুষারক্ষেত্র; ইহার দক্ষিণে কেদার মন্দির এবং পূর্ব্বোত্তর কোণে দক্ষ রাজার আশ্রম। গোমুখী অতি সুন্দর স্থান, এখানকার শোভাও অত্যন্ত মনোমোহিনী; এখান হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে বিষ্ণুপ্রয়াগী নামক গঙ্গার অন্যতম শাখা অতীব প্রশস্ত ভাবে প্রকীর্ণ হইয়াছে। বদ্রিনাথ (বদরিকাশ্রম) মন্দিরের উপরস্থিত পাহাড়ে বিষ্ণু গঙ্গা ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল। বিষ্ণু গঙ্গার অনুসরণ করিয়া ৩৬ ক্রোশ অন্তরে উপস্থিত হইলে, "বসুধারা" দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গঙ্গোত্তরীর অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সম্মিলিত হইয়া, বড় বড় "ফোয়ারার" ন্যায় অনবরত চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত নির্ম্মল শুভ্র ও হিম সলিল রাশিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে। নিকটে যাওয়া সুকঠিন। জল এত শীতল যে, তাহার শৈত্যপূর্ণ বায়ুতে "নিউমোনীয়া" হইবার আশঙ্কা আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, হরিদ্বারের পর্ব্বত মালা হইতে আরম্ভ করিয়া তিব্বতের মানস-সরোবর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এতন্মধ্যে চব্বিশটী স্থান হিন্দুর তীর্থ ক্ষেত্র; এই সকল তীর্থে অন্যান্য তীর্থের ন্যায় ধূমধাম কিছুই নাই; পাণ্ডারাও দরিদ্র এবং অশিক্ষিত; কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষতায় উত্তরাখণ্ড, কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে নহে—সমগ্র বিশ্বমণ্ডল মধ্যে —সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত, প্রাচীন ও পরমানন্দদায়ক আধ্যাত্মিক আশ্রম।

বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ।

মৃত্যুকে শোকের কারণ জানিয়াও মায়াময় সংসারী মানবজন্মকে আনন্দদায়ক বলিয়া বিবেচনা করে, গৃহে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে মহানন্দে মহোৎসবে যোগ দেয়। এই জন্ম ও মৃত্যু নামক দৃশ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মনোহর মহাদৃশ্যের

নাম বিবাহ। এই মহাদৃশ্য বর্ত্তমান না থাকিলে জন্ম ও মৃত্যুর অস্তিত্ব থাকিত না, সুতরাং বিবাহ প্রথা অতীব গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, বিবাহ অসুবিধা জনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহা সকল জাতির পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত বিধি; খৃষ্টান-সন্ন্যাসী মহাত্মা পল অবিবাহিত থাকিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন, Marriage is honourable for all, অর্থাৎ বিবাহ সকলের পক্ষে গৌরবজনক; তিনি আরও বলিয়াছেন, It is better to marry than to burn—অর্থাৎ দুষ্ট কাম প্রবৃত্তিকে গোপনে গোপনে কপটাচারীর ন্যায় সক্লেশে মনোমধ্যে পোষণ করিয়া রাখা অপেক্ষা বিবাহ করাই ভাল। শ্রীশ্রীমৎভগবৎগীতায় এইরূপ আচরণ অতীব নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তদ্যথা—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

মুসলমানেরা বলেন "স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের স্বার্থ যেমন এক, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীর স্বার্থ তেমনি এক, অতএব বিবাহ প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এবং জগতের সকল সংসারী লোকের পক্ষে সুন্দর বিধি।" বৈদিক ঋষির উক্তি উন্মেষণ করিয়া শ্রীমন্মহারাজ মনু লিখিতেছেন—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।"

অর্থাৎ, বর কন্যাকে বলিতেছেন—আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক। ইহাতে বুঝা গেল, বিবাহ কেবল সাংসারিক ব্যাপার নহে, ইহা অতি প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ঘটনা। গীতায় ভগবান স্পষ্টতঃ "বিবাহ দ্বারা প্রজা বৃদ্ধির" আদেশ করিয়াছেন। আমার মতে, ইহা কেবল বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীকে প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় একত্রিত করে না. সমগ্র সমাজ—সমগ্র জাতি—সমগ্র দেশকে ইহা নবদম্পতীর সহিত একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র জাতির সহিত ঘনীভূত ভাবে মিশাইয়া দেয়; বিবাহের ইহাই সামাজিক চিত্র বা সামাজিক উদ্দেশ্য। বিবাহ, আমাদিগকে সমগ্র দেশের সুখ দুঃখের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া দেশানুরাগী ও দেশভক্ত করিয়া তুলে; দেশের অভাব মোচনে, দেশের জন্য চিন্তা করিতে, দেশের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, দেশের জন্য হাসিতে হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে, বিবাহ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—ইহা বিবাহের রাজনৈতিক চিত্র বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। বিবাহ,

আমাদের সমগ্র পরিবারকে রক্ষা করে, সমগ্র বংশকে উচ্ছেদ হইতে পরিত্রাণ করে, কুলগত ধর্ম্ম এবং কুলগত ভাষা, আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতিকে রক্ষা করে, পরিবারের শক্তি, সামর্থ্য, সংখ্যা, শান্তি, সুবিধা প্রভৃতি বৃদ্ধি করে, সুতরাং বিবাহ একটি পারিবারিক প্রধান ঘটনা। ভর্ত্তা ও ভার্য্যাকে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া পরিশেষে উভয় প্রাণকে এক করিয়া পরব্রহ্মে প্রগাঢ় প্রেমসহ সমর্পিত করিতে সমর্থ হয় বলিয়া বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এখন দেখা গেল, বিবাহ আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা। বিবাহের বিশৃঙ্খলতায় কত বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা এখন বুঝিলেন কি? বিবাহের বিশৃঙ্খলায় সমাজের, স্বদেশের ও স্বজাতির যে সকল অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

১। স্বদেশীয় ভাষার অবনতি।
২। স্বজাতীয় সাহিত্যের অবনতি।
৩। স্বদেশ হিতৈষীতার উচ্ছেদ।
৪। স্বজাতিবৎসলতার নাশ।
৫। স্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি অনুরাগের স্বল্পতা।
৬। স্বজাতীয় সংখ্যার অল্পতা।
৭। স্বদেশের স্বাধীনতার লোপ।
৮। কুলগত শুদ্ধাচারের হ্রাসতা।
৯। জাতীয় প্রকৃতির বিপর্য্যয়।
১০। স্বজাতীয় সমাজের সামর্থ্যহীনতা।
১১। দৈহিক বলের অবনতি।
১২। মানসিক শক্তির হ্রাস।
১৩। জাতীয় ভাবের বিনাশ।
১৪। পারিবারিক সুখ ও শান্তির উচ্ছেদ।
১৫। সামাজিক শৃঙ্খলের শিথিলতা।
১৬। রাজনৈতিক অবনতি।

আমি ধর্ম্মের কথা তালিকাভুক্ত করিব না; ধর্ম্মশাস্ত্র বা আধ্যাত্মিক কথার প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে তুলিব না, কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবেই বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহের আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। মনে করুন, গদাধর বক্সী নামে অবিবাহিত ও অজাতশ্মশ্রু কোনও কায়স্থ অর্থাভাববশতঃই হউক

অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, পাদ্রী প্রভুর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক গির্জ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাপ্তিস্মানামক ক্রিয়ায় যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া খৃষ্টীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল। গদাধর কেবল খৃষ্টান হইয়া যদি ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, শ্রীমান বক্সীবাবুর বাপ্তিস্মা ক্রিয়াহেতু সপ্তকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে একটি বাঙ্গালী—একটি মাত্র বাঙ্গালী—হিন্দুর সংখ্যায় কমিয়া গেল। কিন্তু গদাধর বা গদাধর প্রকৃতিক লোকেরা কেবল খৃষ্টান হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না; দেশের, সমাজের, স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের এবং তাহার সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির তাহারা যেরূপ হীনতা সম্পাদন করে, এখন তাহা বুঝুন। একথা স্মরণ রাখা উচিত, গদাধর খৃষ্টান হইয়াও বাঙ্গালী, বাপ্তিস্মা ক্রিয়ায় তাহার ধর্ম্মান্তর হইল কিন্তু জাত্যন্তর হইল না, খৃষ্টান হইয়াও সে বাঙ্গালী রহিল—তাহার রেস্ (Race) বা ন্যাশনালিটি (Nationality) গেল না। গদাধর খৃষ্টান হইয়া বিবাহ করিল, তাহার বর্ণাশ্রম নাই, তাহার রেস্ বা ন্যাশনালিটির বিচার নাই; রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোনও কারণবশতঃই হউক, মনে করুন, আজীমগড়ের খৃষ্টান কিশোর সিংহের কন্যাকে গদাধর বিবাহ করিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, নিন্দা, গ্লানি, অসূয়া, প্রতিবাদ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হউক, হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের হীনতা ও অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা বেতনভোগী ভারতবর্ষীয় পাদ্রীদিগের জীবনের যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য, সেইরূপ ভারতবর্ষের সর্ব্ববর্ণকে আন্তর্জাতিক বিবাহ এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য উপায় দ্বারা এক বর্ণে পরিণত করা—অর্থাৎ জাতীয়ত্ব, সাম্প্রদায়িকত্ব, দেশগত, রেসত্ব লোপ করিয়া একই নামে ও একই সমাজে পরিণত করা—আংগ্লো ইণ্ডিয়ান পাদ্রীদিগের জীবনের অতি মহান্ চেষ্টা। এরূপভাবে একীকরণের সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও যে কত আছে তাহা আমি দেখাইব। যাহারা পুরুষানুক্রমে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছে, সেই সকল কুলীন খ্রীষ্টান স্ব স্ব রুচি অনুসারে যৌণ নির্ব্বাচনে ব্রতী হয়, কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে নূতন ব্রতী, পাদ্রী অথবা পাদ্রীর লোকেরা তাহাদের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন এবং যাহাতে ক দেশীয় লোকের ক দেশীয় লোকের সহিত বিবাহ না হইয়া খ বা গ দেশীয় লোকের সহিত বিবাহ হয়, প্রথমে তাহাই চেষ্টা করেন। যাহা হউক, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থানী কিশোর সিংহের কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। কিশোর সিংহের জন্ম উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, সে হিন্দুস্থানী;

উর্দ্দু তাহার মাতৃভাষা, হিন্দুস্থানীর খানা সে খায়, হিন্দুস্থানীর কাপড় সে পরে হিন্দুস্থানীর আদব কায়দায় সে অভ্যস্ত, এবং বাঙ্গালা ভাষা বলিতে বুঝিতে লিখিতে বা পড়িতে পারে না। তাহার কন্যাও এইরূপে প্রতিপালিতা। গদাধরের পুত্র কন্যা জন্মিল, তাহাদের ভাষা 'পিতার ভাষা' হইল না, ইহা নিশ্চয়, হইল 'মাতার ভাষা'—অর্থাৎ উর্দ্দু। মাতৃভাষা উর্দ্দুতে তাহারা কথা কয়, উর্দ্দুতে লেখে, উর্দ্দুতে পড়ে, উর্দ্দুতে গির্জ্জায় ও ঘরে প্রার্থনা করে, পিতা গদাধরের সহিতও উর্দ্দুতে কথোপকথন চলে। গদাধর ভাল উর্দ্দু না জানিলেও ক্ষতি নাই। তাহাতে সন্তানসন্ততির পক্ষে অসুবিধা ঘটে না। গদাধর ভাল বাঙ্গালা না জানিলেও তাহার সন্তানগণ যদি বাঙ্গালী থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় অক্ষয় দত্ত হইতে পারে। গদাধর যতদিন জীবিত, ততদিনের মধ্যে তাহার দুই একজন বাঙ্গালী বন্ধু তাহার বাটীতে গেলে তাহার সহিত—কেবল তাহার সহিত, বাটীর অন্য কাহারও সহিত নয়—বাঙ্গালায় (ইচ্ছা করিলে) কথা কহিতে পারে; গদাধর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সেই পরিবার হইতে অনন্তকালের জন্য বাঙ্গালা ভাষা উঠিয়া গেল। গদাধর মৃত হইলে লোকে বলিল, "গদাধর মরিয়াছে," কিন্তু গদাধর একা মরে নাই, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে একটা সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার মরিয়া গিয়াছে। গদাধরের পুত্র কন্যাগণ বাঙ্গালা জানে না, বুঝে না, বুঝিবেও না এবং শিখিবেও না, ইহা নিশ্চয়; সুতরাং বাঙ্গালীর বংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গেল। গদাধরের সন্তান, সন্ততি, দৌহিত্র, পৌত্র, প্রদৌহিত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিতে যদি ঐ বংশে, মনে করুন, কালে ৫০ জন লোক হয়, তাহা হইলে ঐ ৫০ জন মনুষ্য নামধারী জীবের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গেল। হয়ত চর্চ্চা থাকিলে এক পুরুষে দুই পুরুষে অথবা কোনও পুরুষে দ্বিতীয় মাইকেল, দ্বিতীয় কৃষ্ণবন্দ্যো অথবা দ্বিতীয় বঙ্কিম জন্মিতে পারিত; এখন বল দেখি, বাঙ্গালীর এইরূপ বিবাহ প্রথার প্রশ্রয় দিতে পার কি? রূপজমোহের বশবর্ত্তী হইয়া যুবাবয়সে তরলমতি বাঙ্গালী এইরূপ বিবাহ দ্বারা স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বাঙ্গালীর বংশধর হইয়াও সে বংশে বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালা চিঠি, বাঙ্গালা পুস্তক, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রচলন নাই; বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা থাকিলে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে আমাদের ভাষার অনেক পুস্তক, সম্বাদপত্র ও মাসিক পত্র হয়ত সেই বংশে বিক্রীত হইতে পারিত, তাহাতে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি পাইত;

হয়ত অনেক বাঙ্গালী শিক্ষকের প্রয়োজন হইত, বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান হইত, হয়ত ঐ বংশের লোকেরা বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চা করিতে করিতে এই ভাষার মহত্ত্ব দেখিয়া এবং ইহা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ভাষা বুঝিয়া, বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমিতি প্রভৃতিতে সাহায্য করিত ; কিন্তু গদাধরের এই বিবাহে এতগুলি অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া গেল, এতগুলি ক্ষতি বঙ্গসমাজকে সহ্য করিতে হইল। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলেও বাঙ্গালী থাকে, সুতরাং তাহাদের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সহিত জড়িত থাকিয়া যায়, সুতরাং বঙ্গবাসীর এরূপ বিবাহ স্বদেশ ও স্বজাতির বৈরিতাব্যঞ্জক। কেবল ভাষা বা সাহিত্য লইয়া কথা নহে, আরও গুরুতর কথা আছে। গদাধরের মৃত্যুর পরে, কেবল একটি জিনিষ থাকিয়া যায়, সেই জিনিষটার নাম জান কি ? তালপুকুরের তালবৃক্ষগুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকিলেও যেমন সেই পুকুরের "তালপুকুর" নাম থাকিয়া যায়, গদাধর বক্সার পত্নী (বাঙ্গালার গন্ধে পর্য্যন্ত বিমুক্তা হইয়াও) মিসেস্ বক্সী বলিয়া অভি-হিতা হয় ; "বক্সা" হিন্দুস্থানীরও খেতাব বটে, সুতরাং সোণায় সোহাগা! শ্রীমান্ বক্সার পুত্র কন্যাগণ হিন্দুস্থানী মাতাপিতার দ্বারা পালিত এবং শিক্ষিত, হিন্দুস্থানী কাপড়ে ও খানায় অভ্যস্ত, হিন্দুস্থানী ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা, হিন্দুস্থানী সমাজ তাহাদের সমাজ, সুতরাং হিন্দুস্থান—দেশীয় লোকদিগের সহিতই তাহাদের সহানুভূতি। গদাধর যদি ভাল লোক হয়, তাহা হইলে যে কয়েকটা দিন সে বাঁচিয়া থাকে, সেই কয়টা দিন তুমি তাহার বাটীতে এক আধটু সহানুভূতি বা সামাজিকতার আশা করিতে পার, তাহার অন্তর্দ্ধানের পরে যেদিকে চাও,কেবল হিন্দুস্থানী আর হিন্দুস্থানী ! সেখানে বঙ্গালীর ভাষার চর্চ্চা দূরে থাকুক, সেখানে বাঙ্গালীর আর "কন্‌কে পাইবার উপায় নাই।" হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানী-সমুদ্রে গা ঢালিয়া দিয়া মনে প্রাণে মিলাইয়াছে, এখন বাঙ্গালীর গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই ; এখন জিজ্ঞাসা করি, হৃদয়ে হাত দিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে চাহিয়া, স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সরল মনে বল দেখি, এই বিবাহটা বাঙ্গালীর জাতীয়-ক্ষতিজনক কি না? আমি "বাঙ্গালী" অর্থে কেবল হিন্দুর কথা বলিতেছি না, বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এবং বাঙ্গালী মুসলমানের কথাও বলিতেছি। এখন দেখ গদাধরের এই বিবাহে, একটা সমগ্র বাঙ্গালী বংশ, ভাষা, সাহিত্য, পরিচ্ছদ, দেশানুরাগ ও সংখ্যার সহিত, সমূলে উৎপাটিত হইল। এইরূপ বিবাহ ভাল না মন্দ ? বাঙ্গালী খ্রীষ্টান রীতিমত বাঙ্গালী খ্রীষ্টানীকে বিবাহ করুন ক্ষতি নাই, কিম্বা বিদেশিনী খ্রীষ্টা-

নীকে যদি করেন, তাঁহাকে স্বামীকুলভুক্তা করিয়া লউন। কিন্তু শ্রীমান বক্সী সাহেবের বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ অভিমতি প্রকাশ করা যায়?

এখন, আর একটা নূতন বিবাহের কথা শুন। শ্রীমান নটবর ঘোষ বিলাতে অধ্যয়ন করিতে গিয়া, কালচক্রের প্রভাবে আবর্ত্তিত হইয়া, ইউরোপীয় সুন্দরী মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহিত হইলেন। তিনি "ঘোষের" পরিবর্ত্তে "মিষ্টর গোশা" উপাধি গ্রহণ করিয়া, বিলাতী পরিচ্ছদাদিতে দেহ সুশোভিত করিয়া, ইংরাজসমাজে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিলেন। নিজের ইচ্ছায়, ভেক সাজিয়া ইংরাজ সারসের নিকটে উপস্থিত হওনান্তর, কহিলেন "হে শুভ্রকান্তিসমাযুক্ত ও শুভ্র-হৃদয়-সমন্বিত ইংরাজ-সারস! তুমি অধম বাঙ্গালীকে রক্ষা কর। হে অগতির গতি! হে অনাথের নাথ! তুমিই ভবসাগরে কাণ্ডারী, অতএব তোমার জয় হউক, তোমার রাজত্ব আমার দেহে মনে প্রাণে আত্মায় সম্বৰ্দ্ধিত হউক; আমাকে—হে পতিতপাবন!—তুমি অসভ্যতা হইতে পরিত্রাণ কর।" শুভ্র-কান্তি ইংরাজ-সারস বিলাসের শুভ্রসলিলোপরে ভাসিতেছিলেন, মাথা উঠাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে অপূর্ব্ব মানবমূর্ত্তি উপস্থিত! উজ্জলে মধুরে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া বিংশ শতাব্দী এই মানবকে সৃজন করিয়াছে! সারস স্বগতঃ বলিলেন, Fie! Fo! Fum! Here standeth the finest specimen of a Baboo of Bengal! ইংরাজ রমণীর সহিত মিষ্টর গোশার বিবাহ হইল, শ্রীমান ঘোষজা নূতন জীবদেহে, নূতন জগতে, নূতন প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গা-লীত্ব কিছুই দেখিলেন না, নিজের গাত্রের আঘ্রাণ লইয়া যাহা কিছু বুঝিলেন, তাহা কেবল সুসভ্য ইংরাজীত্বময়—অমনি বলিয়া উঠিলেন Hic! Mic! Mika! I smell the blood of an Englishman! তাহার পর কি হইল শুন। মিষ্টর গোশা, হতভাগিনী ভারতমাতাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া যদি বিমাতা বিলাতের ক্রোড়েই সমস্ত জীবন বিলাসে অতিবাহিত করিতে বিশিষ্টভাবে অভিলাষী হয়েন এবং স্বদেশ ও স্বসমাজের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া ... সমাজে সাহেব সাজিয়া কেবল ইউরোপীয় সভ্যতা ও ... সম্ভোগে সাংসারিক জীবন শেষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে স্পষ্টই ... উচিত, তাঁহার বিবাহের মণ্ডপে সেই দিনেই বঙ্গসমাজকে অষ্টমীর সন্ধি-ক্ষণে ... পাটা কাটা করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইল! আর যদি তাঁহার পদ্ম-পলাশলোচনদ্বয় বিলাতীয় তীক্ষ্ণ সভ্যতা হুতাশনের জ্যোতিতে ঝলসিয়া যায় এবং সেই জন্য বঙ্গদেশে পুনরাগত হয়েন, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব দম্পতীকে

দেখিয়া আমরা ভাবি, তৈল ও জল একত্রে থাকে কিন্তু মিলে না, মিশে না! পদ্মপত্রের বারির ন্যায় তাহা হেলে দুলে কিন্তু সংলগ্ন হয় না। প্রকৃতির নিয়মের দিকে একবার দেখ। ঘোড়ায় ঘোড়ীতে বেশ সাজে, গাধায় গাধীতে বেশ সাজে, কিন্তু ঘোড়ায় আর গাধীতে এক হইলে, বাচ্ছাগুলি ঘোড়াও হয় না, গর্দ্দভও হয় না, যাহা হয় তাহার ইংরাজী নাম—মিউল্। নটবর ঘোষের পুত্র মিষ্টর গোশা হইয়া আরও ইংরাজ হইলেন, একেবারে বাঙ্গালী গন্ধ উড়িয়া গেল; জিজ্ঞাসা করি, তিনি মাতৃকুল রাখিবেন কি পিতৃকুল রাখিবেন? জিজ্ঞাসা করি, তিনি অল্পদিনের অর্দ্ধসভ্য, পরাধীন, কৃষ্ণকায়, দুর্ব্বল 'ভেতো' বাঙ্গালীকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন,—কি পৃথ্বীবিজয়ী, সুসভ্য, স্বাধীন, শ্বেতকায় মহাবলী বৃটিশের বংশ বলিয়া পরিচয় দিবেন? বলা বাহুল্য, তিনি ইউরোপীয়ান অথবা ইষ্টইণ্ডিয়ান কিম্বা টেঁশো ফিরিঙ্গি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইবেন না। কিন্তু নিগর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা নিশ্চয়।

এইবারে একটী তৃতীয় বিবাহের কথা শুনুন, ইহা কল্পিত দৃষ্টান্ত নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। অনেক দিন পূর্ব্বে যখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ছিল না, তখন একজন দরিদ্র বাঙ্গালী বালক অর্থোপার্জ্জনোপলক্ষে পদব্রজে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গমন করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে করিতে অবশেষে পঞ্জাবে গিয়া উপনীত হয়। এই বাঙ্গালী বালক সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ ছিল এবং তাহার চেহারাও সুন্দর ছিল; পঞ্জাবে একটি চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ মুদ্রা হস্তগত করতঃ, এই যুবা বিবাহেচ্ছু হইল; ঘটনাচক্রে এক সুন্দরী শিখ যুবতীর সে পাণি গ্রহণ করিল। এই যুবা আর স্বদেশে ফিরিয়া আইসে নাই। ইহার পাঁচটী পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মে। ইহাদের সকলেরই পঞ্জাবে জন্ম এবং শিখসমাজে লালন পালন হয়। শিখেরা, দুই একটা বিষয়ে হিন্দুর সঙ্গে অন্যমত হইলেও, ষোল আনার মধ্যে প্রায় তের আনা হিসাবে, হিন্দুর সঙ্গে সমান। উচ্চবর্ণের শিখেরা, উচ্চবর্ণের হিন্দুর অন্ন খায়; পশ্চিমোত্তর ও পঞ্জাবের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা (অনেক সময়ে) উচ্চবর্ণীয় শিখের অন্ন খাইতে আপত্তি করে না। শিখের পরিবার আর হিন্দুর পরিবার প্রায় সকল বিষয়েই এক, সুতরাং ঐ দেশে শিখ ও হিন্দু মিলিয়া মিশিয়া গেলেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালী যুবকের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু ঐ বাঙ্গালীর বংশ পঞ্জাবে আজিও বর্ত্তমান, ঐ বংশের লোকদিগকে আমি চিনি, ইহারা পঞ্জাবী শিখ—বাঙ্গালী নহে। ঐ

যুবক মৃত্যুর সময়ে লাহোরের এক বাঙ্গালী কায়স্থকে বলিয়াছিল—"আমি ইহ-জগত হইতে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এতগুলি পুত্র কন্যা থাকিতেও আমি একটি বাঙ্গালী রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। আমার মরণে আমার বংশে বাঙ্গালীত্বেরও চিরকালের জন্য মরণ হইল।" এখন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, ভাই বাঙ্গালী! এইরূপ বিবাহ ভাল কি মন্দ? বল দেখি, এইরূপ বিবাহে বাঙ্গালীর সংখ্যা, বাঙ্গালীর আশা ভরসা, বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা, এবং বাঙ্গালীর বংশের হ্রাসতা কমিয়া যায় কি না? যদি তোমার বিবাহে আমাদের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তোমার বিবাহকে প্রেমচক্ষে দেখিব কি বিদ্বেষ চক্ষে দেখিব? স্বদেশ ও স্বজাতি তোমার এই বিবাহের কখনই পরিপোষক হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চয়।

পাঠক মহাশয়! ইহার পরে আর একটা বিবাহের কথা শুনুন। প্রায় চত্বারিংশ বৎসর গত হইল, একজন বাঙ্গালী মুসলমান পেশোয়ারে গিয়া তদ্দেশীয় এক পাঠানের ভগ্নীকে বিবাহ করে; পেশোয়ারের পাঠান মুসলমানদের ভাষা উর্দ্দু নহে, তাঁহাদের ভাষার নাম পশ্‌তু। বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাঙ্গালা দেশে সে ধূতী পরিয়াছে, চিরদিন গরম ভাত এবং পান্তাভাতে দেহ পোষণ করিয়াছে, শাক চড়চড়ি প্রভৃতিতে উদর পূরণ করিয়াছে, পুঁই আর সজনা শাক খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে, তৈল মক্ষণ করিয়া পুকুরের জলে স্নান করিয়াছে, মুড়ী মুড়কী খাইয়া বালভোগ করিয়াছে; এখন এই মহাপুরুষ পেশোয়ারে গিয়া পাঠানী রমণীর সুচিকণ কুন্তল, সুন্দর দশনপংক্তি, নয়নের কালো পুতুলি এবং গায়ের গোলাপী রং দেখিল, এই অপূর্ব্ব দর্শনে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কালো কুচ্‌কুচে বাঙ্গালী মুসলমানরমণীর সর্ব্বাংশই মন্দ ভাবিল, সুতরাং ঐ পাঠানীর সঙ্গেই, রূপজ মোহের দোষে, বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। বাঙ্গালী মুসলমান অল্প অল্প উর্দ্দু জানিত, পাঠানীও উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত, সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষে কথোপকথনের বড় অসুবিধা ছিল না। স্বামী ভিন্ন আর সকলের সহিত ঐ পাঠানী তাহার মাতৃভাষায় (পশ্‌তু ভাষায়) কথোপকথন করিত। পাঠানেরা স্নানের সময় তেল মাখেনা, সে দেশে তেঁতুল, চাল্‌তা, আমড়া, পুঁইশাক, সজনা খাড়া পাওয়া যায় না, পাঠানেরা মুড়ী মুড়কী খায় না, রুটি ভিন্ন ভাত স্পর্শ করে না, কেবল ডাল রুটি অথবা রুটি গোস্‌ৎ (মাংস) খায়, এবং যেরূপ পোষাক পরে যে তাহার চৌদ্দপুরুষেও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে না। হতভাগ্য বাঙ্গালী মুসলমান দেখিল—

এই বিবাহে কথোপকথনে কষ্ট, সামাজিক কষ্ট, আহারের কষ্ট এবং তৎসহ পোষাকের অসুবিধা। ভুলেও একটি বাঙ্গালী তিনি দেখিতে পান না, বাঙ্গালী আহারের গন্ধ পান না এবং স্নানের সময়ে তৈল মাখিতে গেলে লোকে হাসে ও তামাসা করে। রুটি খাইয়া শ্রীমানের পেট ফুলিয়া গেল, বাবাজী একেবারে বিপরীত জগত দেখিতে লাগিলেন। শ্রীমানের একটু ইংরাজিও জানা ছিল, জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে বড় দুঃখে বলিলেন—'I see what is sauce for the gander is not sauce for the goose অর্থাৎ যাহা রামের পক্ষে ভাল তাহা শ্যামের পক্ষে ভাল নহে। আসল কথা এই যে, অনুকরণেরও সীমা আছে; মহাদেব বিষ পান করিয়া অমর ও নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া কি তুমি আমি বিষ পান করিতে পারি? যাহা পানে মহাদেব অমর হইয়াছিলেন, তাহা পানে তোমার আমার মৃত্যু নিশ্চয়। ঐ বাঙ্গালী মুসলমান যুবক মরিয়া গিয়াছে, তাহার বংশে বাঙ্গালীত্ব পদার্থের একটি চিহ্নও নাই। ঐ বিবাহে একটা বাঙ্গালী বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। পাঞ্জাবেই হউক আর অযোধ্যাতেই হউক, মুসলমান সম্প্রদায় অথবা খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কিম্বা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হউক, একটা বাঙ্গালী বংশ ঠিক বাঙ্গালীর মত বর্ত্তমান থাকিলে, তবুও আমরা প্রেমের সহিত, আশার সহিত, বুক ফুলাইয়া বলিতে পারি, অমুক স্থানে আমাদের এক ঘর বাঙ্গালী আছে—জল ঝড়ের সময় এই দূরবর্ত্তী বিদেশে তাহাদের ঘরে এক রাত্রির জন্য, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া, মাথা রাখিতে পারিব; কিন্তু সে আশা আর থাকিতেছে কি? অযোধ্যা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের মধ্যে বহু সংখ্যক স্থানে বহু সংখ্যক খ্রীষ্টান বাঙ্গালী এবং খ্রীষ্টান বাঙ্গালীর বংশ বর্ত্তমান আছে, ইহাদের শতকরা একজনও প্রকৃত বাঙ্গালী কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ, ইহাদের একশত জনের মধ্যে বোধ হয় একজনও বাঙ্গালা ভাষা জানে না ও বুঝে না এবং কোনও প্রকারেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করে না। ইহাদের এক পুরুষে অথবা একপুরুষান্তরে বাঙ্গালীত্ব সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালী ধুতী পরে না, সুতরাং বাঙ্গালী তাঁতীর ভরসা ইহাদের উপরে নাই, ইহারা ঢাকার উড়ানী অথবা শান্তিপুরের রুমাল ব্যবহার করে না; বাঙ্গালা পুস্তক, সমাচারপত্র বা মাসিক পত্র পড়ে না এবং পড়িতে জানে না, সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য কোনও প্রকারে ইহাদের সহানুভূতি পাইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে, ইহারা ইংরাজী ও উর্দ্দূতে গান গায়, হিন্দুস্থানীর হাতের তৈয়ারী দ্রব্য ব্যবহার করে, উর্দ্দূ ইহাদের মাতৃ-

ভাষা এবং যাহা কিছু বাঙ্গালীত্ববর্জ্জিত, তাহাই ইহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য এবং গৃহের নিত্য শোভাবর্দ্ধক। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর সহিত সহানুভূতি থাকিবে কেন? "বাঙ্গালা জাতির সহিত, বাঙ্গালী দেশ ও সমাজের সহিত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত, বাঙ্গালা সংগীত, বাঙ্গালা শিল্প, বাঙ্গালা চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির সহিত সহানুভূতি থাকে কি? কত ক্ষতি হইল, বল দেখি? কেবল সাধারণ খ্রীষ্টীয় সমাজের কথা বলিতেছি না, অযোধ্যা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বহু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী পাদ্রী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী অথবা ফিরিঙ্গি রমণীকে বিবাহ করিয়া এইরূপে কলঙ্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন; ইহার প্রতিকার না হইলে এইরূপ ক্ষতিজনক বিবাহ চলিতেও থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুতা ও সামাজিকতার অনুরোধে আমি কাহারও নামোল্লেখ করিতে নিবৃত্ত হইলাম, নতুবা ইহাদের নামের তালিকা এত সুদীর্ঘ হইত যে, বোধ হয়, এই তালিকায় এক খানা পুঁথি পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। মুসলমান, হিন্দু এবং এখনকার ইয়ং বেঙ্গল বাবুদের সম্বন্ধে তালিকাটা এত বড় না হইলেও, তালিকা বড় ছোট হয় না। জব্বলপুরে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, রাজপুতানায় এরূপ বাঙ্গালী অনেক। দক্ষিণ ভারতে (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে) অনেক দিন হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, সেখানকার দেশীয় খ্রীষ্টান এক কিম্ভূতকিমাকার জীব বলিলেই হয়। সেখানে দেশীয়ত্বের নাম মাত্র নাই, তাহারা তদ্দেশীয় লোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র স্পর্শও করে না, সকল বিষয়েই বিলাতী ধরণের লোক; ইহাদের মধ্যেও প্রাচীন বাঙ্গালী বংশ দেখিয়াছি, তাহা কেবল "বাঙ্গালীর উৎপন্ন বংশ" এই টুকুতেই পরিচয়! তদ্ভিন্ন, বঙ্গদেশের মানচিত্রও তাহারা দেখে নাই। ভারতবর্ষের বহুস্থানে মিষ্টর ঘোষ, মিষ্টর হাজরা, মিষ্টর ভাদুড়ী, মিষ্টর রুদ্র, মিষ্টর দাস, মিষ্টর চাটুর্জ্জি প্রভৃতি দেখিয়াছি, ইহারা মুখে বলে "শুনিয়াছি, আমাদের আদি পুরুষ বাঙ্গালী ছিলেন", এইটুকু বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয়, বাঙ্গালী বলিলে বাঙ্গালী-গৌরব বা বাঙ্গালী-মহিমা তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

এইবারে একবার রাজপুতানার দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই বীরপ্রসবিনী রাজপুতভূমির খ্রীষ্টানী বা মুসলমানীর কথা আদৌ তুলিব না, এবার খাটি হিন্দুর কথা তুলিব। অখণ্ডনীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা গিয়াছে, সম্রাট আকবর, রাজা জয়সিংহ, রাজা মানসিংহ প্রভৃতির সময় হইতে রাজপুতানায় বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু-

সংখ্যক বাঙ্গালী পরিবার এখনও বর্ত্তমান, কয়েকটি পরিবার ব্যতীত কোনও হিন্দু পরিবারে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব আদৌ নাই। ইহারা অতি পূর্ব্বকাল হইতে মাড়োয়ারী হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া আদান প্রদান বিবাহ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, বিবাহটা অবশ্য হিন্দুমতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, কায়স্থ কায়স্থের সহিত বিবাহ করে; এই সকল "বাঙ্গালী বংশধরেরা" ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, ঘোষাল, দাস, মুন্সী, দত্ত প্রভৃতি উপাধিতে পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের খানা, বেশভূষা, ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত বাঙ্গালীদের এক কণাও মিলে না, এখন চেষ্টা করিলেও আর মিলে না, মিশে না। এই সকল বিবাহে বাঙ্গালীর লাভ কিছু আছে কি? তোমরা বিবাহ করিলে বটে, তোমাদের বেল পাকিল বটে, কিন্তু কাকের তাহাতে কি হইল?

আর দৃষ্টান্ত দিব না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান সকল বিবাহক্রিয়াতেই বরকে কন্যার সহিত এবং কন্যাকে বরের সহিত কতকগুলি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। হিন্দুসমাজে, হিন্দুশাস্ত্র-মতে, এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব ও দায়ীত্ব, আমার বিবেচনায় যেন অধিকতম বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু বিবাহে বর কন্যাকে কহিতেছেন—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব

কন্যা বলিলেন—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতিকুলে ভূয়াসম্।

বর বিবাহ সমাপনে অন্ন-ভোজন কালে বধূকে বলিতেছেন—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা
প্রাণ সূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্য গ্রন্থিনা।
মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে।
ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব॥

অর্থাৎ—"যাহা মহা রত্ন আত্মা-স্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধন-স্বরূপ, সত্য

যাহার গ্রন্থি-স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত, বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম। এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয় ইহা তোমার হৃদয় হউক।" তাহার পর বর-কন্যা পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি, মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥"

অর্থাৎ, "প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।" এখন বল দেখি, এইরূপ না হইলে বিবাহ হয় কি? পত্নী যদি পতিকুলের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার, বেশ, চিরাগত নিয়ম প্রভৃতি রক্ষা না করিলেন—যদি বিবাহ দ্বারা আমাদের মাতৃ-ভূমির, মাতৃ-ভাষার, স্বজাতির ও স্বকীয় সমাজের কিছুই "ধ্রুব" রহিল না, তবে সেটা বিবাহ না বাঁদীত্ব? এইরূপ বিবাহ, বিবাহ না বাঁদ্রামী? চর্ম্মে চর্ম্মে, মাংসে মাংসে, অস্থিতে অস্থিতে মিলিল কৈ? ইহা ত বিবাহ নয়, ইহা একটা খুব বড় তামাসা। সেদিন লোক সংখ্যার রিপোর্টে দেখিলাম, বাঙ্গালায় এখনও সাত কোটীর অধিক লোক বাস করে; ক্লার্ক সাহেব তাঁহার স্কুল-পাঠ্য ইংরাজী ভূগোলে লিখিয়াছেন—"এখনও ভারতের সকল লোককে একত্র করিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তি বাঙ্গালী হয়—Every fifth man is a Bengalee," দেখিতেছি, এখনও বাঙ্গালী মরে নাই, বাঙ্গালী মরিবেও না, জগতের ইতিহাসে—এই সুবিশাল সংসার-ক্ষেত্রে—বাঙ্গালীর পদবী অতি উন্নত, বাঙ্গালীর ভবিষ্যত অতীব আশাজনক, এহেন সুদিনে, এহেন সুসময়ে এই গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে, বিবাহ প্রথাটা ভাল করিয়া সংস্কার করিলে সোণায় সোহাগা হয়; এই সুসময়ে একটু সাবধান হইয়া, ভবিষ্যতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া বিবাহ করিলে ভুতলে বাঙ্গালী অতুল হইয়া উঠিবে, ইহা নিশ্চয়।

মশ্‌তান সা।

মশ্‌তান সা কত দিনের লোক, ঠিক তাহা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দের সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের অনেক বৎসর পূর্ব্বে এবং অনেক বৎসর পরে তাঁহাকে অনেকে দেখিয়াছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম গুল্‌-এ-গুল্‌ মশ্‌তান সা, কিন্তু তিনি মশ্‌তান সা নামেই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে লোকে "পিশাচ সিদ্ধ" (জিন্নী) বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক, আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়তায় আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দীন যেমন অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মশ্‌তান সা তেমনি অসংখ্যাসংখ্য অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তৎসাময়িক লোকদিগকে বিস্ময়-সাগরে নিক্ষেপ করিতেন। পথ দিয়া চলিয়া গেলে ছোট ছোট বালকেরা তাঁহার পশ্চাত পশ্চাত দলে দলে দৌড়িয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত "সা সাহেব! সা সাহেব! বোম্বায়ের দশটা পাকা আম খাওয়াও।" সা সাহেব, ছোট ছোট বালকদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু তখন পৌষ মাস, সুপক্ক আম্র ফল কোথায় পাওয়া যাইবে? শিশুরা ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, মশ্‌তান সা ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি যে কোনও স্থান হইতে যে কোনও পদার্থ আনিয়া বা আনাইয়া দিতে পারেন। অনেকক্ষণ হাসি খুসী করিয়া মশ্‌তান সা আকাশের দিকে নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক, "হজ্‌রৎ" "হজ্‌রৎ" বলিয়া তিনবার বিকট চীৎকার করিতেন, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আকাশ হইতে ভূতলে পাকা আম পড়িয়া যাইত। এইরূপে তাল, খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, জাম, আনারস প্রভৃতি কত প্রকার ফল আনাইয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল অলৌকিক-ক্রিয়া-সম্ভূত ফল তাঁহাকে কেহ কখন খাইতে দেখে নাই, তিনি অপরকে দিতেন, নিজে কখনও খাইতেন না। তাঁহার লম্বা দাড়ী ছিল, মাথার চুল খুব পাৎলা, অনেক স্থানে টাক পড়িয়া গিয়াছিল। গলা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত শার্দ্দূল চর্ম্মের তৈয়ারী অপরূপ "চোগা", কোমরে গৈরিক বসনের বহির্ব্বাস, গলায় বড় বড় স্ফটিকের মালা এবং মাথায় তুরস্কদেশীয় লোহিত বর্ণের দীর্ঘাকার টোপি। স্কন্ধদেশে কাল রঙ্গের প্রশস্ত ফিতা সহযোগে অতি ক্ষুদ্রাকার একখানি আরব্য-কোরাণ সদাসর্ব্বদাই লম্ববান থাকিত। তাঁহার মাতৃভাষা উর্দ্দু; ধর্ম্ম বিশ্বাস ইসলামানুবর্ত্তী এবং আহার ব্যবহার মুসল-

মানের মত ছিল। তাঁহাকে কেহ কখন ছাতা বা লাঠি ব্যবহার করিতে দেখে নাই। তিনি কখনও রৌপ্য, সুবর্ণ বা তাম্র স্পর্শ করেন নাই। মশতান সা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন; সুরাকে অতি ঘৃণিত পদার্থ বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি কখন স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করেন নাই।

মশতান সাহের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। রেলের সৃষ্টি হইবার পরে, একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি একদা ট্রেণ-যোগে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। ভদ্রলোকটী পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন, অথচ কোন ষ্টেশনেই জল প্রাপ্তির সুবিধা ঘটে নাই। অবশেষে তাঁহার আত্যন্তিক কাতরতা দেখিয়া মশতান বলিলেন "তোমার ঘটিতে জল রহিয়াছে, জল খাইতেছ না কেন?" ভদ্রলোক নিশ্চয় জানিতেন, তাঁহার ঘটীতে এক বিন্দুও জল ছিল না এবং জল দিবার অথবা জল আনিবার কোন উপায়ও ছিল না, কিন্তু সা সাহেবের অনুজ্ঞামত ঘটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অতি নির্ম্মল ও শীতল সলিলে তাঁহার ঘটি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অনেক সময়ে অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা মশতান সা অনেককে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাকে কুঠুরির মধ্যে কয়েকবার কতিপয় লোকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু স্বল্প সময় পরেই দেখা গেল, তিনি প্রকাশ্য পথে পাদচারণা করিয়া সমীরণ সেবন করিতেছেন!! তিনি কোনও রোগীকে ঔষধি দেন নাই অথবা ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই, তাঁহার শ্রীমুখের কথা (আশীর্ব্বাদ) শ্রবণ মাত্রেই শত শত লোকের দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি গুড়ের সরবৎ পান করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং এক স্থানে অধিক কাল বসিয়া থাকিতে সম্মত হইতেন না। একবার ট্রেণে ভ্রমণ করিতে করিতে সায়াহ্নের সময়ে রেলশকট খানি একটা ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিল। অতি দ্রুতপদে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মশতান সা, "অজু" ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক, প্লাটফরমে নমাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ড্রাইভার, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথিকেরা মশতান সাকে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চড়িয়া বসিতে বলিলেন, কিন্তু সে কথায় সা সাহেব কর্ণপাতও করিলেন না। ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝাইলেন, "এই গাড়ী এই ষ্টেশনে অতি শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিবে, আমি আবার এই গাড়ীতে চড়িয়াই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিব, তোমা-দিগকেও ফিরিয়া আসিতে হইবে।" সাধুর কথা সত্য হইল; জানি না, কি যোগাযোগ-বশতঃ, সেই গাড়ীর ড্রাইভার টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া, গাড়ী ফিরা-

ইয়া আনিলেন, সেই গাড়ীতেই আরোহণ করিয়া মশতান সা তিন ঘণ্টা পরে আবার ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মশতান সার গায়ে বাঘের চামড়ার "চোগা" থাকিত, তাহার উপরে একখণ্ড পুরাতন ও ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণের কম্বলখণ্ড ঢাকা থাকিত। তিনি টাকা কড়ি বা পয়সা স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু কাহা-কেও কিছু দিবার আবশ্যক হইলে—যাহা কিছু দিবার আবশ্যক হইত—কম্বল নাড়িলেই ঠিক তাহাই ভূতলে পতিত হইত। লোকে ভাবিয়াছিল, ঐ ছেঁড়া কম্বলের ভিতর টাকা লুকান থাকে। সহস্র লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, ইহাতে একটী পয়সাও ছিল না।

সা সাহেবকে দেখিলে ৫০ বৎসর বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বয়স কত ছিল, কেহ তাহা কখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার কোথায় জন্ম হইয়াছিল, অথবা কোথায় তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন, তাহাও অদ্যাপি কেহই জানে না। তাঁহার শরীর কৃশ কিন্তু খুব দৃঢ় ছিল।

মশতান সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ক্রিয়া এখনও জগতে অবিদিত। আধ্যাত্মিক তেজে তেজীয়ান মহাপুরুষদিগের অসামান্য লীলাবলী যদি সকল মানুষেই বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে জগতের এত দুর্গতি থাকিত কি? খ্রীষ্টীয় ১৮৫৬, ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ এই তিন বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শস্ত্রধারী সিপাহীবৃন্দ এবং তাহাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ যে মহা ভীষণ বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিল, মশতান সা, দেওশর্ম্মাজী, দেবানন্দ, হরকিশোর প্রভৃতি "মহাত্মাগণ" (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, দরবেশ, পরমহংস প্রভৃতি মহা-পুরুষেরা) ইংরেজের সহায় না থাকিলে, বৃটিশ-বিক্রম-সূর্য্য এতদিনে অতীতের স্মৃতি-মেঘে লুকাইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক সামর্থ্য-বলে, যোগ-শক্তির সহায়তায় এই সকল মহাত্মারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে গমন করিয়া ইংরাজ-সমর-রথীদিগকে বিপদের বিবরণ জানাইয়া দিতেন এবং বিপক্ষবর্গের গতিবিধির সম্বাদ দিতেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত ইংরাজ ইহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, নানা সময়ে, নানা বেশে, অতি আশ্চর্য্য ভাবে, এবং এমন অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া এই সকল মহাত্মা ইংরাজ শিবির হইতে অদৃশ্য হইতেন যে, সমর বিভাগের লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। মহাত্মারা যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজের হস্ত হইতে রাজ্য গেলে ভারত একেবারে উচ্ছন্ন যাইবে, ইংরাজের সহিত ভারতের সংস্রব এখনও বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক।

মশতান সা একজন প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি এক জন "সিদ্ধপুরুষ" রূপে মানব-সমাজে দেখা দিয়াছিলেন। কালে সকলই ফুরাইতেছে, এখন সেকালের মত মহানুভবেরা আর দর্শন দেন না, এখন মশতান সার মত একটি "সিদ্ধ মহাপুরুষের" দর্শন লাভ করা কঠিন হইতেও কঠিনতর। ভারত ভাগ্য-হীন; সৌভাগ্য বিনা কি মহাপুরুষের দর্শন স্পর্শন হইতে পারে?

ওঁকার দ্বীপ

জি,আই,পি রেলওয়ে লাইনের যে অংশ মধ্যপ্রদেশ (Central Province) অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ অতীব মনোহর। রেলপথে যতই দূরে যাওয়া যায়, পথিকের দৃষ্টিশক্তি যতই দূর হইতে প্রেয়োজিত হয়, পার্শ্বস্থ দৃশ্যগুলি ততই অধিক সুন্দর এবং অধিক কৌতুকাবহ বলিয়া মনে হয়। এই সুবিস্তৃত লাইনের উপরিস্থিত খাণ্ডোয়ানামক সুবৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন একটি প্রধান জংশন। এই জংশন হইতে টিকিট লইয়া ওঁকার দ্বীপে যাইতে হয়। ওঁকার দ্বীপ হিন্দু জাতির একটা প্রধান তীর্থ, এখানে ওঁকার-নাথ মহাদেবের মন্দির আছে। খাণ্ডোয়া ষ্টেশনে মর্ত্তকা-নামক স্থানের টিকিট লইয়া ঐ লাইনের মর্ত্তকা ষ্টেশনে পথিকগণকে অবতরণ করিতে হয়। মর্ত্তকা হইতে ওঁকার দ্বীপ প্রায় সার্দ্ধ তিন ক্রোশ অথবা ইংরাজি ৮ মাইল, ইহা "নিমার" জেলার অন্তর্গত। মর্ত্তকা ষ্টেশনে বলদ-শকট, সকল ঋতুতেই পাওয়া যায়। এই গাড়ীতে চড়িয়া পথিককে মান্ধাতা নামক গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হয়। পথের অবস্থা অতীব জঘন্য, বহুকাল পর্যান্ত এই রাস্তার মেরামত হয় না এবং হইলেও তাহা ঠিক্ থাকে না। বর্ষাকাল ব্যতীত সকল ঋতুতেই এত প্রচুর পরিমাণে ধূলি উড়িতে দেখা যায় যে, আরোহিগণ অনেক সময়ে শ্বাসশূন্য হইয়া পড়েন। পদব্রজে গমন করিলে ধূলির উপদ্রব অধিকতর ভয়া-নক হইয়া উঠে। মর্ত্তকা হইতে মান্ধাতা পর্য্যন্ত একটি মাত্র পথ। পথের দুই পার্শ্বে দেখিবার কিছুই নাই, লোক বা লোকালয় মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। একে পথ জঘন্য, তাহাতে পথের দুই পার্শ্বে নীরস অনুর্ব্বর পতিত ভূমি এবং নিরবচ্ছিন্ন কাঁটা-বন। মান্ধাতায় পৌছিয়া ভ্রমণকারীরা বলদ-শকট

হইতে অবতরণ করেন। মান্ধাতায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর, ছোট স্কুল এবং পুলিশ ষ্টেশন আছে। মান্ধাতা গ্রাম খুব বড় নহে, কিন্তু অতি প্রাচীন ; প্রবাদ আছে, ইহা রাজা মান্ধাতার আমলের সহর। এই গ্রাম হইতে তিন শত হস্ত দূরে গেলে নর্ম্মদাতটে পৌঁছিতে পারা যায়। মান্ধাতা নদীতট হইতে উচ্চতর। নর্ম্মদা নদীর আকৃতি এখানে অতি বড় নহে, দেখিতে খুব ছোট বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু সেই ছোট নদীর শোভার সীমা নাই !! বসন্তে বা নিদাঘে মান্ধাতার নর্ম্মদাসুন্দরীকে দেখিলে নিতান্ত শোভাময়ী বলিয়া বোধ হয়। প্রাবৃটের মধ্যভাগে নর্ম্মদার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নদীর আর একটি ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন নর্ম্মদার বন্যা ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া বহুদূর স্থান প্লাবিত করিয়া ফেলে। বসন্তে নর্ম্মদাসুন্দরী 'কুসুমাদপি কোমলা', এবং প্রাবৃটে ইনি "বজ্রাদপি কঠোরা।" মান্ধাতায় নর্ম্মদাতটে দাঁড়াইলে একটা নৌ-সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নৌকা দ্বারা নির্ম্মিত। এই নৌ-সেতুর সহায়তায় অথবা ক্ষুদ্র পান্‌সীর সহায়তায় নর্ম্মদা পার হইয়া পথিকগণ অপর পারে ওঁকার দ্বীপে পৌঁছিয়া থাকেন। বর্ষাকাল ভিন্ন সকল ঋতুতেই নর্ম্মদার জল কাকের চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল, সেই জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ, শীতল, সুপাচক এবং সুস্বাদু। যতদূর দৃষ্টি চলে, ওঁকার-দ্বীপতলবাহিনী নর্ম্মদার কিনারা সুন্দর ও সুদৃঢ় প্রস্তরমালায় সুচারুরূপে বাঁধান দেখা যায়। নর্ম্মদাসুন্দরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে যে, ওঁকার পুরীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, এই জন্য ইহা ওঁকার দ্বীপ নামে প্রখ্যাত। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে মান্ধাতা-ওঁকারজী বলিয়া সম্বোধন করে।

ওঁকার দ্বীপ অল্পকাল পূর্ব্বে হিন্দু রাজার (মহারাষ্ট্র নরপতির) অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে ইহা বৃটিশশাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যিনি ওঁকার দ্বীপের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি একজন জমিদার মাত্র। যিনি জমিদার, তিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের ন্যায় এক প্রকার সন্ন্যাসী এবং শৈব সম্প্রদায়ের উপাসক। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত শৈব নাই বলিলেই হয়, এদেশে অধিকাংশই শাক্ত। ভারতের সর্ব্বত্রই শৈবেরা নিরামিষাশী, কেবল বাঙ্গালা দেশে কতক-গুলি লোক শৈব বলিয়া পরিচয় দিয়া মৎস্য মাংসের ধ্বংস করেন। ওঁকার দ্বীপের শৈবেরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। এখানে মৎস্য মাংস কেবল অভোজ্য, তাহা নহে, বাজারে কেহ আমিষ দ্রব্য বিক্রয় করিতেও সমর্থ নহে। নদীতে কেহ মৎস্য ধরিলে দণ্ডিত হইয়া থাকে। নদীর মাছগুলিকে ব্রাহ্মণ বালকেরা প্রতি-

দিন সায়াহ্নকালে ময়দার ছোট ছোট গুলি (বটিকা) করিয়া খাইতে দেয়, অথবা মুড়ী মুড়কী খাইতে দিয়া থাকে। নর্ম্মদায় এত মাছ যে, স্নান করিতে গিয়া জলে দাঁড়াইয়া থাকা একটা উপদ্রব বলিয়া বোধ হয়। নদীর নির্ম্মল জলের স্রোতে যখন রজতবর্ণের মৎস্যকুল ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, অথবা নাচিয়া নাচিয়া খেলিতে থাকে, সে সময়ের নর্ম্মদার সলিলে এক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

ওঁকার দ্বীপ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। পাহাড়ের অপর অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বড় বড় বন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপের সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় পদার্থের নাম ওঁকারনাথের মূর্ত্তি এবং ওঁকারনাথের মন্দির। এই মূর্ত্তি ও মন্দির দেখিতে হইলে, পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। মন্দির খুব বড় এবং সুদৃঢ় প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নীচের দৃশ্য দেখিতে অতীব মনোহর। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ এবং খুব স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শত করা ৯০ জন; মুসলমান এবং অন্যান্য জাতির সংখ্যা শত করা ১০ জন। প্রত্যেক ৯০ জন হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৮০ জন ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক ৮০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রায় ৭০ জন "পাণ্ডা।" ওঁকার দ্বীপের পাণ্ডারা লোভী, স্বার্থপর এবং উদ্ধত প্রকৃতির পুরুষ বটে, কিন্তু যাত্রীদিগকে ঘরে লইয়া গিয়া খুব যত্নের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ বলবতী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং কোমল-হৃদয়া। বাজারে নিরামিষাশীর ব্যবহার্য্য প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন কাগজ, কলম, কাপড় প্রভৃতিরও ছোট ছোট দোকান আছে। ওঁকার দ্বীপে একজন অনরেরি মাজিষ্ট্রেট আছেন, ইনিও মোহান্ত বা সন্ন্যাসী। ওঁকার দ্বীপের চারিধারে পাহাড়ের উপরে গড় আছে, এই গড়ে বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

এ দেশের সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী ডাকাইতদিগের সম্প্রদায় বিচরণ করে এবং ডাকাইতির কথা প্রায়ই শুনা যায়। দস্যুতা ও রাহাজানী এখানকার সাধারণ লোকের জীবিকা। নরহত্যার অপরাধ আদালতে প্রায়ই রুজু থাকে। পথিকদিগের একটু সাবধানতার সহিত থাকা আবশ্যক। গাঁটকাটা (Pick-pocket) এবং গুণ্ডার আড্ডা প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়; জুয়ারী (Gamblers) দিগের সংখ্যা কম নহে। রোহিলাদিগের আমল হইতে এ দেশে ডাকাইতির সূত্রপাত হইয়াছে। রেলপথ তীর্থস্থান পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইলে এই দস্যুবৃত্তির নিশ্চয়ই বিলোপ হইবে।

ইগাৎপুরী।

বোম্বাই হইতে পুণা পর্য্যন্ত, গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলওয়ে-লাইনের যে অংশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ বিস্তৃত অরণ্য, অভ্রভেদী গিরিমালা, রমণীয় প্রাচীন নগর, সুবৃহৎ গ্রাম, সুবিশাল প্রান্তর এবং তদ্ব্যতীত নানা প্রকার আশ্চর্য্য ও সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যপুঞ্জে পরিপূর্ণ। যাঁহারা রেলওয়ে শকটে নিদ্রিত হইয়া অথবা নিশার অন্ধকারে এই পথ অতিক্রম করেন, তাঁহাদিগকে আমি হতভাগ্য পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করি। দিবসের সূর্য্যালোকে এই রমণীয় পথ অতিক্রম না করিলে, রেলওয়ে লাইনের দুই পার্শ্বস্থ পদার্থপুঞ্জের মনোমোহিনী শোভা, দর্শক বা পথিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। বোম্বাই হইতে পুণা পর্য্যন্ত গমন করিলে ন্যূনাধিক ত্রিশটী পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়, পর্ব্বতসমূহ ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে; কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা, কোথাও সুশীতল সলিলের প্রস্রবণ, কোথাও বা গুহামধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য, কোথাও বা গুহামধ্যে ঘন, কালো অন্ধকারময় মেঘের ঘটা এবং কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় তামসের বিকট বিভাস দর্শন করিয়া পথিকেরা আনন্দে ও আশ্চর্য্যে বিমোহিত হয়েন। ইংরাজিতে এই সকল পর্ব্বতগুহাকে "টনেল" (Tunnels) কহে। টনেলের বাহিরের শোভার সহিত তুলনা করিলে, টনেলের ভিতরের অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের শোভাকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। অনেকে রেলওয়ে-শকটে গমনাগমন-সময় দ্রুতগামী গাড়ী হইতে টনেলগুলিকে লক্ষ্য করেন; কিন্তু পর্ব্বতগুহার ভিতরস্থ পদার্থপুঞ্জকে সুন্দররূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাহা হউক, বোম্বাই হইতে পুণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথের উভয় পার্শ্বস্থ অসংখ্যাসংখ্য দৃশ্যের বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আমি কেবল ইগাৎপুরীনামক স্থান সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন ও প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিব।

উপরি-উক্ত G. I. P. রেলওয়ে-লাইনের ষ্টেশনগুলির মধ্যে ইগাৎপুরী অন্যতম প্রধান ষ্টেশন। একটি অভ্রভেদী অত্যুচ্চ ও অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বতের পাদদেশে প্রাচীনা ইগাৎপুরী প্রতিষ্ঠিতা। এই প্রসিদ্ধ পর্ব্বত "পশ্চিমঘাট"

(Western Ghauts) নামক মহাবিস্তৃত অচলমালার একটী শাখা বা অংশ-মাত্র। হিন্দু, মুসলমান, পর্টুগীজ, ফরাসি, দিনেমার, প্রভৃতিরা বহুকাল ব্যাপিয়া ইগাৎপুরীতে রাজত্ব করিয়াছিল। এক্ষণে ইহা বিক্রমী বৃটিস বীর কর্ত্তৃক অধিকৃত, অনতিদূরে সমুদ্র এবং সমুদ্রের পার্শ্বে সুন্দর "লবণ-দ্বীপ" এখনও পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অতি অল্পদূরে গমন করিলে একটী ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পার হইয়া গেলে আমরা একটী অতীব সুন্দর পর্ব্বতের নিম্নে উপস্থিত হইতে পারি। এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রেলওয়ে-লাইন দর্শন করিলে মনোমধ্যে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদয় হয়। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন; অনন্ত অরণ্য পরিপূর্ণ; অসংখ্যা-সংখ্য হিংস্রশ্বাপদসমাচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে ঘোর, ঘন অন্ধকার সমাবৃত এই অদ্ভুত, অত্যুচ্চ ও অভ্রভেদী পর্ব্বতের উপর দিয়া ইংরাজ পুরুষেরা রেলগাড়ীকে অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও কৌশলসহকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে পর্ব্বতের শিখা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া থাকেন; তথা হইতে আবার গাড়ীকে তিনবার ঘুরাইয়া প্রায় সমু-দয় পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া, আবার পাহাড়ের অপরদিকে গাড়ী চালাইয়া দেন; তাহার পরে আবার ঘুরাইয়া, আর এক দিকে গাড়ীকে ধীরে ধীরে চালাইয়া পাহাড় অতিক্রম করতঃ পর্ব্বতের নিম্নে রেলগাড়ীকে আনয়ন করিতে হয়। পাহাড় অতিক্রম করিবার সময়, গাড়ীতে দুই খানি ইঞ্জিন সংলগ্ন করিয়া না দিলে গাড়ী চলিতে পারে না, একখানি ইঞ্জিন সম্মুখে এবং একখানি ইঞ্জিন পশ্চাতে সংলগ্ন থাকে, পশ্চাতের ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ীখানি সম্মুখের দিকে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। এই অদ্ভুত দৃশ্য, দিবালোকে দর্শন না করিলে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলে শত বিদ্যাসিদ্ধ ইংরাজের অত্যাশ্চার্য্য বুদ্ধি, কৌশল, অধ্যবসায় এবং দেবোপম সাহ-সের যেমন সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হই, পথের দুই পার্শ্বের শোভা সমূহ স্বচক্ষে দিবালোকে দর্শন করিলে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অতুলনীয় মহিমা ও সুন্দর শিল্পকৌশলসমন্বিত কীর্ত্তিমালার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নয়ন ও মনকে পবিত্র ও পরিতৃপ্ত করিতে পারি।

আমি প্রাবৃট-ঋতুতে ইগাৎপুরী গিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, নদী পার হইয়া পর্ব্বতসংলগ্ন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলাম। ইগাৎপুরীর মনোমোহিনী শোভার পরিচয় এই অরণ্য মধ্যেই সুস্পষ্ট ভাবে বর্ত্তমান। বনে প্রবেশ করিলে, নির্ম্মল নির্ঝরণীদিগের কুলু কুলু শব্দ,

নানা জাতীয় বিহঙ্গবর্গের বিনোদ কাকলী লহরী, বহু প্রকারের সুন্দর ও সুগন্ধ প্রসূন-পুঞ্জের নবোচ্ছ্বাস, শ্বাপদদিগের কোলাহল প্রভৃতিতে ইগাৎপুরীর অরণ্য অতিশয় অদ্ভুত দৃশ্যের আকর বলিয়া পরিগণিত। আমি একাকী অরণ্যের ভিতরে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পরে এক মহা পুরুষের আশ্রম দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার পবিত্র আশ্রম, কাননাভ্যন্তরস্থ একটি পর্ব্বত-শাখার অন্যতম গুহার ভিতরে অবস্থিত ছিল। সেই গুহার ভিতরে পুষ্করিণী, পুষ্পোদ্যান, দেবালয়, প্রভৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সেই মহাপুরুষ মহারাষ্ট্র-দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বৈদিক আর্য্যঋষি বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার কত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার যে দেড় শত বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইগাৎপুরীতে মুসলমানের সংখ্যা কম, খ্রীষ্টানেরা অধিকাংশই রোমান-কাথলিক এবং হিন্দুগণের অল্পসংখ্যক লোক শৈব; অধিকাংশ লোক গাণপত্য-মতাবলম্বী। বনের ভিতরে স্থানে স্থানে অনুসন্ধান করিলে বহুল প্রাচীন-কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের গুহাপুঞ্জে এক সময়ে বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাস করিত, কোনও কোনও স্থানে এখনও রোমান-কাথলিক সন্ন্যাসী (monks) দিগের আশ্রম দেখা যায়। বাস্তবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনে, প্রসূন-সুরভি সম্ভারে এবং ষটপদ সম্মিলনে ইগাৎপুরীর অরণ্য অতীব মনামোদিনী।

কৃষ্ণের নরদেহ।

আর্য্য-হিন্দুর শাশ্বত শাস্ত্র-মালাকে যদি একটী সুবৃহৎ বৃত্তাকারে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে যাঁহার চিরপবিত্র শ্রীমুখ কমল হইতে জ্ঞানগুরু ভগবৎ-গীতা গ্রন্থের সনাতন ধর্ম্ম-নীতি সমূহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই বেদব্যাসারাধিত অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই মহাবৃত্তের কেন্দ্র-স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। যাঁহার শ্রীপদ-গিরি হইতে জ্ঞান-গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে ও পৃথ্বি-গুরু আর্য্যজাতিকে বিগতকল্মষ করিয়া এক অতি অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক আনন্দে উৎফুল্ল রাখিয়াছিল, তিনি নরাকারে ভগবান; তিনি ত্রিগুণাতীত ও

ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর হইয়াও "কর্ম্মীমানব"। শ্রীকৃষ্ণ নামে এবং স্থূল-দেহ-ধারী-রূপে তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম। যাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ নিঃসৃত জ্ঞানমধু-পানের জন্য ধর্ম্মকল্পদ্রুম স্বয়ং যুধিষ্ঠির উৎসুক, যে দেবদুর্ল্লভ মধু আস্বাদন করিয়া ভাগবতের ঋষিকুল প্রমত্ত, যিনি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরিবরকে নিমেষ মধ্যে শূন্যে উত্তোলন করিয়াছিলেন, যিনি মহাভারতে এক মূর্ত্তিতে—ভাগবতে দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে—ভগবৎগীতায় তৃতীয় মূর্ত্তিতে—প্রাদুর্ভূত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছিলেন, যে অসীম শক্তিমান বিরাট পুরুষ নন্দঘোষের ঘরে কৃষ্ণ এবং আয়ান ঘোষের ঘরে কালী, তিনি মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের সম্পূর্ণ আদর্শ। বীরাধিক বীর, ধার্ম্মিকাধিক ধার্ম্মিক এবং তপস্বী হইতেও তপস্বী শ্রীমৎ অর্জ্জুনের যিনি প্রণম্য, জ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যাসদেবের যিনি আরাধ্য, ভাগবতের ঋষির যিনি ভগবান, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যিনি উপদেশক, সঞ্জয়ের শরীর যাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতে করিতে রোমাঞ্চিত, শক্তি ও প্রেম-রূপিনী শ্রীমতী রাধিকার যিনি প্রাণসখা, মহাভারত-শাস্ত্র যাঁহার স্তুতিবাদে গৌরবান্বিত, অত্যাচারের অধর্ম্মের দমন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপনের জন্য যিনি কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতির নিহন্তা, বিশ্বত্রাসোৎপাদক সুবিশাল কুরুক্ষেত্রের বিশ্বব্যাপী সমর সুযোগে যিনি বিশ্বকারণ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া মানবের উপদেশক ও ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া গণ্য, যিনি শ্যাম-সলিলা যমুনাতটে মনোমোহন "শ্যাম"রূপে কৃষ্ণ এবং পুণ্যতোয়া সরযূতটে সীতার প্রাণসখা "রঘুপতি" রামরূপে বিরাজিত, কৈলাসে যিনি দেবাদিদেব মহাদেব, গীতায় যিনি অক্ষয় অমর ও অনবদ্য পরমেশ্বর, যিনি নরদেহ-ধারী "কৃষ্ণ" হইয়াও স্বয়ং পরাৎপর পরমব্রহ্ম, আমি সেই গুণাতীত, জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, অজর, অমর, অপ্রমেয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সভক্তি প্রণাম করি। সেই সর্ব্বযুগাধিপতি নিষ্কলঙ্ক অনাদি পুরুষ আমাদের ইহকালের ও পরকালের একমাত্র শাশ্বত সহায়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রবর সেই বিরাট পুরুষের স্তব করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

> "যং শৈব্যাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
> বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
> অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
> সো'য়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্য নাথো কৃষ্ণঃ॥"

সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র জ্ঞানের ভাণ্ডার-স্বরূপ ভগবান বেদব্যাস, গীতা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

১। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃতা ॥

২। সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

৩। সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥

৪। যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥

এখন ভাবিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখারবিন্দ নিঃসৃত শ্রীমৎভগবৎগীতা-শাস্ত্র আমাদের কিরূপ আদর্শগ্রন্থ। এখন ভাবিয়া দেখ, আমাদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিরূপ আদর্শ। বিস্ময়, বিষাদ ও লজ্জার বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ পুরুষকে আমরা চিনিলাম না। মণিকার না হইলে কি মণি চিনা যায়? অধঃপতিত ভারত, এমন মহান্ আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে অসম্পূর্ণ বিদেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে অগ্রসর; ভারত এই জন্যই অন্ধকার হইতে অন্ধকারতর অবস্থায় উপনীত হইতেছে। জনৈক প্রেমিক বাঙ্গালী কবি, শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা-তটে দাঁড়াইয়া সাশ্রুলোচনে গাহিয়াছিলেন—

"এই কি সেই যমুনা? শ্যাম-যমুনা প্রবাহিনী?
যার বিশাল-তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্তমণি?"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সরোবরের শারদীয় সরোজ-স্বরূপ ভক্তাধিক ভক্ত অমর দাশরথী রায় নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেন—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর হে কমলাপতি।
আমার প্রবৃত্তি হবে যমুনা-নদী, ভক্তি হবেন রাধা সতী ॥"

পুনরায় বলি, আর্য্য-হিন্দু! যদি তুমি অধঃপতনের গভীরতম নরকে উপনীত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিতা হইয়া এই সম্পূর্ণ আদর্শকে পরিত্যাগ করিও না, ইহাঁর ঐশীকৃপায় ইহাঁকে বুঝিবার চেষ্টা কর। কিন্তু এই ঐশী পুরুষকে বোধগম্য করা দূরে থাকুক, তোমরা আজি কালি জয়ডঙ্কা বাজাইয়া কহিতে আরম্ভ করিয়াছ, "শ্রীকৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি আদৌ বর্ত্তমান ছিল না, ইহা কবি কল্পনা মাত্র।"

ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পাদ্রী লেখকদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তোমরা প্রথমে কহিয়াছিলে, "শ্রীকৃষ্ণ অতীব কলঙ্কিত পুরুষ, তাহার চরিত্র অতিশয় দুষ্ট

ছিল”—এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছ “শ্রীকৃষ্ণ নামে আদৌ কেহই ছিল না।” ভালকথা বটে! পাদ্রী প্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উপরিউক্ত দুইটি কথার একটিও আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রস্তাবে কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে; শ্রীকৃষ্ণ নামে যে স্থূলদেহধারী (অর্থাৎ মানব-দেহধারী) ব্যক্তি বাস্তবিক বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ কবিকল্পনা নহে; ইনি বাস্তবিক মানবাকারে, স্থূল দেহে, কোটি কোটি মনুষ্য সম্মুখে, এই মর্ত্তধামে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যথাশক্তি তাহাই প্রমাণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা অবতার বাদের বিরোধী, অথবা ভগবান কর্ত্তৃক মানব দেহ ধারণ সম্বন্ধে সন্দিহান, কিম্বা স্পষ্টতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ঈশ্বর অথবা অবতার অথবা আদর্শ বা সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত, তাঁহা-দের নিকটে আমি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব, অবতারত্ব, সম্পূর্ণত্ব অথবা একাধারে দেবত্ব ও অন্যাধারে মানবত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে কবিকল্পনা নহে, অর্থাৎ নরদেহে (স্থূলশরীরে) শ্রীকৃষ্ণ যে বাস্তবিক বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের শরীর লইয়া কথা উপস্থিত; তাঁহার Personality লইয়াই প্রসঙ্গ উত্থিত; সুতরাং রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদময় শরীরী শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব প্রতিপাদন জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমার উদ্দিষ্ট বিষয়কে সাব্যস্ত করিবার জন্য অগণ্য প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও আমি আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ দিয়া মানব-দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

১ম। জগদ্বিখ্যাত কুরুপাণ্ডবীয় সমরে যত লোক একত্রিত হইয়াছিল, সভ্য ও অসভ্য জগতের ইতিহাসে বর্ণিত আর কোন যুদ্ধে এত লোক কখন একত্র হয় নাই। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত এত বড় আহব আর কখন কেহ শ্রবণ বা পাঠ করে নাই। এই মহা সমরের ইতিহাস ইহজগতে অতুল। এমন যুদ্ধ আর কখন ধরাতলে ঘটে নাই।

পৃথিবীর সমুদয় প্রধান বীর, প্রধান সারথী, অস্ত্রধারী, তেজস্বী অশ্ব, রণ-মত্ত হস্তি, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত, সমরকুশল যোদ্ধা, বিক্রমী রাজা, সুচতুর শিল্পী, মন্ত্রণাদাতা, প্রাজ্ঞদর্শক, প্রাড়বিবেকী বিচারক প্রভৃতি এই মহাযুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা একত্র

হইয়াছিল। ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তি, ১০৯৩৫০ পদাতি-সৈনিক, ৫০,০০০ শতঘ্নীধারী সেনা, ১২৫,০০০ তরবারীধারী সেনা, দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী বীর, পঞ্চদশ সহস্র পঞ্চশত পঞ্চজন (সেনাধিপতি) প্রধান বীর এবং অষ্টাদশ সহস্র দ্রুতপদ যুবক সেনাপুরুষ, অর্থাৎ সমুদয়ে ৫৫১, ২৫০ প্রাণী সমবেত হইলে এক অক্ষৌহিনী হয়। এমন অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা কুরুক্ষেত্রের বিশ্ববিখ্যাত সমরে সমবেত হইয়াছিল। * শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রক্তমাংসমেদময় মনুষ্য শরীরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজা, যোদ্ধা, বীর, পণ্ডিত, যোগী, সাধু, সারথী এবং দর্শকের সম্মুখে দৃষ্টমান ছিলেন। অন্য স্থানের কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল কুরুক্ষেত্রের কথা লইয়াই আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে প্রায় এক কোটী প্রাণী সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টমান ছিলেন। এই এক কোটি প্রাণীর মধ্যে পৃথিবীর সভ্য মানব সমাজের অলঙ্কারসমূহ বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির, যোগীবর অর্জ্জুন, সমরকুশল ভীম, সত্যবাদী নকুল ও সহদেব, মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেতিকান, মহাবলী কাশীনরেশ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরপুঙ্গব শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, প্রবল বীর্য্যসম্পন্ন উত্তমৌজা, সপ্তরথী সমতুল্য অভিমন্যু, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, দ্রুপদ প্রভৃতি তথায় একত্র হইয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে কি? ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্থূল শরীরকে (মানবীয় দেহকে) দর্শন করিয়াছিলেন। কাহারও ব্যক্তিত্ব Personality প্রমাণ করিতে হইলে, ইহাই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও প্রবলতর প্রমাণ, আর কাহারও সম্বন্ধে, পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাস দিতে সক্ষম হয় নাই। সনাতন হিন্দুর সৌভাগ্য বলে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রবলতম প্রমাণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, পৃথিবীর আর কাহারও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তদপেক্ষা সুন্দরতর প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

২য়।—খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি এক্ষণে ধরাধামে জীবিত নাই। তথাপি খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন। যে উপায়ে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদের অস্তিত্ব প্রমাণীত

* অভিধানে ও গীতার টীকায় অনেকে অক্ষৌহিনী শব্দের অর্থ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।—লেখক।

হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব তদপেক্ষা লক্ষগুণ সুন্দরতররূপে প্রমাণিত হয়। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদের মানব-শরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রয়োজিত হয় বা হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় মহা প্রবল প্রমাণের নিকট তাহা সামান্য বা নগণ্য, অথচ কৃষ্ণকে কবিকল্পনা বলিবার অধিকার তুমি গ্রহণ কর কেন? কি নিবুর্দ্ধিতা! কি ভয়ানক ভ্রম! যাহা হউক, রোমক-দিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, "মাত্র একব্যক্তির সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়া হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইতে পারে।" মনে কর, লর্ড রিপণ অথবা সার হেনরী কটন কিম্বা পণ্ডিতপ্রবর ও সাধুপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় এক জন লোক যদি কহেন,—"শ্যামাচরণ বসু, অঘোরনাথ পালিতকে হত্যা করিয়াছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি" তাহা হইলে কেবল এই এক সাক্ষীর কথায় নির্ভর করিয়া, বিচারক মহাশয় আইন মতে শ্যাম বসুর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় আদালতের নজীরাবলী হইতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, বেদব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ, কৃপ, সঞ্জয়, মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডি, দ্রোণাচার্য, নরপুঙ্গব শৈব্য প্রভৃতি লর্ড রিপণ, সার হেনরি কটন, বিদ্যাসাগর বা কেশব সেন হইতে কত কোটি শ্রেষ্ঠতর? প্রথম প্রমাণে দেখাইয়াছি—সাক্ষী সংখ্যা; এখন দেখা-ইলাম—সাক্ষ্যদাতার গুণ, মর্য্যাদা ও চরিত্র। Quality and quantity এতদুভয়ই শ্রীকৃষ্ণের স্থূল-শরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ। সাক্ষ্য বিষয়ক অইেন অনুসারে সাক্ষী সংখ্যা এবং সাক্ষ্যদাতাগণের গুণ, মর্য্যাদা ও চরিত্র, বিচারক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব (Personality) সম্বন্ধে ইহা অকাট্য প্রমাণ।

তৃতীয়।—মহাভারত, ভাগবত, ভগবৎগীতা প্রভৃতি অগণ্যশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে; তাঁহার মুখ, পদ, পরিচ্ছদ, হস্ত, কর্ণ, মাথার চুড়া, গলার মোহন মালা, হাতের বাঁশি, কণ্ঠের স্বর, বাঁশীর স্বর, দেহের বর্ণ, পরিচ্ছদের ভাব, ওষ্ঠের রং, দন্তের সংখ্যা প্রভৃতি পর্য্যন্ত বিবৃত আছে। পুত্তলিকারও অবশ্য এপ্রকার বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু পুত্তলিকা কথা কহেনা, চলেনা, দেখে না, খায়না, হাসেনা এবং শ্রবণ করেনা। শ্রীকৃষ্ণের কথোপ-কথন, চলন, দৃষ্টি, শ্রবণ, কণ্ঠ স্বর, এমন কি, বহুপ্রকার ক্রিয়া কলাপ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ধার্ম্মিকপ্রবর মহামতি জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় স্বয়ং কহিলেন,

"আমি শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ নিঃসৃত অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিমোহিত ও পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতেছি।" তিনি রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বিশিষ্ট-ভাবে কহিয়াছেন "যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং" (গীতা ১৮ অঃ। ৭৫ শ্লোক) অর্জ্জুন কহিতেছেন, "হে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)! আপনার প্রসাদে আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে। আপনার মুখনিসৃত উপদেশমালা শ্রবণে আমি আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করিয়াছি।" (গীতা। ১৮ অঃ। ৭৩ শ্লোঃ) এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বাক্য নিঃসরণের প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহা হইলেই বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণ কবিকল্পনা নহেন। এরূপ প্রমাণ অগণ্য সংখ্যায় বর্ত্তমান আছে। "কৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন"—সঞ্জয়ের ইহাই সাক্ষ্য। কৃষ্ণ যদি কল্পনার কৃষ্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রবণ, দর্শন, চলন, স্পর্শন, কথোপকথন প্রভৃতি কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

চতুর্থ প্রমাণ।—শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহর্ষি বেদব্যাস এবং বেদব্যাস সমতুল্য ঋষিবর ও মনিষীবরগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, লালন, পালন, লীলা, ক্রিয়া কলাপ; রাজ্যশাসন, যুদ্ধসাজ, ধর্ম্মোপদেশ, মৃত্যু বা অন্তর্দ্ধানের বিবরণ, জীবনচরিত্র লেখকদিগের ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান রাশিকে একত্র করিলে যাহা হয়, বেদব্যাসের জ্ঞান তাহা অপেক্ষা অধিকতর ছিল। বেদব্যাস এবং অন্যান্য জগৎপূজ্য ঋষিগণ কি এমনই নির্ব্বোধ, এমনই পাগল এবং এমনই অসার লোক ছিল যে, একটা কবি-কল্পনার মূর্ত্তির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিবরণ লিখিয়া অমূল্য জীবনকে বৃথায় যাপিত করিয়া গিয়াছেন? কল্পনায় কি এত সূক্ষ্ম বর্ণনা সম্ভবে? বৈদিক শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। বেদ হইতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিম্বা নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ পর্য্যন্ত, সকলেই কি নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া একটা কল্পনার ভজন, পূজন, কীর্ত্তন, প্রশংসা, চরিত্র বর্ণন, লীলার ব্যাখ্যা, ইতিহাস লিখন প্রভৃতি মহাপ্রেমময় অথচ গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন? কল্পনায় কি এ সকল সম্ভবপর হয়?

পঞ্চম।—গ্রীশ দেশের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, পদার্থ না থাকিলে যেমন তাহার ছায়া হয় না, আদর্শ না থাকিলে তাহার কল্পনাও হয়না। স্বীকার করিতে হইবে সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নামে নর দেহধারী মূর্ত্তি ছিলেন, অথবা তৎসমতুল্য মনুষ্য বর্ত্তমান ছিলেন, নতুবা কল্পনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? মানব মাত্রেই সসীমবুদ্ধি ও সসীম মানসবিশিষ্ট প্রাণী; সসীম বুদ্ধিতে অসীম বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণের কল্পনা হয় না ও হইতে পারে না। যদি হয়, তাহা হইলে

যিনি কল্পনাকারী, তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ সমতুল্য, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে, যেখানে আদর্শ নাই, সেখানে আদিমত্ব নাই। আদিমত্ব বা আদর্শ না থাকিলে সসীমবুদ্ধি মানবের মনে উদ্ভাবন শক্তিও উপজিতে পারে না, বিশেষতঃ ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহা কদাপি সম্ভব নয়। একখানা ইংরাজি গ্রন্থে একজন সুলেখক Utopian Government (ইউটোপীয়ান গবর্ণমেণ্টের) কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, এই ইংরাজি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ "আদর্শ রাজ্য।" গ্রন্থকর্ত্তার জীবনচরিত আলোচনা করিলে জানা যায়, ইনি হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং সেই আদর্শানুসারে Utopian form of Government এর কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কল্পনা কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পৃথিবীতে উপরি উক্ত লেখকের কল্পিত আদর্শ রাজ্য সম্ভবে না। এমন আদর্শ নরপতিও মর্ত্ত্যধামে সম্ভবে না। এইজন্য সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক রাজা ও রাজ্য অসম্পূর্ণ আদর্শ। যাহা কল্পিত, তাহা ঠিক কখন কার্য্যে আইসে না, আসিলেও পূর্ণভাবে আসিতে পারে না, ইহাই সংসারের নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ যদি কবি কল্পনা হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি, কার্য্য, জীবন প্রভৃতি কখনই সম্পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ হইত না, কারণ কল্পনা কখনও পূর্ণ আদর্শ হইতে পারে না; পৃথিবীর ইতিহাস, মানবের জীবন, শাস্ত্র, যুক্তি এবং ধর্ম্মজগত ইহার অমর সাক্ষী। ইহা বিজ্ঞানের কথা সুতরাং সতত অকাট্য সত্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক শরীরী; কবি কল্পনা নহে।*

ষষ্ঠ।—শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, বংশাবলী, মৃত্যু বা অন্তর্দ্ধানের বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে আছে। আদি পুরুষ হইতে যদুবংশের ধ্বংস পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষ ও রমণীর নাম ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ হইতে সমুদ্ভূত,

* অনেকে কহিতে পারেন, সসীমবুদ্ধি বিশিষ্ট মানব অসীমশক্তি বিশিষ্ট পরমেশ্বরের কেমনে কল্পনা করিতে সমর্থ হইল? উত্তর এই, সসীম মানব অদ্যাপি সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানকে চিনিতে বা জানিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। ভগবানের সম্পূর্ণ বর্ণনা, সসীম মানুষ দ্বারা এখনও হয় নাই। যাঁহারা ভগবানকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা সসীমবুদ্ধির লোক ছিলেন না। আর এক কথা এই, ভগবান স্বয়ং তাঁহার আদর্শ ঋষিগণকে দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং কল্পনায় করুণাময় ঈশ্বরের বর্ণনার উৎপত্তি হয় নাই।—লেখক।

ঐ বংশের সমুদয় ইতিবৃত্ত এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পুরুষের কার্য্যাদির বিবরণ উল্লিখিত আছে। কবিকল্পিত পুরুষের পক্ষে এরূপ বর্ণনা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যেখানে বিবাহ করেন, সে সকল স্থান, বংশ ও নগর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। কল্পিত মূর্ত্তি কি বিবাহ করে? শ্রীকৃষ্ণ যদি কল্পিত মূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁহার শ্বশুরালয়, শ্বশুর-বংশ, বিবাহের স্থান, স্ত্রী ও আত্মীয়ের বিবরণ, বিবাহক্রিয়া, জন্ম, মরণ, লীলা ইত্যাদি সমুদয়ই কল্পিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা নহে। ঐ সমুদয় বংশ, স্থান, কীর্ত্তির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কল্পিত মূর্ত্তির পক্ষে কি ইহা সম্ভবপর?

সপ্তম।—শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতা-শাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার শ্লোক সংখ্যা সপ্ত শত। এই জগদ্বিখ্যাত শাস্ত্রের আগুন্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখারবিন্দনিঃসৃত মধুর বাক্যাবলীতে পরিপূর্ণ। বেদব্যাস ঐ সুমধুর বাক্যাবলীর সংগ্রাহক, সঞ্জয় উহার কথক, সমগ্র জগত উহার পাঠক, শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন সরস্বতী, রামানুজ, নীলকণ্ঠ, বলদেব, গোস্বামী, আনন্দতীর্থ, বিশ্বনাথ ঠাকুর, মিষ্টার জাষ্টিশ ত্রিলং, বশুদ্ধানন্দ গিরি, ভাস্করাচার্য্য, মোক্ষমূলর, অষ্টিন্, শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি প্রভৃতি ইহার টীকাকার, আচার্য্য মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইহার অনুবাদক, * আচার্য্য ওয়েবর, সোপেনহর, প্রভৃতি ইহার প্রশংসক এবং মহা ধার্ম্মিক যোগী ও সন্ন্যাসীবৃন্দের ইহা জ্ঞাননিধি। যদি কৃষ্ণ কবিকল্পনা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভাগবত, সমগ্র মহাভারত, সমগ্র ভগবৎগীতা, সমগ্র পৌরাণিক শাস্ত্র,গীতগোবিন্দ এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য কেবল কল্পনাকুহকে পরিপূর্ণ বলিতে হয়!! এই হিসাবে বাইবেল, কোরাণ এবং জেন্দাবস্তা প্রভৃতি জগতের সমুচয় ধর্ম্মশাস্ত্র কেন কল্পনা-কুহক না হইবে? ইহা সম্ভবপর নয়; কৃষ্ণ-চরিত্র কবি-কল্পনা নহে এবং হইতে পারে না; কৃষ্ণচরিত্র যদি কল্পনা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একটা ধর্ম্মশাস্ত্রও কবি-কল্পনা হইতে বাদ যায় না, একটা ধর্ম্মও তাহা হইলে কল্পনা রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হয় না; তাহা হইলে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, জিহুদেব, অর্হত, মুসা প্রভৃতি কোথায় থাকেন? তাহা হইলে সাক্ষ্য-বিষয়ক আইন মালা(Evidence Act) এবং তৎসঙ্গে আদালত,বিচারক, ন্যায় বিচার, যুক্তি ও বিবেককে জলে ফেলিয়া দিতে হয়।

---

*শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতা শাস্ত্র পৃথিবীর ২৪টা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। লেখক।

অষ্টম। কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সখা ছিলেন না। কৌরবদিগের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে উত্তেজিত করা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণের শত্রু; কৌরবেরা কৃষ্ণকে তাঁহাদের শত্রুর প্রধান সহায় বলিয়া জানিতেন। সুতরাং কৌরবেরা কৃষ্ণকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। এই শত্রুরাই শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। কৌরবেরা এবং কুরুকুলপক্ষীয় পণ্ডিতেরা লক্ষাধিক বার কহিয়াছেন "আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়াছি, আমরা সেই মন্ত্রণা-দাতাকে দর্শন করিয়াছি, তাঁহার কূট মন্ত্রণা জানিয়াছি, তাঁহাকে পাণ্ডব প্রাসাদে যাইতে দেখিয়াছি" ইত্যাদি; গীতায় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "তাহার পরে কৃষ্ণ কি কহিলেন? তদনন্তর কৃষ্ণ কি করিলেন?" ইত্যাদি। শত্রু পক্ষ হইতে ইহা শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক অস্তিত্বের (নরদেহে বর্ত্তমান থাকার) অকাট্য, অখণ্ড, অনবদ্য, অমর প্রমাণ।

নবম।—জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৈরী। এই শত্রুগণ শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি কথাও কহেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদেরই ইতিহাস লেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন। কল্পিত মূর্ত্তির সহিত অশ্ব ও সেনা এবং সারথী লইয়া, বীরসাজে, কেমনে সমর সম্ভবে? এই রাজাধিরাজেরা, এই বীরেরা কি ক্ষিপ্ত ছিলেন? তাঁহারা এত বড় যোদ্ধা ও বিক্রমী নরপতি হইয়া একটা কবি-কল্পনার মূর্ত্তির সহিত কি লড়াই করিতে গিয়াছিলেন? প্রকৃত কথা এই, "সম্ভবত্যে বাক্যত্বে বাক্য ভেদো নজায়তে।" অর্থাৎ জৈমিনি ঋষি লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা সত্য বা সম্ভব, তাহাতে বাক্য-ভেদ চলে না। কৃষ্ণের নরদেহে বর্ত্তমান থাকার কথা জীবন্ত সত্য, ইহার উপরে তর্ক চলে না। অবিবেকী পুরুষেরাই কূটতর্ক দ্বারা জগতের সমুদয় জ্বলন্ত সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরিণামে তাহারাই পরাজিত হইয়া পৃথিবীতে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ইতিহাস ইহার অমর সাক্ষী। জগৎপূজ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কবিকল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা আর বালকের দ্বারা গিরিরাজ হিমালয়কে ধরাশায়ী করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উদ্যম করা একই কথা।

দশম প্রমাণ।—দ্বারকা, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি কয়েকটি স্থান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলার জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রজধাম, কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনা-রাজ্য এবং তদ্ব্যতীত আরও দুই একটি স্থান ভারতীয় ইতিহাসে কৃষ্ণের কার্য্য-কলাপাদির জন্য প্রখ্যাত। বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া ব্রজধাম এবং হস্তিনা রাজ্য অবস্থিত ছিল।

ইতিহাসোল্লিখিত এই সমুদয় স্থান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান, লীলাস্থান, লালন পালনের গ্রাম ও গৃহ, কুরুক্ষেত্রের কীর্ত্তিমালা, যমুনা নদী, মধুবন, তমালবন, কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ প্রভৃতি, গোবর্দ্ধন গিরি, কালিন্দি, দ্বারকার রাজপাট, প্রভাস, রাসলীলার স্থল ইত্যাদি এখনও বর্ত্তমান আছে। নন্দ ঘোষের গৃহ, নন্দগ্রাম, বসুদেবের গৃহ, আয়ানপুর, প্রভৃতি কত অগণ্য নিদর্শন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের রাজ্য গুজরাটে বর্ত্তমান আছে। বোম্বে-বরোদা-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উমরেৎ নামক ষ্টেশন হইতে ডাকোর নামক স্থানে বলরামের রাজ্যের ও রাজত্বের চিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন ইতিহাস-বর্ণিত রাজ্য, রাজত্ব, আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় অদ্যাপি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখা যাইতেছে, তখন কৃষ্ণকে আর কবি-কল্পনা বলিবার অধিকার কোথায়?

একাদশ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-স্থলে স্বীয় ঐশীশক্তি (ঈশ্বরত্ব) সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন কহিয়াছিলেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।
যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু
একোথবাপ্য চ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।

এই শ্লোকে বা স্তুতি বচনে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন "সখা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ভোজন, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন, উপহাস প্রভৃতির সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ "অমিত বীর" কহিয়াছেন। এই সকল কি কল্পিত মূর্ত্তির কার্য্য হইতে পারে? বিশ্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নরমূর্ত্তি দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন সুস্পষ্টভাবে কহিলেন—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

দ্বাদশ—যুগযুগান্তর হইতে "রাধাকৃষ্ণ," "হরেকৃষ্ণ," "রামকৃষ্ণ" প্রভৃতি মধুরবাণী শ্রুতিগোচর হইতেছে। কৃষ্ণ নাম একা অসংখ্য, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুভক্তেরা রাম, হরি, রাধিকা প্রভৃতির সহিত সুমধুর কৃষ্ণনামটিকে সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীদাম, সুদাম, যশোদা, অর্জ্জুন, গোপীজন, নন্দঘোষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন মধুর নাম বা উপাধি দিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ভক্তেরা কল্পিতমূর্ত্তিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন, অনাদি, অব্যয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের নাম বা উপাধির সহিত কখন সংযোজিত করে নাই। কৃষ্ণ যদি কবিকল্পনা হইত, তাহা হইলে, হরেকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণ নাম শুনিতাম না। আর এক কথা, শ্রীমতী রাধিকা কি একটা কল্পিতমূর্ত্তির প্রেমে আবদ্ধা হইয়াছিলেন?

ত্রয়োদশ।—আমি ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, বৈদিক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে; অসংখ্য নরনারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। তৎকালে ভারতের প্রধান প্রধান বীর, যোগী, যোদ্ধা, নরপতি, পণ্ডিত, বিবেকী, বিচারক প্রভৃতি কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। এখন ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক রাজা, রাণী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক পুরুষ, সন্ন্যাসী, যোগী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও ভজক। শ্রীকৃষ্ণের এত প্রভাব ছিল যে, তিনি পার্থিব লীলা সম্বরণ করিলে গভীর অন্ধকার আসিয়া ধর্ম্মজগৎকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকার যেমন অধিকতর অন্ধকারময় হয়, ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে চিন্তাশীলতা, সে স্বাধীনতা, সে উদারতা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল; দর্শনের সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধতা, সাত্বিকতার হীনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তের কেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার চরিত্র ও নীতিবলে ভারত উন্নত; শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পূর্ণ আদর্শ। তাঁহার জীবনে একাধারে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কল্পিতমূর্ত্তির কি এই প্রভাব হইতে পারে? যুগ যুগান্তর হইতে কল্পনার কি কেহ ভক্ত, উপাসক, প্রশংসক, গায়ক, কীর্ত্তনক এবং পূজাকারী হয়?

চতুর্দ্দশ।—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং ভূত-ভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবৃন্দ মহাভারত লিখিয়া গিয়াছেন। তোমরা কি বিবেচনা কর, ইঁহারা ক্ষিপ্ত, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা নির্ব্বোধ ছিলেন? যদি তাহা বিবেচনা কর বা

করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার কথোপকথন বা বাদানু-বাদের আবশ্যকতা নাই, এবং তোমাদের জন্যও এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণ কবিকল্পনা হয়, তাহা হইলে সমস্ত মহাভারত কবিকল্পনা হইয়া পড়ে। ভাগবতের ন্যায় মহাভারতেও কৃষ্ণ-কার্য্যাবলী পরিষ্কাররূপে এবং সূক্ষ্মভাবে লিখিত আছে। প্রহ্লাদ যাঁহার উপাসক, তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুব যাঁহার ধ্যানে মহাযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ ও অমর, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শুক, সনাতন, নারদ যাঁহার মধুর গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। এ সমুদয়ই কল্পনা না কি?

পঞ্চদশ প্রমাণ।—শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মরণ বা অন্তর্দ্ধান বর্ণিত আছে। বৃক্ষ, ব্যাধ, তীর, স্থান, সময়, কারণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। কল্পনার কি মৃত্যু আছে? এ সমুদয়ও কি কবিকল্পনা? তাহা হইলে ত পৃথিবীর সমুদয় শাস্ত্র এবং সমুদয় ইতিহাস কল্পনাতেই পরিণত হইয়া যায়! কৃষ্ণ যদি কবিকল্পনা বলিয়াই তোমাদের ধারণা হয়, বা ধারণা থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণচরিত্র লইয়া এত উপহাসের উৎপত্তি হয় কেন? তাহা হইলে ঐ চরিত্রকেও কেন কল্পিত চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস না কর? তাহা হইলে "কৃষ্ণের চরিত্র কলঙ্কিত ছিল" এ কথা কহিবার তোমার অধিকার কোথায়?

ষোড়শ প্রমাণ।—অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—

১। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

২। অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

৩। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥

৪। সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামিতে হিতং।

৫। মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণা ইব॥

৬। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥

৭। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

৮। অব্যক্তং ব্যক্তি মাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মত্তুমম্॥
মূঢ়োয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥

৯। য ইদং পরমং গুহং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিংময়ি পরাং কৃত্বামামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভূবি॥

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিতেছেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদ মিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥

এই সমুদয় শ্লোক শ্রীমৎভগবৎগীতা হইতে উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে ইহার অর্থ শ্রবণ কর। প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকে কৃষ্ণ কহিতেছেন 'হে অর্জ্জুন, তুমি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) একমাত্র শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় বা চিন্তা করিও না।" দ্বিতীয়োদ্ধৃত শ্লোকে কহিতেছেন "আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সমুদয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত। আমাকেই সকলে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে।" তৃতীয় শ্লোকে কহিতেছেন "হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি তন্মন হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, সর্ব্বদা আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকে তুমি নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার প্রিয়পাত্র, আমি প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইহা কহিতেছি, ইহা অসত্য হইতে পারে না।"

পাঠকদিগকে আমি এখন জিজ্ঞাসা করি, বিশেষ বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিয়া, মানবের সামান্য বা সাধারণ বুদ্ধি (Common sense) অনুসারে, ইহা কি সহজেই বোধ হয় না যে, এই উক্তি বা এবম্প্রকার উক্তি কখন কল্পিত মূর্ত্তির হইতে পারে না? তাহার পরে দেখ; তিনি চতুর্থ শ্লোকে কহিতেছেন "হে অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণের জন্য আমি যে জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।" পরবর্ত্তী শ্লোকে কহিতেছেন "আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই (কারণ আমি ঈশ্বর)। মণিসমূহ সূত্রে যেমন গাঁথা থাকে বলিয়া "মালা" হয়, সমগ্র বিশ্ব আমাতে স্থিত বা আশ্রিত বলিয়া ভবধাম তিষ্ঠিতেছে।" অন্যান্য শ্লোকের অর্থের আর প্রয়োজন দেখি না। অষ্টম শ্লোকে তিনি কহিয়াছেন, "মূঢ়েরা আমাকে জানে না"; তৃতীয় শ্লোকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন "আমি প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইহা কহিতেছি, ইহা মিথ্যা হইতে পারে না।" এই সকল কথা

যদি কল্পিত মূর্ত্তির কথা হয়, তাহা হইলে যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সহিত রজক গৃহস্থিত লম্বকর্ণের বিশেষ প্রভেদ দেখি না। ইহার পরে গীতার শেষে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে সঞ্জয়ের ধ্রুববাক্য এই—"হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, এতদুভয় মধ্যে যে অত্যদ্ভুত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমি আপনাকে কহিলাম।"ইত্যাদি। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! আমার মানুষরূপ দেখিয়া অনেক মূর্খ আমাকে মানব বলিয়াই বিবেচনা করে।" চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কহিয়াছেন—

"এই পরম গুহ্য ও হিতকর যোগবিদ্যা আমি যাহা তোমাকে কহিলাম, তাহা পূর্ব্বে সূর্য্যকে শুনাইয়াছিলাম, সূর্য্যের নিকট মনু এবং মনুর নিকট ইক্ষ্বাকু এবং তাহার পরে উত্তরোত্তর ঋষিগণ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন।" অর্জ্জুন কহিলেন "আমি সর্ব্বপ্রকারে এক্ষণে তোমার শরণাগত হইলাম।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "আমার এই উপদেশ সমূহ যিনি মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় হইবেন।" এই শ্লোক-সমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ ও ইহার ভাব লইয়া চিন্তা করিলেই পাঠকেরা বুঝিবেন, কৃষ্ণ কবি কল্পনা নহেন।

সপ্তদশ প্রমাণ।—মানব মাত্রেই সসীম বুদ্ধি-সম্পন্ন,পরমেশ্বর ব্যতীত অসীম বুদ্ধি কাহারও নাই,সসীমবুদ্ধি বিশিষ্ট মানবের কল্পনাও সসীম হয়,সুতরাং সেই কল্পনা সম্পূর্ণ আদর্শ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র "সম্পূর্ণ আদর্শ"। তাঁহার আদর্শের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে অগণ্য অখণ্ড প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর বহু পণ্ডিত ইহার অমর সাক্ষী। * শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনা,মানব কর্ত্তৃক সম্ভবে না; এই আদর্শের পূর্ণতা দ্বারাই বুঝা যায়, ইহা মানবমনের বা মস্তিষ্কের কল্পনা নহে।

অষ্টাদশ প্রমাণ।—যুগযুগান্তর হইতে, বৈদিক শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ; কেবল প্রসিদ্ধ নহে,এবম্প্রকার প্রবাদ কোটি কোটি নর নারী সমাজে প্রচলিত। ইঁউরোপীয় আমেরিকীয় ও ভারতবর্ষীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা

---

* শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ আদর্শত্বের যুক্তি ও প্রমাণ সম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতুহল থাকে, তাঁহাদিগকে"ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী"গ্রন্থের ১ম খণ্ড পাঠ করিতে অনুরোধ করি—লেখক

কহেন, অতি পুরাতন প্রবাদের মূলে অন্ততঃ কিছু সত্য বর্ত্তমান না থাকিলে প্রবাদ কখন ক্রমান্বয়ে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রবহমান হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রপ্রখ্যাত পুরাতন প্রবাদকে কেমনে উপেক্ষা করিতে পার? মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যাঁহার নামে প্রেমোন্মত্ত, পাণ্ডবেরা যাঁহার ভক্ত, অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, প্রহ্লাদ যাঁহার উপাসক, তিনি কখনও কবি-কল্পনা হইতেই পারেন না।

ঊনবিংশ প্রমাণ।—পাঠকেরা অবগত আছেন, শ্রীবৃন্দাবন-ধামে শ্রীশ্রী-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভুবন-বিখ্যাত রাসলীলা সম্পন্ন করেন। যাঁহার ছবি লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া সকলকে চরম লক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে, সেই বেদবেদ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরমতত্ত্বের লীলা-মাধুরী এই রাসলীলায় প্রকটিত হইয়াছে। অনুরাগপূর্ণ জ্ঞানাগ্নি-বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা—মাহাত্ম্য রাসলীলা দ্বারা পরিষ্কার রূপে উদ্ভাসিত হয়; এই লীলায় কুরুচির আতঙ্ক নাই। রাস-অভিসার সত্য ও নিত্য। ৮ কাত্যায়নী পূজা দ্বারা পরি-স্কৃত চিত্তহ্লাদিনী শক্তির বিকাশে জীবব্রহ্মের যে নিত্য রমণ হয়, রাসলীলা সেই অপার্থিব, অলৌকিক সম্মিলন। বেদে যে সকল বিষয় ইঙ্গিতে বর্ণিত, যাহার একদেশমাত্র উপনিষদে জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, সেই সকল প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত নিগূঢ় তথ্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রহস্যের ভিতর দিয়া ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে। নিগম কল্পতরু মধ্যে শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্জক ভাগবত পুরাণ অতি উপাদেয়। রাসলীলা পাঠ করিলে, পাঠকেরা দেখিবেন, লীলা স্থলে যত গোপিকা ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সমীপে বা সম্মুখে একটী করিয়া কৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন। এ স্থলে বিবেচনা কর, মাত্র এক কৃষ্ণের কথা হইতেছে না, কৃষ্ণের শত শত নরমূর্ত্তির কথা হইতেছে। এস্থলে কৃষ্ণচন্দ্রের বহুল নরমূর্ত্তির অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। যদি কৃষ্ণ কবিকল্পনা হইতেন, তাহা হইলে, গোপিকারা কি কল্পনাকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলেন? কল্পিতমূর্ত্তির প্রেমে অন্ধ হইয়া কি তাঁহারা সাংসারিক সমুদয় অনিত্য পদার্থকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন? যদি রাসলীলাও তোমাদের নবীন মতানুসারে কবিকল্পনা হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে "কলঙ্কিত পুরুষ" বলিবার অধিকার তোমার কোথায় থাকে? রাসলীলা যদি কুরুচিকর হইত, তাহা হইলে ভাগবতের ভগবৎতুল্য মহর্ষিগণের কল্পনায় ইহা আদৌ সৃষ্ট হইতে পারিত না।

বিংশ প্রমাণ।—য়িহুদীদিগের অতি প্রাচীন ওল্‌ড টেস্‌টামেণ্ট গ্রন্থে, খ্রীষ্টানদের বাইবেলে, বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যে এবং জৈনদিগের বহু পুস্তকে আমি শ্রীকৃষ্ণের বহু উক্তি দেখাইয়া দিতে পারি। কোন কোন উক্তি সম্পূর্ণভাবে এবং কোন কোন উক্তি অসম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিধ অতি প্রাচীন শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও গ্রন্থে এই সকল উক্তি কি কল্পিত মূর্ত্তির কথা? যুগযুগান্তর হইতে কি কল্পনা লইয়াই সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ?

আর অধিক প্রমাণ দিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁহারা নিজের নয়নদ্বয়ে দুইটি হাত রাখিয়া ছলনা করেন "আমি অন্ধ, আমি সূর্য্য বা সূর্য্যালোক দেখিতে পাই না" তাহাকে কেহ সূর্য্যালোক দেখাইতে পারে কি? যাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে কুশিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমাত্মিকা ধারণা সমূহ পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারা হয়ত তাহাদের সমস্ত জীবনেও তাহাদের এই প্রাণঘাতী ভ্রম বুঝিতে পারিবে না। পরিশেষে কেবল একটি মাত্র কথা কহিয়া আমি প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব, সম্পূর্ণ আদর্শত্ব এবং নরদেহে বর্ত্তমানের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী, তাঁহার নাম মহর্ষি বেদব্যাস। মহাভারত এবং যাবতীয় পৌরাণিক শাস্ত্রের মঙ্গলাচরণে মুনি ও ঋষিরা কহিয়াছেন "আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে নারায়ণ, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবের জয়োচ্চাচরণ" করিয়া নমস্কার করি। ব্যাসদেব যে কি অপার শক্তি ও অসীম গুণ সম্পন্ন, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—

নমোস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে! ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণ প্রজ্বালিতোজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

এ হেন ব্যাসদেব পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন ও লিখিয়াছেন "ভগবান্ স্বয়ং নরদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামে ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।"

হেরড সাহেবের হাকিমী।

তিন পণ্ডিতে রক্ষা নাই, পাঁচ পণ্ডিতে গাধা।
রামা শ্যামা পলায়ে গেল, ধরা পড়্‌লো মাধা॥

মাধবপুর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর এক খানি পুরাতন গণ্ডগ্রাম। অনেক দিন হইতে এখানে একটী পুলীশ-ষ্টেশন (থানা) আছে, সেই থানার দারোগার

নাম মৌলবী এনায়ৎ হোসেন। মৌলবী সাহেব বয়সে বৃদ্ধ, পেন্সনের উপযুক্ত, কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া আরও কয়েক বৎসর ইহাঁকে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন, এজন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত দারোগা সাহেব থানার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিতেছেন। তিনি সেকালের পাঠশালায় কিঞ্চিৎ উর্দ্দু ও পারস্য এবং বাঙ্গালা ভাষার পাঁচখানি পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। কেশবপুরের থানার এলাকা খুব বড়, এলাকায় অনেক গ্রাম, সুতরাং স্থানে স্থানে আউট পোষ্ট (ফাঁড়ি) আছে, একটা ফাঁড়ির নাম যাদবপুর। এই আউট পোষ্টের বৃদ্ধ ফাঁড়িদারের নাম মৌলবী রফিক্ হোসেন। ফাঁড়িদার সাহেব দারোগা সাহেবের প্রায় সমতুল্য পণ্ডিত, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য আরও কিছু কম। সাধারণ লোকে জানে, কেশবপুর থানার দারোগার, আর যাদবপুরের ফাঁড়িদারের তুল্য পণ্ডিত ইংরাজ রাজত্বের কোথাও আর নাই !! মৌলবীদ্বয়ও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর হইতেই পারে না, সুতরাং এখন বুঝা গেল, দুইটা নামজাদা বিদ্বান পুরুষ দুইটা থানাকে আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

ফাঁড়িদারেরা থানার দারোগার অধীন। ফাঁড়ির এলাকায় যাহা কিছু ঘটে, অথবা ঘটিবার উপক্রম হয়, দারোগার নিকটে তাহার যথারীতি রিপোর্ট পাঠাইতে হয়; সুতরাং যাদবপুর হইতে চৌকিদারেরা কেশবপুরের থানায় প্রায়ই রিপোর্ট লইয়া যাইত।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল চলিয়া গেল; প্রবল ভাবে বর্ষাঋতু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাদ্রের প্রথম ভাগে মূষলধারে দিন দিন অনবরত এবম্প্রকার বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল যে, যাদবপুর ফাঁড়ির নিকটবর্ত্তী সমুদয় গ্রাম প্রায় জলমগ্ন হইয়া গেল। নদ, নদী, ডোবা, পুকুর, দীঘী, খাল প্রভৃতি সমুদয়ই জলময় দেখা যাইতে লাগিল; যেদিকে চাও, কেবল জল আর জল! লোকের পারাপার বন্ধ হইয়া গেল; গ্রামের লোকেরা গ্রামাভ্যন্তর হইতে অন্য গ্রামে অথবা অন্য গ্রামের লোক এই গ্রামে আসিতে সাহসী হইল না। যাদবপুর গ্রামে একজন প্রাচীন জমিদার ছিল, তাহারা মুসলমান শাসনকাল হইতে "রাজা" উপাধিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক সম্বোধিত হইতেন। তাঁহাদের বাটীকে লোকে রাজবাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিত। জমিদারদিগের অবস্থা এখন ভাল নয়; জমিদারী ও তালুকদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; সামান্য আয়ে এখন

তাঁহাদের দিনপাত হয়, কিন্তু সেকালের বড় বড় পুরাতন বাটী গুলা এখনও বর্ত্তমান আছে। অর্থাভাবে বহুকাল মেরামত না হওয়ায় বাটী সমূহের অবস্থা অতীব জঘন্য এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা বাটীর নাম "চণ্ডীমণ্ডপ"—এই বাটীতে এক সময়ে দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, প্রভৃতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। এখন তাহার কিছুই হয় না। যে বাড়ী খানা খাস রাজবাটী, তাহারও অবস্থা অতি জঘন্য।

ক্রমাগতঃ বর্ষার জল পাইয়া, প্রকাশ্য রাস্তার উপরিস্থিত চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজবাটীর অবস্থা ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, সে পথ দিয়া লোকে একেবারে যাতায়াত বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ঐ দুইটা বাটীর ভূমিসাৎ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায়, প্রাণভয়ে সে পথ দিয়া আর কেহই যাইতে সাহসী হইত না, অথচ সেই পথ প্রকাশ্য পথ এবং সে পথ দিয়া না গেলে লোকের বিশেষ কষ্টও হইত, সুতরাং গ্রামের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া ফাঁড়িদার মহাশয়ের নিকটে আগমন পূর্ব্বক এজাহার দিল—"হুজুর! রাজাদের চণ্ডীমণ্ডপ ও খাসবাটীর ভয়ে ঐ পথে পথিকের গমনাগমন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, অতএব ইহার একটা সত্বর প্রতীকার করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।" বৃদ্ধ ফাঁড়িদার এই বলিয়া এজাহারকারীদিগকে অভয় দিল যে, "আচ্ছা, তোমরা যাও, থানার দারোগা সাহেবকে রিপোর্ট করিয়া যাহা হুকুম প্রাপ্ত হইব, তাহা তোমাদিগকে যথা সময়ে অবগত করা যাইবে।"

যাদবপুরের ফাঁড়িদার মৌলবী রফিক হোসেন, তাঁহার রিপোর্টে বাঙ্গালা কথা গুলা "সাধুভাষায়" অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষায় লিখিতে ভালবাসেন। রাইটার কনেষ্টবল সারদা হাজরাকে মৌলবী জিজ্ঞাসা করিল "ওহে হাজরা! বল দেখি, রাজবাটী শব্দটার খুব ভাল বাঙ্গালা কি?"

হাজরাজী কহিল "হুজুর! রাজবাটীর সাধু বাঙ্গালা শব্দ রাজ পরসাদ্।"

আফিমের নেশায় ফাঁড়িদারজী, কেশবপুরের থানায় যে রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। আমরা মৌলবী সাহেবের নিজের ভাষা কিছু কিছু রাখিয়া দিয়া রিপোর্ট খানি সংশোধন করিয়া দিলাম।

ফাঁড়িদারের রিপোর্ট।

গরিব নেওয়াজ মহামহিম কেশবপুর থানার হুজুর দারোগা সাহেব আলা-এ—হাকিম বাহাদুর বরাবরেষু—

লিখিতং গোলাম রফিক হোসেন ফাঁড়িদার, মোকাম যাদবপুর; বহুৎ

বহুৎ সেলাম বাদে নিবেদন এই যে, অত্র থানার চারিদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জলমগ্ন হওয়ায় লোকের পারাপার বন্ধ হইয়াছে এবং এখানকার লোক অন্য স্থানে এবং অন্য স্থানের লোক এখানে আসিতে অক্ষম। এরূপ অবস্থায় এক শত লোক একত্র হইয়া বিদ্রোহী হইলে তাহার দমন হওয়া অসম্ভব। আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে অন্যস্থান হইতে সেপাহী আসিয়া দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। খোদা তাল্লার কি মর্জ্জী আছে, তাহা বুঝি না।

অধিকন্তু এই গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদের ভয়ে পথিকেরা পথ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। সদর রাস্তায় অতি প্রবল ভাবে চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, লোকেরা প্রাণভয়ে সেদিক দিয়া যাইতে পারিতেছে না, দলে দলে লোক আসিয়া ফাঁড়িতে রিপোর্ট করিতেছে। এই হুলস্থূল ব্যাপারে চারিদিকেই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, এই উপদ্রব থামাইবার জন্য একটা আদমীও দেখা যাইতেছে না। অতি শীঘ্র শীঘ্র সদর জেলার বড় হুজুরদিগের নিকট রিপোর্ট পাঠান বিশেষ দরকার। ফাঁড়িতে দুই একজন মাত্র কনেষ্টবল আছে, তাহাদের দ্বারায় ইহা দমন হওয়া দুষ্কর, আর চৌকিদারেরা ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।"

বেলা চারিটার সময়ে একজন চৌকিদার যাদবপুরের ফাড়ি হইতে এই অদ্ভুত রিপোর্ট লইয়া কেশবপুর থানায় পৌছিল: থানার দারোগা (বৃদ্ধ মৌলবী) সাহেব, অপরাহ্ন অতীত হইয়াছে দেখিয়া, আফিমের কৌটা খুলিয়া মাত্রা চড়াইলেন এবং অহিফেনের নেশায় রিপোর্টের পাঠ সমাপ্ত করতঃ, চক্ষুদ্বয় অৰ্দ্ধ মুদিত করিয়া ফুর্শীতে তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন "তোবা তোবা !! দুশ্মী পাজ্ঞা ! আমি বর্ত্তমান থাকিতে, আমার এলাকায়, এরূপ রাজবিদ্রোহ !" তদন্তর আফিমের আর একটু মাত্রা চড়াইয়া দারোগা সাহেব মাধবপুর জেলার ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমীপে স্বহস্তে রিপোর্ট লিখিয়া প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। সন্ধ্যার সময় ডাক রওয়ানা হয়, সুতরাং তাড়াতাড়ি রিপোর্ট সমাপ্ত করিতে মৌলবী সাহেব বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ অদ্ভুত রিপোর্ট এই—

দারোগার রিপোর্ট।

"মেহেরবাণ কদরদ্দাণ পরবর্দ্দীগার হজুর-এ-আলা ডিস্টেরাকট্ মাজিশ্টরট্ সাহেব বাহাদুর বরাবরেষু—

লিখিতং গোলাম এনায়ৎ হোছেন দারোগা কেশবপুর থানা, সেবকের

নিবেদন এই যে, যাদবপুর ফাঁড়ির চারিদিকে বৃষ্টি ও বন্যা জন্য সর্ব্বত্র পাণি আর পাণি হইয়া গিয়াছে। লোকের পারাপার একেবারেই বন্ধ, এখানকার লোক অন্য স্থানে অথবা অন্য স্থানের লোক এখানে আসিতে একেবারেই অক্ষম। খোদা তাল্লা এমনই হাল পয়দা করিয়াছেন যে, এই দুর্দ্দিনে যদি ৫০ জন মাত্র দুষ্ট লোক আইসে, তাহা হইলে রাজ্য জয় করিয়া লইতে পারে। আমরা অতি সাবধানে রহিয়াছি, আর দিবা রাত্র হজুরকে স্মরণ করিতেছি ও খোদার নাম লইতেছি, পরন্তু খোদাতাল্লার অনুগ্রহে আর হজুরের নেক্ আশীর্ব্বাদে কিছু মাত্র ভয় নাই বরং খুব হিম্মত আছে, ইহা হজুর মালিক নিশ্চয় জানিবা। আর হজুরের নিকট ইহাও নিবেদন করিতেছি যে, যাদবপুরের ফাঁড়িদারের ১৩৭ নং রিপোর্ট এবং ১২৮৬ নং রোজনামচায় প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদ্, ইহারা উভয়ে সদর রাস্তায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর পথিকেরা প্রাণভয়ে সে দিক দিয়া গমনাগমন করিতে পারিতেছে না এবং গ্রামের লোকেরা দলে দলে ফাঁড়িতে আসিয়া এজাহার দিতেছে ও কাতরোক্তি করিতেছে। ফাঁড়ি ও থানায় কয়েকজন মাত্র কনেষ্টবল আছে, তাহাদের দ্বারায় দমন হওয়া অসম্ভব। হজুর মালিক নিবেদন ইতি।” ইত্যাদি।

দারোগার রিপোর্ট যথাসময়ে সদরে পৌঁছিল। জিলার মাজিষ্ট্রেট জন্কট্ সাহেব মফস্বলে গিয়াছিলেন, সুতরাং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীমান হেরড্ সাহেব ডিস্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। রিপোর্ট তাঁহারই হস্তগত হইল।

সিবিলসার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবক হেরড্ ভারতে পদার্পণ পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য আসিটাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন, তদন্তর সুপারিশের জোরে অতি শীঘ্র শীঘ্র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছেন। শুনা যায়, তিনি বাঙ্গালা ভাষার কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষায় একটু আধটু কথাবার্ত্তা করিতে অথবা চিঠিপত্র পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রিপোর্ট খুলিয়া তাহার এক চতুর্থাংশ পাঠ করিয়া অতি কষ্টে রিপোর্টের মর্ম্ম কোনও প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। পাঠ করিবার সময় “চণ্ডীমণ্ডপ”কে “চণ্ডীমণ্ডল” এইরূপ পাঠ করিলেন, তদন্তর নাজিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “নাজির! রাজপরসাদ্ এরূপ নাম হিন্দুস্থানীয় বলিয়া কি বোধ হয় না এবং চণ্ডীমণ্ডল বোধ হয় বাঙ্গালীর নাম।” নাজির কহিল, হজুর,

আপনি সত্য কহিয়াছেন, রাজপরসাদ্ হিন্দুস্থানীর এবং চণ্ডীমণ্ডল বাঙ্গালীর নাম, ইহা নিশ্চয়।" তাহার পর সেরেস্তাদারকে ওয়ারেণ্টের ফারম আনিতে আজ্ঞা করায় ফারম আনীত হইল, সাহেব বাহাদুর দারোগাকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন, "অবিলম্বে দুরাত্মা রাজপরসাদ্ ও চণ্ডীমণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর থানায় চালান দেও। ইহাদের পায়ে বেড়ী এবং হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া অতি সাবধানে পাঠাইবা; সঙ্গে রীতিমত চৌকীদার ও কনেষ্টবলের পাহারার যেন অনুমাত্র ত্রুটি না হয়।"

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ দারোগা ভাবিল "কি আশ্চর্য্য! চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজবাটীকে কি গ্রেপ্তার করা যায়? শত সহস্র লোক একত্র হইলেও কি ইহাদিগকে মাধবপুরে পাঠান যাইতে পারে? এমন নির্ব্বোধ ও লক্ষ্মীছাড়া হাকিমের পাল্লায় আমি এই বুড়ো বয়সে নিতান্তই হয়রাণ ও পরেশাণ হইতেছি।" যাহা হউক, সাহেব সমীপে দারোগা লিখিয়া পাঠাইল "হজুর! চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপরসাদ্ নিতান্তই প্রবল, তাহারা রাস্তাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা অথবা সদরে চালান দেওয়া অসম্ভব। দুই শত চৌকিদার এক হইলেও ইহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করা যায় না; যেন কলিকাতার গড়ের মাঠের কেল্লা (দুর্গ)!! সুতরাং গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ফিরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইলাম।" শ্রীমান হেরড্ সাহেবের নিকটে এই সমাচার উপস্থিত হইলে তিনি একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; কহিলেন "কি এতাদৃশী আস্পর্দ্ধা! এত দীর্ঘকালের সুশাসনের পরে এবং এত সেনা ও সেনাপতি থাকিতে আবার রাজবিদ্রোহ—আবার Mutiny and massacre!!"

উচ্চ হতে উচ্চতর আমরা উঠিব,
মহান গৌরব গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ দেশে।
যাহে আমাদের নাম রহিবে সজীব,
কালাবর্ত্তে স্বদেশের ইতিহাসে শেষে।

তৎক্ষণাৎ নগরের চারিদিকে এই মহা অশুভ সমাচার বনপোড়া আগুনের ন্যায় ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। পুলীসের অনেক লোকের অনেক দিন হইতে পদোন্নতি বা পুরস্কার হয় নাই, তাহারা এই সমাচার শ্রবণ করিয়া লম্ফ দিয়া গাহিল—

সাজরে সাজ সাজ সৈন্যগণ।
ভণ্ডবীরের দণ্ড দিতে বাধিবেক রণ॥

হেরড্ সাহেবের নিম্নবর্ত্তী আসিস্‌টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট অজাতশ্মশ্রু শ্রীমান জেম্‌স্ সাহেব ইংরাজ মেম্‌দিগকে অভয় ও উৎসাহ দিতে আসিয়া কহিল—

মোরা রাজা সবাকার হেরি যা এখানে,
মোদের স্বত্ব বিরোধিতে নাহি কেহ আর।
আসমুদ্র ধরা কেন্দ্র করি মধ্য স্থানে,
মোরা রাজা জীবজন্তু বিহঙ্গ সবার॥

জেলার হুজুর মাজিষ্ট্রেট ও পুলীশ সাহেব মফস্বলে ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে রাজবিদ্রোহের সমাচার সেই দিনেই তারযোগে যথারীতি প্রেরিত হইল; আর শ্রীমান হেরড্ সাহেব স্বয়ং রাত্রিতে নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তাঁহারই বীরত্বে সেনাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আনন্দে গাহিতেছে—

Rule Brittania rule the waves,
Britons shall never be slaves.

এদিকে মফস্বলে বসিয়া ডিস্‌ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট জন্‌কট্ সাহেব ও পুলীশ সাহেব, জমিদার প্রদত্ত ছাগ, পারাবত, কুক্কুট এবং হংস মাংস অংশ করিয়া ধ্বংস করিতেছিলেন, এমন সুখের সময়ে তারের খবর পৌঁছিয়া হরিষে বিষাদ উৎপন্ন করিল। টেলিগ্রাম পড়িয়াই বড় সাহেবের চক্ষু স্থির! বড় সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন—

I am the monarch of all I survey
My right there is none to dispute.
From one end of the district to the other,
I am the Lord of the man and the brute.

যাহা হউক, জনকট্ সাহেব তাড়াতাড়ি পুলিশ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, সদরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আড়তদারেরা তাহাদের শস্যরাশি, মহাজনেরা তাহাদের টাকাকড়ি, জহুরীগণ তাহাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, রত্ন এবং মাড়োয়াড়িরা তাহাদের দোকানের শাল, জামিয়ার ইত্যাদি লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কি জানি, কোন্ সময়ে, সহরটা বা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়!!

নগরে উপনীত হইয়াই, জনকট্ সাহেব (হেরড্ সাহেবের পরামর্শানুসারে এবং রাজবিধি মতে) পুলিসের ইনেস্‌পেক্টর জেনেরল সাহেব বাহাদুরের নিকটে ও ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের দপ্তরে রাজবিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ সহ তার

পাঠাইলেন। পরদিবস ইংলিশম্যান, ডেলিনিউশ, ষ্টেট্‌শম্যান, পাইওনিয়র প্রভৃতি ইংরাজী সমাচার পত্রে সুদীর্ঘ তাড়িত বার্ত্তা প্রেরিত হইল। ছোটলাট সাহেব তাঁহার মিলিটরী সেক্রেটরির সহিত পরামর্শ করিয়া, বারাকপুর, দমদমা এবং কলিকাতার কেল্লায় লিখিয়া প্যঠাইলেন "ফৌজ যেন রীতিমত প্রস্তুত থাকে, আবশ্যক হইলে যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে গতিশীল হইতে পারে।" সেনামহলে এই সমাচার প্রেরিত হইলে, সেনারা লম্ফ দিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল "যুদ্ধ জয় হইলেই আমি খুব লুঠিয়া লইব", কেহ বলিল "Well, there are fair lots of women there—not like the Chanak old hags. I thank my stars, I shall pick up some of our queenslaves" শ্রীমান বাউর্চ্চি ও ভিস্তি মিঞা মধুর হাস্য হাসিয়া কহিলেন "আল্‌হাম্‌-দোলিল্লা! আল্লা চাহেতো এবারে মুই থোড়া বহুৎ দৌলৎ কামায়ে লবো, আর কর্জ্জার দায়ে হয়রাণ পরিশাণ হোতে হবে না।" এদিকে নারিকেল তৈল ও সুর্কি সহযোগে তৈলঙ্গ সিপাহীরা তরবারী পরিষ্কার করিতে লাগিল; গোরাগণ বন্দুক লইয়া চাঁদমারির দিকে লক্ষ্য ঠিক করিতে গেল; পুলীশ সাহেব বাশ কাটিতে হুকুম দিলেন। রাশি রাশি বাঁশের লাঠির দরকার! যাহাদের পুকুরের ধারে বাঁশ ছিল, তাহারা এবারে বেশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের ভারতোদ্ধারী ছেলেরা এই সকল কথা লোকমুখে শ্রবণ এবং সম্বাদ পত্রে পাঠ করিয়া বুঝিল, এবারে নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর উদ্ধার! এবারে নিশ্চয়ই বাঙ্গালায় আবার বাঙ্গালী রাজত্ব; তাহারা যথা তথা গাহিতে লাগিল—

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মোল্লা, পথে চলিতে চলিতে "যুদ্ধে ইংরাজ হারিয়া গেলে, হিন্দু কিম্বা মুসলমান ইহাদের মধ্যে কে রাজা হইবে"—এই চিন্তায় এমন আত্মবিস্মৃত ছিল যে, হঠাৎ একটা বৃহদাকার পাথরের আঘাত লাগিয়া রাস্তার ধারে একটা গভীর পুকুরের জলে পড়িয়া গেল। অদ্য পর্য্যন্ত তাহার মৃত-দেহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এদিকে হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী ও সঞ্জীবনী সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের কার্য্যালয়ের নিকট দিয়া গুপ্তভাবে পুলিশের লোক দিবা রাত্রি বিচরণ করিতে লাগিল। "বেঙ্গলী" ও "অমৃত বাজার পত্রিকা"র আফিস প্রায় খানাতলাশী হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মাধবপুর নগরে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইত, তাহার সম্পাদকের পর্ণকুটীরে দিনে ৩বার আর রাত্রে ৬বার পুলীশের লোক ঘুরাঘুরি করিত। শ্রীমান সম্পাদক বাবাজী কয়টা ব্যঞ্জন সহযোগে ভাত খায়, তাহার নাম পর্য্যন্ত লিখিয়া রিপোর্ট হইতে লাগিল। এদিকে দুইশত চৌকিদার, একশত পুলিশ কনেষ্টবল, কয়েক জন হাওয়ালদার, জমাদার, দারোগা, ইনেস্‌পেক্টর এবং জিলার বড় হুজুর (অর্থাৎ ডিঃ মাজিষ্ট্রেট জন্‌কট্‌ সাহেব) জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট হেরড্‌ সাহেব এবং পুলীশ সাহেব, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য, ঔষধাবলী, তাম্বু, পরিচ্ছদাদি সহ, যাদবপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুসলমান কনেষ্টবলগণ "আল্লা হো আকবর" এবং হিন্দু সিপাহীগণ "হর বম্‌ বম্‌" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সেই গর্ভিনী-গর্ভ-বিদারণকারী শব্দরাশি মধ্যে প্রধান পুলীশ ইনেস্‌পেক্‌টর মহাশয় গম্ভীর স্বরে উৎসাহ দিতে দিতে গাহিতে লাগিলেন—

সাহসে চল, চল সৈন্যগণ।
ভণ্ড বীরের দণ্ড দিতে বাধিবেক রণ॥

যাহা হউক, অতি কষ্টে খাল, ডোবা, পুকুর, দিঘী, নদ, নদী, জলাশয় ইত্যাদি পার হইয়া বিক্রমী বীরগণ যাদবপুরে উপনীত হইলেন। জল পার হইতে জলের ন্যায় টাকা ব্যয় হইয়া গেল। ইতি পূর্ব্বেই কেশবপুরের দারোগা আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সেনারা পৌছিলে, খট্‌ খট্‌ রবে তাম্বু খাটান হইল এবং হেরড্‌ সাহেব একখানা বাঙ্গালা বই খুলিয়া চুরট্‌ টানিতে টানিতে বঙ্গীয় বীর সেনাদিগের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় রে॥

বাউর্চ্চী, ভিস্তি, বেহারা এবং কুলীগণ অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল, অবশেষে নাপিত ও ধোপা আসিয়া কহিয়া গেল "হেরড্‌ সাহেব যেন মা সরস্বতী! ধন্য! ধন্য! এমন পণ্ডিত ত আর দেখি না; সাহেবের মুখে যেন খৈ ফুটে!"

গ্রামে মহা ভীষণ গোলযোগ শ্রবণ করিয়া এবং বহুসংখ্যক বলবান দণ্ডধারী

কনেষ্টবলের আগমন দেখিয়া, গ্রামের লোকেরা গ্রামে বাঘ আসিয়াছে অথবা বন্য শুকরের উপদ্রব হইয়াছে ভাবিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি ও তীর ধনু লইয়া তাম্বুর দিকে হৈ হৈ রবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাহেবেরা তাহা দেখিয়া স্থির করিল "ইহা নিশ্চয়ই রাজবিদ্রোহ।" হেরড্ সাহেব কহিলেন "অত্র বিষয়ে সন্দেহ নাস্তিঃ।" কিন্তু বন্দুকের ভীষণ শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; ইংরেজেরা ভাবিল "প্রথম উদ্যম শুভ ফলপ্রদ।"

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। রাত্রিতে চব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহারান্তে তাম্বুর ভিতরে সাহেবদিগের গোপনীয় সমর মন্ত্রণার কৌন্সীল বসিয়াছিল। আমরা সে সকল গোপন কথার কিছুই জানি না, তবে একথা শুনিয়াছি যে, সাহেবেরা নাকি বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে দুই একজন জমিদারকে খেতাব (উপাধি) দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে, কারণ একজন জমিদার নাকি এমনই রাজভক্তি দেখাইতেছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "যত দিন পর্য্যন্ত আমি জয়লাভের সমাচার না পাইব, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে চা মধ্যে চিনি, মধ্যাহ্নে স্নানের সময় গাত্রে তৈল এবং রাত্রে পোলাও মধ্যে গরম মশলা ব্যবহার করিব না।" আর একজন মুসলমান তালুকদার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "যুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মোর্গা বা মুর্গি ভিন্ন অন্য মাংস আদৌ ব্যবহার করিবই না।"

রজনী প্রভাত হইলে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পুলীস সাহেব চীৎকার করিয়া কহিলেন—

সাজরে সাজ সাজ সৈন্যগণ।
ভণ্ডবীরের দণ্ড দিয়া করিব নিধন॥

ক্রমে মহাবীর জনকট্ সাহেব, ডিঃ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ সাহেব এবং হাকিম-প্রবর হেরড্ সাহেব দল বল লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপ্রসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দারোগা ও ফাড়িদার, আফিমের মাত্রা চড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া মাজিষ্ট্রেট কহিলেন "দারোগা!" দারোগা কহিল "হুজুর"। সাহেব বলিলেন, "তুমি রাজ-পরসাদ ও চণ্ডীমণ্ডলের দুর্গ দেখাইয়া দাও।" অঙ্গুলী নিক্ষেপ করিয়া দারোগা কহিল "হুজুর! ঐ দেখুন চণ্ডীমণ্ডপ, আর ঐ দেখুন রাজপ্রাসাদ।" সাহেব কহিল "দুর্গ (কেল্লা) কোথায়?" দারোগা কহিল "হুজুর! আপনি দুর্গা দুর্গা কহিতেছেন, হাঁ এক সময়ে দুর্গা পূজা হইত বটে, কিন্তু এখন কেবল

ভিতরে লোক থাকে, পূজা হয় না।" সাহেব কহিলেন "লোককে ডাক" তখন মৌলবী দারোগা এনায়ৎ আলি সেই বাটীর বৃদ্ধ জমিদারকে ডাকিতে গেল। বুড়ো জমিদার হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছিল, সাহেবেরা ডাকিতেছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দারোগার সঙ্গে আসিতে লাগিল। তাহার পায়ে চটিজুতা, গায়ে নামাবলী, মাথায় টিকি এবং গলায় হরিনামের মালা। সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জমিদার সেলাম করিলেন। সাহেব কহিলেন "Is this old hag the ringleader of the gang ?" (এই বুড়া বদ্‌জাৎটা কি রাজ-বিদ্রোহীগণের সর্দ্দার ?) বুড়ো কহিল "হুজুর! গ্রামে কেহ রাজবিদ্রোহ হয় নাই, এখানে কোনও বদ্‌মায়েস বাস করে না, সকলেই গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের রাজভক্ত প্রজা। সরকার বাহাদুরের রাজ্য অক্ষয় হউক, আমাদের এই প্রার্থনা।" মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া দারোগা কহিল "হুজুর! ইনি খুব ভাল মানুষ, ইনি দস্যু বা বদ্‌মায়েস্ নহেন, ইনি সরকারের বন্ধু এবং অতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক।" তখন সাহেবেরা দারোগাকে বলিল "তবে দস্যুবর কোথায়, আর তাহাদের দুর্গ কোন্ স্থানে অবস্থিত ?" দারোগা কহিল "হুজুর! এই বাটীরই নাম চণ্ডীমণ্ডপ, আর ঐ বাটীর নাম রাজবাটী ওরফে রাজপরসাদ। বর্ষার জলে, রাস্তার উপরে এই পুরাতন বাটীদ্বয় প্রায় পতিতাবস্থায় আছে, এইজন্য প্রাণভয়ে পথিকেরা পথ দিয়া যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে।" হেরড্ সাহেব তখন বুঝিলেন প স্থানে ল পড়ায় এবং বাঙ্গালা রিপোর্টের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় এই বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব "It is a grand fun I see" কহিয়া হেরড্ সাহেবের দিকে তাকাইলেন, হেরড্ সাহেব লজ্জায় মুখ ফিরিয়াই "It is a regular tempest in a teapot" কহিয়া পুলিশ সাহেবের দিকে তাকাইল। পুলিশ সাহেব "It is all the moonshine" বলিয়া ইনেস্পেক্টরের দিকে চাহিল, ইনেস্পেক্টর "A mountain of a molehill" বলিয়া দারোগার দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিল; দারোগা সাহেব আফিমের আবার মাত্রা চড়াইয়া "শোভান্ আল্লা" কহিয়া ফাঁড়িদারের দিকে কটাক্ষ করিল, বৃদ্ধ ফাঁড়িদার আকাশের দিকে তাকাইয়া "তোবা" "তোবা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইংরাজী-নবিশ নেটিব ডাক্তার চুপি চুপি কহিতে লাগিলেন "ভারতের টাকা যেন বে-ওয়ারীশ মাল। "Indian taxpayers' money goes to the dogs."

মাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দারোগা! তোমার এমন নির্ব্বুদ্ধিতা কেন?" কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়ো দারোগা বলিল, "হুজুর! আমি জানিতাম, আমি এবং আমার ফাঁড়িদার ও আমাদের পুলিশ সাহেব, এই তিন পণ্ডিতের মত বুঝি আর পণ্ডিত তুনিয়ায় নাই; কিন্তু হুজুর স্বয়ং এবং আপনার সহযোগী হেরড্ সাহেব যে আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিত, তাহা জানিতাম না, এই টুকু অবশ্য আমার ভুল এবং নির্ব্বুদ্ধিতা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমাকেই ক্ষমা করুন; জেলের (ধীবরের) জালে ছোট ছোট মাছগুলা প্রায়ই ধরা পড়ে, বড় বড় মাছগুলা প্রায়ই ধরা দেয় না।" তখন আবার আকাশের দিকে তাকাইয়া অশ্রুপাতন করিতে করিতে দারোগা কহিল—

তিন পণ্ডিতে রক্ষা নাই, পাঁচ পণ্ডিতে গাধা।
রামা শ্যামা পলায়ে গেল, ধরা পড়লো মাধা॥

মঙ্গলা মাতা।

নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যে ক্ষুদ্র রেলওয়ে শাখা লাইন বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে লোহাপুর ষ্টেশন নানা কারণে প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, এক সময়ে ইহার চারিদিকে নিবিড় অরণ্য ছিল এবং তান্ত্রিক সাধক ও সন্ন্যাসীগণ গহন কাননাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া দেব দেবীর পূজা করিতেন। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে নরবলি হইত, ইহাও শুনা গিয়াছে। অদূরে "বাড়াই" নামক সুবৃহৎ গ্রামে এক সময়ে একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক বহুল কীর্ত্তিমালার সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও অনেকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। লোহাপুর হইতে আর এক দিকে আনুমানিক সার্দ্ধেক ক্রোশ অগ্রসর হইলে ভদ্রপুর নামক আর একটি বিখ্যাত গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রামে ইতিহাস-প্রখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের জন্ম হইয়াছিল। ভদ্রপুর এক্ষণে "ভাদুই" নামে পরিচিত। ইহা বীরভূম জেলার এবং রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত।

মহারাজা নন্দকুমার রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশগত যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক পুরাকাল হইতে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত

হইতেন। নন্দকুমার ঘোরতর তান্ত্রিক ছিলেন এবং একজন অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ জমিদার ও তান্ত্রিক সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমার অতীব শুদ্ধাচারী, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, পরোপকারী, ভক্তাধিক ভক্ত, দীন দুঃখীর প্রতিপালক এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষক বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও সাধকবর্গকে একত্র করিয়া একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ দেশের অনেকে মহারাজা নন্দকুমারের দেবোপম চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। ইউরোপীয় পুরুষপুঙ্গ কর্ত্তৃক প্রণীত ভারতের ইতিহাসে বিশ্ববিক্রমী বৃটিশবীর কর্ত্তৃক নন্দকুমারের ফাঁসির কথা পাঠ করিয়া, তাঁহার নামে অলীক "কৃত্রিমতা" (জাল-Forgery) অপরাধের অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া, অনেক দূরদর্শী যুবক, মহামতি মহারাজা নন্দকুমারকে "কুলাঙ্গার" চরিত্রের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, সম্প্রতি একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পুরুষ তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ বিশেষে নন্দকুমারের কথা উল্লেখ করিয়া অতি উদ্ধত ভাবে লিখিয়াছেন, Nund Coomar was a disgrace to Bengal and a monumental villain, compared with whom Cethegus was a simple citizen and Titus Oates a man of honor. এই অদ্ভুত ইংরাজিটুকুর অনুবাদ করিবার ইচ্ছা নাই; মোটের উপর কথা এই, যে গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাশয় এইরূপ অসাধু ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি, কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ কলিকাতার কোনও ব্যক্তি বিশেষের অনুনয় ও অনুরোধে এবং বিশেষতঃ তাঁহার ইচ্ছা পুরণোদ্দেশে বিরচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভদ্রপুরে অবস্থান কালে মহারাজা নন্দকুমার একটি মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করেন, এই কীর্ত্তি অদ্যাপিও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি ভদ্রপুরের পার্শ্বে আখানীপুর নামক মহাপ্রাচীন, মহাপ্রসিদ্ধ এবং মহাবিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্রে এক সুন্দর ও সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে জগন্মাতা জগদম্বা কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডের উপরে সর্পাসনে ঐ কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, ইহা সূর্য্যকালী নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দির, এই মূর্ত্তি এবং এই প্রাচীন তপস্যার স্থান, দেখিবার উপযুক্ত। প্রায় একশতত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে এক বঙ্গদেশীয়া ব্রহ্মচারিণী এখানে আগমন করিয়া এই মন্দিরে কিছুকালের জন্য অবস্থান

করিয়াছিলেন। মন্দিরস্থিতা কালীমাতার নিত্য পূজা ও "সেবা" হইত, মন্দিরের অন্নে ব্রহ্মচারিণী উদর পরিপূরণ করিয়া সন্তুষ্টা থাকিতেন। এক সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতটে ব্রহ্মচারিণী মহোদয়া প্রতিজ্ঞা করেন, "আমি নিত্যই নিজের হাতে অন্ন তুলিয়া মুখে দিই এবং তাহা ভক্ষণ করি। এবারে একদিন আমার মাতা [কালী] আমাকে খাওয়াইয়া না দিলে আমি অন্ন কিম্বা কোনও প্রকারের ভোজ্য দ্রব্য আদৌ স্পর্শ করিব না। উপবাসিনী থাকিয়া মরিয়া যাইতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না।" প্রথিত আছে, ছয় দিবস ক্রমাগত নিরম্বু উপবাসের পরে, তিনি দেখিলেন, গঙ্গার তরঙ্গে একখানি পাত্র ভাসিয়া যাই-তেছে, ঐ পাত্রে বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য সুসজ্জিত ছিল। আর একদিন ঐরূপ দেখিলেন ; নবম দিবসে ঐরূপে পাত্র ভাসিয়া যাইবার সময়ে, জনৈক ব্রাহ্মণ কহিল "মাতঃ! তুমি নয় দিন উপবাসিনী রহিয়াছ, তোমার কণ্ঠে প্রাণবায়ু প্রায় সমাগত হইয়াছে, অতএব এই পাত্রস্থিত সুভোজ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া মুখে দাও।" ব্রহ্মচারিণী তাহা শুনেন নাই ; প্রবাদে শুনা যায়, সায়াহ্নে ভদ্র-পুরের জগদম্বা স্বয়ং আগমন করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতটে দর্শন দেন এবং চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্যাদি খাওয়াইয়া অদৃশ্যা হয়েন ; এখনও অনেক স্থানে এই প্রাচীন প্রবাদ অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা মঙ্গলা ব্রহ্মচারিণীর জাতিভেদ প্রথায় আস্থা ছিল এবং তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও বিবা-হিতা হয়েন নাই ; ভদ্রপুরে যে সময় তিনি আগমন করেন, তখন তিনি যুবতী এবং অসামান্যা রূপবতী। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল এবং ব্যবহার নির্দ্দোষ ছিল। সংগীত, চিত্র, শিল্প এই তিন বিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী ছিলেন ; তিনি কাশীধাম হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, বোধ হয়। প্রকাণ্ড অজাগর সর্পের চর্ম্ম তাঁহার সঙ্গে থাকিত, ঐ চর্ম্মাসনে তিনি উপবেশন, শয়ন এবং ধ্যান ধারণাদি করিতেন। এতদঞ্চলে বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, ঐ শিষ্যদিগের বংশধরগণ এখনও জীবিত রহিয়াছে। মাতা মঙ্গলা ব্রহ্মচারিণী তান্ত্রিকা ছিলেন, কিন্তু তিনি সকল শ্রেণীর লোককে শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। যাহারা পুরুষ পরম্পরায় বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া আসিতেছিল এবং বৈষ্ণব মতেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়া-ছিল, তাহাদিগকে মাতাজী বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে শাক্ত-

দিগকে শক্তিমন্ত্রে এবং বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে শিষ্যত্ব সোপানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কোনও সম্প্রদায়কে তিনি তুচ্ছ করিতেন না, সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে দর্শন করিতেন। সকল প্রকার শাস্ত্রেই তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল, সকলকেই তিনি এক ও অভিন্ন দেখিতেন। বৈষ্ণব ও শাক্তকে তিনি এক প্রকার চক্ষে ও একই প্রকার স্নেহে দর্শন করিতেন। লোকে এখনও বলিয়া থাকে, তিনি এখনকার অনেক "সাধু" "সন্ন্যাসী"র ন্যায় গৃহস্থকে ঠকাইয়া, ভয় দেখাইয়া, বিরক্ত করিয়া অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া কখনও একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই; অযাচিত ভাবে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত, গৃহস্থ কিছু দান করিলে তিনি সন্তোষ সহকারে তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইহাও শুনা যায় যে, তিনি টাকা, রৌপ্য বা স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা কখন জমা করিয়া রাখিতেন না, যাহা কিছু পাইতেন, তদ্দ্বারা দীন দুঃখীর অভাব ও কষ্ট মোচন করা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। মহিয়সী মঙ্গলামাতা ব্রহ্মচারিণী হইলেও ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকের স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ অতীব পরিষ্কার ও ভদ্রাজনোচিত ছিল; পুরুষের সঙ্গে কথোপকথন করিলেও তিনি পুরুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না। তাঁহার অতি নিকটে বসিয়া কথোপকথন করা অথবা তাঁহার বস্ত্র, কেশ কিম্বা দেহের কোনও অংশ স্পর্শ করা পুরুষের সাধ্য ছিল না। ভদ্রপুরে মহারাজা নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি দ্বিভূজা ছিল, এই কালীকে লোকে যেমন ভয় ও ভক্তি করিত, মাতা মঙ্গলাকে সকল লোকে তদ্রূপ "দ্বিভূজা মঙ্গলা" বোধে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিত। ব্রহ্মচারিণী কোনও প্রকার নেশার প্রশ্রয় দিতেন না, তিনি যেমন জিতেন্দ্রিয়া তেমনি সুপণ্ডিতা ছিলেন। বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; গৃহিণীদিগকে নানাপ্রকার হিতকর বিষয়ের উপদেশ দিতেন। তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম তত্ত্বদর্শিনী এবং তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা ছিলেন, তাঁহার হৃদয় উদার ছিল, তিনি যেমন আধ্যাত্মিক সাধিকা তেমনি দীন দুঃখীর প্রতিপালিকা ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, তিনি সমস্ত জীবন সাধ্বীভাবে যাপন করিয়া গিয়াছেন। অতীব সম্মানিতা, তপস্বিনী, পণ্ডিতা এবং প্রধানা হইয়াও তিনি সামান্য বেশভূষায় এবং সামান্য আহারে দিনযাপন করিতেন। সকল বিষয়েই তিনি বাঙ্গালীকুলে আদর্শ রমণী ছিলেন। তিনি বলিতেন "নাস্তিক, অবিশ্বাসী, সংশয়চিত্ত অথবা অব্যবস্থিত চিত্ত থাকা অপেক্ষা একটা ধর্ম্ম বিশেষে আস্থাবান থাকা মানবের নিতান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তির

কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, যাহার "ধর্ম্ম" বলিয়া কোন অভিমত নাই, সে ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসের অযোগ্য।" তিনি এ কথাও বলিতেন "একটা কোনও ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকিলে এবং তৎসঙ্গে একটা ক্রিয়া না থাকিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না। অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের ধর্ম্ম সাধন অসম্ভব। কেবল মুখের কথায় বা পুস্তকের জ্ঞানে ধর্ম্ম সাধন হয় না; সাধনা করিতে হইলে ক্রিয়ার আবশ্যক।" তাঁহার একদিনের উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"আমি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি এবং অনেক সম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। যেখানে ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাব অথবা ধর্ম্ম বিশেষে অনাস্থা দেখা গিয়াছে, সেই থানেই পাশব পাষণ্ডতার জীবিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। চরিত্র ও সৌজন্যতাদি লেখাপড়ার উপর নির্ভর করে না। ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।" তাঁহার অনেক উপদেশ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা বেদ মানে না, কোরাণ মনে না, অর্থাৎ কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম অবতারকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, কিম্বা ধর্ম্মগত সামাজিক নিয়মাদির ও যাহারা অনুবর্ত্তী নহে, তাহাদের ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই নষ্ট হইয়া যায়।"

উপরি উক্ত উপদেশ পাঠে অনেক "স্বাধীন চিন্তাশীল" (Free-thinking) বাবু বলিতে পারেন—A national religion is good, but is not a rational religion grander? ইহার উত্তরে আমি বলি, বাবুদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। Religion প্রথমে national না হইলে rational হয় না, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম rational নহে, জাতিগত ধর্ম্মই rational, যাহাকে রাশনাল বলিতেছ, তাহার "ন্যাশনালই" মূল কারণ। Religionটা national হইয়াছে বলিয়াই grander, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম কবে rational বলিয়া গৃহীত হইয়াছে? Nation যাহাকে Rational করিয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণীয়। সুতরাং National Religionই ধর্ম্ম; Rational Religion শব্দের কোন অর্থ নাই।

মহিম্নী মাতা মঙ্গলা কখনও কাহাকে "তাবীজ" বা "মাদুলী" দিতেন না। তিনি অলৌকিক ক্রিয়ায় প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু কখনও ছলনা দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ভান করিতেন না। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল, শিষ্যদিগেরও অনেক শিষ্য প্রশিষ্য আছে। তাঁহার এক জন শিষ্যের শিষ্য কর্ত্তৃক একজন হিন্দুস্থানী পুরুষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই হিন্দুস্থানী সংসার ত্যাগী

উদাসী ছিলেন এবং মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি,তিনি প্রায় সপ্তদশ বর্ষ হইল, মুর্শিদাবাদের নিকট বালুচরে গঙ্গাতটে পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া মহাসমাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। এই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলায় "জলেশ্বর-বাবা" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বালুচরে গঙ্গাতরঙ্গবক্ষে তিনি বংশনির্ম্মিত এক অত্যুচ্চ আসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা জলের উপর ভাসিত এবং তাহাতে তিনি উপবেশন করিয়া থাকিতেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে জলেশ্বর বাবা বলিয়া ডাকিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাদ্রের প্রবল বর্ষা ও প্রবল বন্যার সময়ও এই আসন স্থানান্তরিত হইত না এবং উপরে আচ্ছাদন না থাকা সত্ত্বেও এই মহাপুরুষ শীতে, রৌদ্রে, শিশিরে বা বর্ষার প্রবল জলে আসন পরিত্যাগ করেন নাই। এই মহাপুরুষ, মঙ্গলা মাতার শিষ্যের শিষ্য ছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মঙ্গলা মাতা "তান্ত্রিকা" এবং কালীর উপাসিকা ছিলেন। তান্ত্রিকদিগের যে সকল অনাচার বা অযথা আচার আছে, তাহা তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল না। কালী মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। শুনা গিয়াছে, ব্রহ্মচারিণী অবস্থায় অবস্থান করিবার সময়ে, তাঁহার একজন সহোদর ভদ্রপুরে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তিন দিবস অতীত হইল আমাদের গর্ভধারিণী জননীর মৃত্যু হইয়াছে। মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তোমাকে এই সম্বাদ জানাইবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারিণী অতি শীঘ্র দৌড়িয়া গিয়া দ্বিভুজা কালীমাতার মন্দিরের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক মহামাতাকে দর্শন করিয়া হাসিতে হসিতে বলিলেন "কৈ! আমার মা ত মরেন নাই, আমার মা মন্দিরের মধ্যে জীবিতা রহিয়াছেন।" প্রকৃত সাধক ও সাধিকাদিগের বিশ্বাস, প্রকৃত ভগবৎভক্তি এবং প্রেমানন্দ বাস্তবিকই এইরূপ। তাঁহাদের ভগবানে তন্ময়তা এবং আধ্যাত্মিক মহাভাব, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবের মহাশিক্ষার উপাদান। তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্র এবং পবিত্র জীবন, এই পাপময় সংসারে মহা আলোক ও আশা স্বরূপ।

পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ

পরাক্রমী পাঠানপুঞ্জের প্রখ্যাতি, প্রচীনত্ব, বিভব, বীরত্ব, বিক্রম, শৌর্য্য বীর্য্য, স্বজাতি-প্রেম এবং স্বদেশবৎসলতা---বিশেষতঃ তাহাদের সমগ্রজাতির স্বভাব ও চরিত্র এবং তাহাদের বিরাট প্রদেশের প্রকৃতি ও ইতিবৃত্ত—প্রকৃষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের পস্তভাষা-ভাষী পাঠান জাতির সহিত সর্ব্ব প্রথমে সহবাস করা নিতান্ত আবশ্যক। বঙ্গবাসী পাঠানদিগের সংখ্যা অতি অল্প, বিশেষতঃ ইহারা কাল প্রভাবে এরূপ অনুন্নত অবস্থায় পতিত হইয়াছে এবং ইহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব, সভ্যতা, চরিত্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি এরূপ হীন হইতে হীনতর হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাদিগের দেহস্থ ধমনীতে বিশুদ্ধ পাঠান-রুধিরের অনুমাত্রও আছে কিনা সন্দেহ। ভারতের অন্যান্য অংশেও পাঠানের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যায়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মালাবার উপকূলস্থিত কালিকট প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাঠান সম্প্রদায় বাস করে, তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও স্বধর্ম্মাচারী মুসলমান গুরুর সহবাসে বঞ্চিত থাকায়, বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, "পাঠান" বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার তাহাদের আছে কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া পাঠান চরিত্র বুঝিতে হইলে, পঞ্চনদবিধৌত পঞ্জাব প্রদেশে পরিব্রজন করা নিতান্ত আবশ্যক ; পঞ্জাব হইতে পথিকেরা আফগানিস্থানে আগমন করিলে পাঠান চরিত্রের সম্পূর্ণতা সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। আমরা সুদূরবর্ত্তী আফগানিস্থানের কথা প্রবন্ধান্তরে বর্ণনা করিয়া পাঠকের কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ; বর্ত্তমান প্রস্তাবে পঞ্জাবীয় পাঠান প্রদেশের বিবরণে হস্তক্ষেপ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রখ্যাত জিলার বর্ত্তমান নাম রাওলপিণ্ডি। রাওল অথবা রাওয়াল্ সিংহ নামক পৌণ্ড্র জাতীয় জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুবীরকুলাগ্রগণ্য ব্যক্তির নামে রাওয়ালপিণ্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। * প্রকৃত প্রস্তাবে, এই জেলা হইতেই পাঠান প্রদেশের সূত্রপাত।

---

* রাওলপিণ্ডি নগরে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের একটী সুন্দর কালী মন্দির, পাঠাগার (লাইব্রেরী) বালক বিদ্যালয় এবং (থিয়েটার) আছে। লেখক।

রাওলপিণ্ডির অন্তর্গত হোসেন-আবদাল ষ্টেশন হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত পদব্রজে অথবা বাষ্পীয় শকট যোগে গমন করিলে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই নিরবচ্ছিন্ন পাঠানপুঞ্জে পরিবৃত এবং সম্যকরূপে সমাচ্ছন্ন। এই সকল পাঠানেরা হিন্দি,গুরুমুখী বা উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন করেনা, ইহাদের মাতৃভাষার নাম পস্তু, ইহাই আফগানিস্থানের পাঠানের একমাত্র ভাষা। হোসেন-আবদাল ষ্টেসনের নিকটে "পন্‌জা সাহেব" নামক শিখদিগের অতীব প্রাচীন এবং পবিত্র তীর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে শিখ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ভুবনবিখ্যাত শ্রীমৎ বাবা নানক, তপস্যা দ্বারা "সিদ্ধি" লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বাবা নানক যে পূত-কলেবর ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পরব্রহ্মের পরমারাধনায় প্রকৃষ্ট রূপে প্রশান্তমনা থাকিতেন, তাহা আজিও ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অনন্ত আকাশের ক্রোড়ে উর্দ্ধমস্তক হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; পথিকেরা রেলওয়ে শকট হইতে শৈলশিখা দর্শন করিবা মাত্র উন্নত মস্তকের উষ্ণীষ ও টুপি খুলিয়া আজিও সভক্তি প্রণাম করিয়া থাকে। শুনা যায়,ভক্তাধিক ভক্ত বাবা নানকের পরীক্ষার জন্য, দেবতারা "যুবতী রমণী" রূপে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; নানা প্রকার প্রলোভনেও যখন তিনি কুকর্ম্মের প্রশ্রয় দেন নাই, তখন দেবতারা তাঁহার গাত্রে ঐ পর্ব্বতটীকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করেন। পর্ব্বতটী বক্রভাবে নানকের মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে যোগীবর নানক তাহা জানিতে পারিয়া, আপনার দক্ষিণ হস্তস্থিত পাঁচটা অঙ্গুলী দ্বারা পর্ব্বতের গতিরোধ করেন; মহাযোগীর আধ্যাত্মিক তেজে হোসেন আবদালের পর্ব্বত আজিও বক্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং বাবা নানকের পবিত্র করকমলের চিহ্ন তথায় এখনও সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। "পঞ্জা" শব্দের অর্থ হস্তের শেষ ভাগ (অঙ্গুলী); "সাহেব" শব্দের অর্থ শ্রীমৎ, পবিত্র, ইত্যাদি। আমরা যেমন কেবল গীতা বা কেবল ভাগবত না বলিয়া শ্রীমৎভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমৎভাগবত বলিয়া থাকি, কেবল পিটার না বলিয়া যেমন পিটর্ দি গ্রেট্ বলিয়া থাকি, অথবা কেবল খড়দহ না বলিয়া যেমন শ্রীপাঠ খড়দহ বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শিখেরা পন্‌জা শব্দের সঙ্গে সাহেব শব্দ যোজনা করিয়া মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। হোসেন-আবদালের জলবায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ, পর্ব্বতের ঝরণায় বারমাস এরূপ সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর ও নির্ম্মল নীর পাওয়া যায় যে, পান বা স্নানের জন্য অন্য জলের আদৌ প্রয়োজন হয় না।

হাজারা, কোহাট, কৃষ্ণ পর্ব্বত (Black Mountain), কাশ্মীর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে হোসেন-আবদাল হইতে সহজে গমন করা যাইতে পারে। প্রায় সার্দ্ধেক ক্রোশ অন্তরে "বাঃ" নামে অতীব মনোহর গ্রাম আছে, তাহার জলবায়ুর স্বাস্থ্য-কর গুণের কথা, বিশেষতঃ তথাকার প্রকৃতির শোভা এবং অধিবাসীদিগের সৌন্দর্য্য এতাদৃশ চমৎকার যে, তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। এখানকার সমীরণ কিছু দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে, মানুষের "চেহারা"র পরিবর্ত্তন হয়, এবং জল এতই স্বাস্থ্যকর যে, তাহা পাথরকেও হজম করিয়া দেয়। এইগ্রামে একটীও হিন্দু নাই, গ্রামের প্রান্তে এক ঘর শিখ আছে, সে ব্যক্তি একটা স্বর্ণ-কারের দোকানের সত্ত্বাধিকারী। সম্রাট-শেখর আওরংজেব এখানে আগমন করিয়া এস্থানের জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা, প্রাকৃতিক শোভার মহোৎকর্ষতা এবং ফল ফুলাদির সৌলভ্য ও প্রাচুর্য্য দর্শন করতঃ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন "বাঃ!!" শুনা যায়, সেই হইতে এইস্থানের নাম বাঃ (Wah) হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই গ্রাম অতীব মনোহর; প্রত্যেক চেতন্মান পথিক এই গ্রামের ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই গ্রামে একটীও কূপ বা সরোবর নাই, থাকিবার আবশ্যকতাও নাই, কারণ পর্ব্বতের প্রশস্ত শরীর হইতে অহোরাত্রি প্রচুর পরিমাণে সুশীতল ও স্বাস্থ্যকর সলিল নিঃসৃত হইয়া সমুদয় গ্রামবাসীর জলাভাব মোচন করিয়া থাকে। এখানে আঙ্গুর, দ্রাক্ষা, অখরোট্‌ লেবু প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সুরস ফল এত সুলভ ও প্রচুর যে, দুই পয়সার ফল ক্রয় করিলে একটা লোকের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার হইয়া থাকে। বাঃ গ্রামের জমিদার এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন অধিবাসী মহা-মান্য নবাব সার সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ, কে, সি, এস্, আই, মহোদয়, পঞ্জাবীয় মুসল-মান সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা। বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, শিক্ষা, সভ্যতা, ধন, মান, গৌরব, সৌরভ প্রভৃতিতে পঞ্জাবে হেয়াৎ খাঁর সমকক্ষ কোনও মুসলমান এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত বিক্রমী বৃটীশ সর-কারের অধীনে ডেপুটী কমিশনার এবং জজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পরি-নামে পেন্সন প্রাপ্ত হইরা কাশ্মীরের মহারাজাধিরাজের মন্ত্রিত্ব করিয়া সম্প্রতি পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। পাঠান-কুলতিলক হেয়াৎ খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর সর্দ্দার গোলাম মহম্মদ বাহাদুর পাঠান সমাজের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রান্ত প্রদেশে চিৎরালের (Chitral Frontiers) গবর্ণর শাসনকর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমি যখন ইঁহাকে অসংখ্যাসংখ্য

প্রবল পরাক্রান্ত, দুর্দ্দমনীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়,অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য এবং মহাহিংস্রক পার্ব্বতীয় মুসলমান ও মহাবিক্রমী হিন্দুজাতির গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত দেখিয়াছিলাম, তখন ইহাঁর বয়স ২৩ বৎসর মাত্র! অথচ অগণ্য প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একজনও হিন্দু অথবা একজনও মুসলমান ইহাঁর বিরুদ্ধে কদাপি এক-বারও অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কাশ্মীরের মহারাজা এবং বৃটীশ গবর্ণ-মেণ্ট উভয়েই ইহাঁকে সুদক্ষ ও সুযোগ্য পুরুষ বলিয়া ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া-ছেন। সর্দ্দার গোলাম মহম্মদের সন্তানের গবর্ণরী দেখিয়া অতঃপর আর কে বলিতে পারে, ভারতবর্ষীয় হিন্দু কি মুসলমান অল্প বয়সে দায়ীত্বপূর্ণ উচ্চ পদে আরুঢ় হইয়া স্বকার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম?

হোসেন আবদালের অব্যবহিত পরেই আটক নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর দেখিবার যোগ্য। যে নদের সুন্দর, সুশীতল ও স্বচ্ছ সলিলে কত শত হিন্দুবীর স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য হাস্য-মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গিয়াছেন, যে নদের পার্শ্বস্থ প্রশস্ত পার্ব্বত্য প্রান্তরে উপবেশন করিয়া কত শত সাধ্বী হিন্দুরমণী হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য কৈলাসপতি কপিসাঞ্জনের আরাধনায় বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-চর্য্যের কঠোরতা সহকারে অতি কাতর ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল, যে নদের তমিস্র তটদেশে বসিয়া স্বদেশবৎসল হিন্দুবীরেরা তরঙ্গতেজে একটী তর-ণীর জলমগ্ন-ভাব অবলোকন পূর্ব্বক ভারত-গৌরব-সাগরে হিন্দুর সাধীনতা-তরণীর সম্পূর্ণ বিনাশাশঙ্কা করিয়াছিলেন, * সেই ভুবনবিখ্যাত সিন্দুনদের তটে কালামুখী আটকনগরী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই আটকেই হিন্দুর সৌভাগ্য-সূর্য্য সর্ব্ব প্রথমে অস্তমিত হয়, এই আটকেই মুসলমান হস্তে হিন্দুর স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। কবি গাহিয়াছেন—

"একতায় হিন্দুরাজগণ সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন।
সে ভাব থাকিত যদি পার হোয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন?" ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আটক রাওলপিণ্ডি জেলার একটী মহকুমা। এই মহকুমা হইতে পেশাও-য়ার পর্য্যন্ত দুই ধারেই কেবল পাঠান আর পাঠান!! বাউরী চুল, লম্ব দাড়ি ও প্রশস্ত গুম্ফ সমাযুক্ত, ঘাঘরার ন্যায় সুলম্ব পায়জামা পরিহিত, সবল ও সুন্দর

---

* Read the "Mahomedan conquest of the Panjab" Part II. (Traditions), Page 168, By T. Bushanel, M.A., I. C. S.

দেহী পাঠান আর পাঠান ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। আটক পার্শ্বে সিন্ধু-নদের প্রশস্ততায় পথিকেরা চমৎকৃত হইয়া থাকেন। ভারতে প্রবেশ করিতে হইলে এই প্রশস্ত সিন্ধুনদের তরঙ্গায়িত বক্ষে তরণী ভাসাইতে হয়, তরণী দ্বারা সিন্ধু নদ পার হইয়া মুসলমানেরা সর্ব্ব প্রথমে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। আটকের পাঠানেরা প্রবল পরাক্রান্ত, ইহারা যেমন বিক্রমী, তেমনি (ইংরাজ) বিদ্বেষী। ইহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে, বিশ্বত্রাশ বৃটীশ-বীরকেও সভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়। এখানকার পরাক্রমী পাঠানেরা কেবল ছলী বা বলী নহে, ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং স্বধর্ম্মে ও স্বজাতিপ্রেমে দিবা-নিশি উন্মত্ত। ইংরাজ-বীর যত বড় বলীয়ান হউন, পাঠান-বীর কখনই ইংরা-জকে সমকক্ষ বলিয়া সম্মান করে নাই; এই জন্য একজন দরিদ্রাদপি দরিদ্র অথবা হীনাদপি হীন পাঠান-শিশু বৃটীশ বীরকেশরীকে মূষিক-শাবক বলিয়া এখনও উপেক্ষা করে। বাস্তবিক ইংরাজ সরকার এতদঞ্চলের পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত রাখিবার জন্য সততই সচেষ্ট, অথচ রাশি রাশি রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা জলের ন্যায় অপব্যয় করিয়াও ইংরাজ পুরুষ পাঠানের "মনের মানুষ" হইতে পারেন নাই। পাঠানদিগকে ইংরাজ বলেন "তোমরা তোমাদের আত্মমর্য্যাদা (Self-dignity) ছাড়িয়া দাও," পাঠান বলে "যেদিন আত্মগৌরব ছাড়িব, সেই দিন আমাদের পতন হইবে। মানুষ যদি আত্মমর্য্যাদা ছাড়ে, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সে মানুষে আর পাথরে কিছুই প্রভেদ থাকে না। খাইতে বা পরিতে না পাই, তবুও ভাল, তথাপি কুল-গৌরব ছাড়িতে পারি না।" বাস্তবিক পাঠানের ভয়ে পরাক্রমী ইংরাজ সদাই ভীত; বাস্তবিক এদেশে ইসলামে ও ইংরাজে অহি নকুলের সম্পর্ক বিশেষরূপে বিদ্যমান। পাঠানের ভয়ে ইংরাজকে সতর্ক ও সভয় দেখিয়া আমরা ইংরাজ-পুরুষকে কাপুরুষ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না, বরং বৃটীশের বুদ্ধিমত্তা, চতুরতা, সাবধানতা ও রাজনৈতিক কুশলতার আমরা প্রকৃষ্টরূপে প্রশংসা করিয়া থাকি, কারণ "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতির অনুসারী না হইলে এদেশে বাস করা সংসারী লোকের পক্ষে সুকঠিন। পাঠানকে ভয় করিবার অনেক কারণ আছে; পাঠানেরা জীবনে মমতা-শূন্য, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণাবলী হইতে বিগত-হৃদয়, স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য সর্ব্ববিধ ছলের প্রকৃষ্ট পরিপোষক, প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় সতত প্রমত্ত, সর্ব্বপ্রকার উদার সংস্কারে অন্ধ, এবং দেশশত্রু, ধর্ম্মবৈরী, ফিরিঙ্গির শোণিত দর্শনে স্বর্গলোকে মোক্ষ-

লাভ হয়” এই বিশ্বাসে সর্ব্বথা অনুপ্রাণিত। তদ্ভিন্ন আর একটা বিশিষ্ট বিষয় ভাবিবার আছে। গুপ্ত শত্রু হইতে প্রকাশ্য শত্রু চিরকালই প্রশংসার পাত্র। “ঘরভেদী বিভীষণ” লঙ্কাধিপতি রাবণের যেরূপ ভীতির কারণ ছিলেন, রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র সেরূপ ভীতির কারণ ছিলেন না; কারণ রাম প্রকাশ্য বৈরী কিন্তু বিভীষণ গুপ্ত শত্রু। লুপ্ত-ধর্ম্ম পাঠানেরা গুপ্ত শত্রু বলিয়া ইংরাজের এত ভয়! আটকের দুই পার্শ্বে, পাঠান প্রদেশের পার্ব্বত্যাংশের অনেক দূর ব্যাপিয়া বড় বড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বৃটীশ-বীর পাঠানের কোপ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছেন। বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য এইটা খুব প্রয়োজনীয় দ্বার। এই পথে পথিকদিগকে নানা প্রকার কঠিন রাজনৈতিক নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। সন্দেহ হইলে প্রান্ত-প্রদেশস্থ কর্ম্মচারীকুল, পথিকদিগের দ্রব্যাদি অবাধে অনুসন্ধান করিতে পারেন। সন্দেহের বিশিষ্ট কারণ থাকিলে রাজবিধি মতে তাঁহারা পথিকের গতিরোধ করিতে পারেন। আটকের সেনা, সেনাধিনায়ক ও রাজনৈতিক কর্ম্মচারীগণ সততই সতর্ক থাকেন; কূটরাজনীতি-বিদ্যায় ইহাদের এক এক-জন দ্বিতীয় চাণক্যের সমতুল্য; কিন্তু পাঞ্জাবীয় পাঠান-প্রদেশে যাহাই কিছু দেখ, ইংরাজের “সরগর্ম্মী”, সাবধানতা ও কীর্ত্তিমালার দিকে যতই দৃষ্টিপাত কর—আটক পার্শ্বস্থ সিন্ধু-বক্ষের সেতু সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুককর ও বিস্ময়োদ্দীপক বলিয়া বোধ হয়। আটকের সিন্ধু-সেতু বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব পদার্থ!! সিন্ধু-নদের উপরে এই সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত সেতু ভারতের উত্তর প্রান্তের প্রধান দ্বার-স্বরূপ। এই দ্বার রক্ষা করিতে পারিলে ভারত রক্ষা হয়। তৈমুরলঙ্গ, আলা-উদ্দীন, মহম্মদঘোরী, সবকৃতাগীন, আল্‌পতাগীন, কাসিম, আলেক্‌জন্দর (সেকেন্দর বাদসাহ), সিলিউকশ্‌, দরায়ুস, প্রভৃতি এই পথ দিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। সোলেমান ও শতাবৈর পর্ব্বতের মধ্যদেশে সিন্ধুবক্ষে ইংরাজ প্রভু এই মহাসেতু বন্ধন করিয়া বৃটীশ সিংহের প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া-ছেন। রাউলপিণ্ডি এবং তাহার পার্শ্বে প্রায় দ্বাবিংশটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বৃটীশ-বীর বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাতেই আবার এই সেতুর উদ্ভব!! ইংরাজী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধুনদের নাম ইন্‌ডশ বৃজ্‌—*Indus Bridge*—এই সেতুর উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে গমনাগমন নিষিদ্ধ। সেতুর দুই পার্শ্বে (অর্থাৎ প্রথম দ্বারে ও শেষ দ্বারে) শাণিত তরবারি হস্তে বৃটীশ-সৈনিক পুরুষ অহোরাত্র দণ্ডায়মান থাকিয়া সেতু

রক্ষা করিয়া থাকে। রেলগাড়ী চলিয়া গেলে, দ্বারদ্বয়কে বদ্ধ করা হইয়া থাকে। সেতুপার হইবার পরে চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, ঐ পর্ব্বত সমূহ একদিকে কোমলতা, অন্যদিকে কঠিনতার পরিচায়ক। একদিকে বিবিধ প্রকার প্রস্ফুটিত প্রসূনপুঞ্জের মনোহর সমাবেশ, অন্য দিকে কেবল কঠিন ও বন্ধুর প্রস্তর আর প্রস্তর! এই স্থান হইতেই সুপ্রসিদ্ধ সোলেমান, মুখর্দা, হিন্দুকুশ, হাজারা, কৃষ্ণকোহে, বাবা-এ-কোহে প্রভৃতি পাহাড়ের সূত্রপাত। সেতু পার হইবার পরে বহুদূর পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত প্রান্তর এবং পার্ব্বত্য পথ সমূহ অতিক্রম করিয়া নয়োসারা (Nowsara) প্রভৃতি স্থান সমুদয় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের রক্ষা জন্য এবং উত্তরপ্রান্তকে প্রান্তবাসী নানাবিধ দুর্দ্দান্ত মুসলমান-জাতিদিগের প্রকোপ হইতে নিরাপদ করিবার জন্য ইংরাজেরা কত যে অসাধারণ আশ্চর্য্য কৌশল এবং কূট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না। এই স্থান হইতে প্রান্তপ্রদেশ (Frontier) আরম্ভ। এই সকল স্থান "পাঠান-গাজী" পুঞ্জে পরিপূর্ণ। পাঠান গাজীর কথা একটু পরে বলিব। এই প্রান্তপ্রদেশের শেষ সীমা পেশোয়ার, ইহাই ভারতভূমির এক দিকের শেষ সীমা, ইহার পরে আর রেল নাই। পেশোয়ার নগর, পাঠানদিগের মহা আড্ডা (Strong-hold)। পেশোয়ারের পরে কাবুলের পথ, তাহা ভারতভূমির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমার বাহিরে অবস্থিত। পেশোয়ার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। "ভয়ঙ্কর" শব্দ ব্যবহার করিবার অনেকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, এখানে শীত ঋতুতে যেমন ভয়ানক শৈত্যানুভব হয়, গ্রীষ্মকালে সেইরূপ ভয়ানক উষ্ণতানুভব হইয়া থাকে। শীত ও গ্রীষ্মের ইহাতে চরম (Extremes) আছে বলিয়া এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। গ্রীষ্মের তীব্রাদপি তীব্র রৌদ্রে, অতীব উষ্ণ বায়ুর প্রবাহে, পথস্থিত প্রস্তরখণ্ডের উষ্ণতায়, বালুকার তাপে, পর্ব্বতের উষ্ণত্বে, বিশেষতঃ "লু" নামক হুতাশন সম উষ্ণ ও ভয়ঙ্কর বায়ুর প্রকোপে, অনভ্যস্ত এবং নবাগত পথিকেরা কর্ত্তিত-কণ্ঠ রোহিতের ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে। শীতকালে এক এক দিন এমন শীত হয় যে, ইংলণ্ডের দারুণ শৈত্য অপেক্ষা কম শৈত্য হয় বলিয়া বোধ হয় না। আমি পৃথিবীর অনেক শীতল দেশের শৈত্য সহ্য করিয়াছি, কিন্তু পেশোয়ারের শীত আমার পক্ষেও অনেক সময়ে অসহ্য হইয়াছিল। একদিন পেশোয়ারে বসিয়া শীতঋতুতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমূহ প্রবল শীতে এমন অসাড় হইয়া

গেল যে, সম্মুখস্থিত প্রতপ্ত অঙ্গারময় লৌহ-পাত্রের উপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি রাখিয়া তবে পুনরায় অঙ্গুলি প্রসারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এখানে আশ্বিন মাসের শেষে যেরূপ শীত হয়, বাঙ্গালা দেশে মাঘ মাসেও বোধ হয় সেরূপ শীত হয় না; পেশোয়ারে মাঘের শীত বাস্তবিক বাঘের বিক্রম বলিয়া বোধ হয়। পেশোয়ারের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে প্রতি ৯৫ জনের মধ্যে ৯১ জন পাঠান। কেবল নগরে প্রায় এক লক্ষ ২৬ হাজার পাঠান বাস করে। পথে, ঘাটে বা মাঠে অসংখ্য পাঠান পুরুষকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু একটীও পাঠান রমণীকে দেখিতে পাইবে না। কদাচিৎ যাহারা দৃষ্টিপথে পতিতা হয়, তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ হইতে পদ পর্য্যন্ত, রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী মহাশয়ের "ঘাঘরার" ন্যায় এক অপূর্ব্ব লম্বমান "বুরখা" পরিচ্ছদে আবৃত থাকে। কেবল চক্ষু দুইটী খোলা থাকে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; চক্ষু দুইটীও অতি সূক্ষ্ম জাল্‌দার আবরণে আবৃত। পাঠান স্ত্রীলোকেরা বলবতী, পরিশ্রম-পরায়ণা, সুন্দরী, অতিথিসৎকারিণী, পতির আজ্ঞাবাহিনী, সাহসিকা এবং স্বধর্ম্মানুরাগিণী। সন্তান ও সন্ততিদিগকে ইহারা অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করে। পেশোয়ারে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন কালী মন্দির আছে; সৌভাগ্যক্রমে মুসলমানেরা সেখানে কখনও অত্যাচার করে নাই। বহুপূর্ব্বে একটী "বঙ্গসাহিত্য সভা" এবং "বাঙ্গালী পাঠাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই।

পেশোয়ারে আসাম প্রদেশের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কখনও কখনও মাসে ছয় সাত বার ভূমিকম্প হইতে দেখা গিয়াছে। এই জন্য সেখানে অধিকাংশই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহ; ইষ্টক বা প্রস্তরের বাটী প্রায়ই নাই। পেশোয়ার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম "পেশোয়ার ছাউনী" (Cantonment) অন্য ভাগের নাম "সহর" (City)। পারস্য ভাষায় পেশা শব্দের অর্থ ব্যবসা; আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষ, মধ্য আসিয়া, প্রভৃতি নানা স্থানের মুসলমান ব্যবসাদারেরা এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া ইহার পেশোয়ার (অর্থাৎ ব্যবসায়ীদিগের আড্ডা) এইরূপ নাম হইয়াছে। পেশোয়ার ছাউনীতে (সেনা নিবাসে) ইংরাজেরা বাস করে, সহরের ভিতরে তাহাদের কেহ বাস করে না এবং করিতেও পারে না। সমুদয় সহরটী উচ্চ ও দৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহার অনেক দ্বার

আছে, কতকগুলি দ্বারের নাম লাহোর দরজা, কাবুল দরজা, দিল্লী দরজা ইত্যাদি। সহরের ভিতরে অসংখ্যাসংখ্য মুসলমানের বসতি। আমাদের গৃহের মধ্যে এক স্থানে একটু গুড় ফেলিয়া দিলে, স্বল্পকাল মধ্যে যত রাশি রাশি পিপীলিকা জমে, পেশোয়ারের এক এক পল্লীতে সেইরূপ রাশি রাশি পাঠান জমিয়া আছে। ইহারা ইংরাজের ঘোরতর বিদ্বেষী। ইংরাজ বধ করিতে পাইলে ইহারা স্বর্গবাসী হইবে, ইহাই ইহাদের ভ্রমাত্মক ধ্রুব বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে গাজী সম্প্রদায় অত্যন্ত উন্মাদভাবাপন্ন (Fanatic and Desperate) ; ইহারা যেমন বলবান, যেমন কুসংস্কারাপন্ন, তেমনি ধর্ম্মান্ধ এবং অশিক্ষিত। একটু সুবিধা পাইলেই, ইংরাজের গলায় ছুরিকা বসাইয়া দেয়। প্রতি বৎসর বহুল ইংরেজ এইরূপে ইহাদের হস্তে নিহত হইয়া থাকে। সাহেবেরা সততই পাঠানের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকেন। বাজারে আসিলেও তাহারা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েন। ক্যাণ্টনম্যাণ্টের ভিতরে গিয়াও গাজীরা সাহেবদিগকে সুবিধা মত বধ করে। ইংরাজ স্ত্রীলোক সহরের ভিতর প্রায়ই আসেন না। গাজীর দৌরাত্ম্যে বৃটীশবীর সততই চিন্তিত থাকেন। সম্প্রতি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর "গাজী আইন" বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার মূল মর্ম্ম এই যে "হত্যাকারী গাজী ধরা পড়িলে প্রথমে তাহাকে নগরের প্রকাশ্য পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া সর্ব্বজন সম্মুখে বেত্রাঘাত করা হইবে, তদন্তর প্রকাশ্য ভাবে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে উঠাইয়া নিহত করা হইবে।" আমার বোধ হয় না, ইহাতে গাজীর উপদ্রব কখনও কমিয়া যাইবে, বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে, "ভবি ভোলবার নয়" —গাজী কখনও ইংরাজ-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইবে না, ইহা নিশ্চয়। এক একটা গাজী এমন সুচতুর যে, সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভদ্রতা ও সততা দেখাইয়া ইংরাজকে মহাকুহকে পাতিত করে, কিন্তু পরিণামে ইংরাজকে তাহার ভ্রমের জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। ইংরাজ পুরুষ এখন পাঠানের ছদ্মপ্রেমের পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছেন যে—

মাছ মরেছে, বিড়াল কাঁদে, শান্ত কোল্লে বকে।
ব্যাঙের শোকে, সাঁতার পানি, হেরি সাপের চোখে।

পেশোয়ারের পাঠান হস্তে সাহেবের খুন প্রায় নিত্য ঘটনা বলিলেও বলা যায়, ইহা তথাকার প্রবাদ বাক্য। রবিবার দিবসে সাহেবদিগের গির্জ্জায় নেমাজ হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে নগরের প্রায় সমুদয় ইংরাজ পুরুষ ও রমণী গির্জ্জায় একত্রিত হইয়া থাকে ; গির্জ্জাটী সহরের অভ্যন্তরে এবং

প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও পরাক্রমী পাঠানপুঞ্জের মধ্যে সুদৃঢ় ভাবে অবস্থিত; সুতরাং পাঠানদিগের পক্ষে রবিবার "পহো বার" দিন !! ইংরাজও অসতর্ক নহেন, সেই দিন গির্জ্জার চারি পার্শ্বে ও সমুদয় পথে শাণিত তরবারী হস্তে পুলীশ প্রহরী এবং বৃটিশ সেনার ছড়াছড়ি হইয়া থাকে। তবুও সুবিধামতে দুই একটা খুন প্রায়ই হয় !!

পেশোয়ারে মাংস যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, মূল্যও তেমনি সস্তা। অনেক সময়ে মৎস্য আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতা বড়ই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। বাজারে যে দিন কেহ মাছ বেচিতে আসে, সে দিন বাঙ্গালীর "পহোবারো" !! সে দিন বাঙ্গালীর মনে পরমানন্দের উদয় হয় এবং বাঙ্গালী মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। কবি রূপচাঁদ পক্ষী গাহিতেন—

"কায়েৎ মরে খেয়ালে, বেণে মরে দেয়ালে, জোলা মরে তাঁতে।
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মরে মাছে আর ভাতে॥" *

তিনি আর এক সময়ে গাহিয়াছিলেন—

উড়ে মজে খিঁচুড়ি, মেড়ুয়া মজে রোটি।
বাঙ্গালী মজে মাছ ভাত, কাঙ্গালী মজে ঘটি। *

আসল কথা এই, বাঙ্গালী বাবু দিল্লীতেই থাকুন, আর মক্কাতেই থাকুন, মাছ ভাত ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর নাই।

বিশিষ্ট হিন্দুর বিশ্বাস মতে, সিন্ধু নদ পার হইলেই ভারতের সীমার শেষ হয়, এজন্য পেশোয়ারকে হিন্দুরা ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই নগরে অসংখ্যাসংখ্য মুসলমানের বসতি, নিত্য অসংখ্যাসংখ্য গোহত্যা, অগণ্য মস্‌জিদ্‌, দর্‌গা, মক্‌বরা, গোরস্থান এবং গোমাংসের দোকান দেখিয়া হিন্দুরা এই নগরকে হিন্দুস্থানের অন্তর্গত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। সহরের সর্ব্বত্রই পলাণ্ডু, রসুন ও গোমাংস পাকের গন্ধে রাস্তার ধারে হিন্দুর পক্ষে

---

* কায়স্থের হাতে টাকা আসিলে তাহার মনে নানাবিধ খেয়ালের উৎপত্তি হয়। সোণার বেণের টাকা হইলেই সে অট্টালিকা তৈয়ার করিয়া ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে।

* কাঙ্গালী (ভিখারীগণ) প্রায়ই একটা ঘটি (লোটা) হাতে লইয়া ভিক্ষা করে; ভিখারীদিগের ইহা একটা ভূষণ-স্বরূপ।

দণ্ডায়মান থাকা নিতান্তই অসুবিধাজনক। হিন্দুরা, তাহাদের বিবাহ, উপনয়ন, ব্রত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতের সীমায় আগমন পূর্ব্বক, সম্পন্ন করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, পেশোয়ারের মধ্যে হিন্দুর মৃত্যু হইলে, মৃত হিন্দুর আত্মীয়েরা মৃতদেহকে সিন্ধুনদের পারে লইয়া আসিয়া দাহ করে এবং এই পারেই তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিশিষ্ট হিন্দুরা এই নিয়মের প্রায়ই ব্যতিক্রম করেন না।

এই নগরে কাবুলের আমীরের একটা পোষ্টাফিশ আছে, সেই ডাকঘরে চিঠি দিলে কাবুলে তাহা প্রেরিত হইয়া থাকে। কাবুলদ্বরজা পার হইলে আফ্‌গানিস্থান অভিমুখে যাওয়া যাইতে পারে। এই পথ নিরাপদ নহে। যাহা হউক, পেশোয়ারে বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ফল ও সুন্দর কুসুম নিয়ত সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সরদা নামক ফল সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর, কিন্তু ইহার মূল্য অধিক। পেশোয়ারের পাঠান "মানুষ চুরি" (Kidnapping) জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ছোট ছোট বালক ও বালিকাদিগকে চুরি করিয়া লইয়া বিক্রয় করে; এরূপ ঘটনা প্রতিদিন প্রায় দুই বেলা শুনা গিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মুসলমান দারোগা ও মুসলমান কনেষ্টবলগণের সহিত পাঠানদিগের বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকিত, পুলিশের লোকেরা পাঠানদিগের সম্বন্ধে পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতায় গোপনে অনেক অবৈধ কার্য্য করিত, এইজন্য অধুনাতনকালে অধিকাংশ পুলিশ কর্ম্মচারী ও প্রধান অমাত্যগণ প্রায়ই হিন্দু।

লাহোরে যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন হইতেই পঞ্জাব প্রদেশে পাঠানের প্রভুত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে। বলে, বিক্রমে, সাহসে, স্বাধীনতায়, উদ্দীপনায় এবং বিশেষতঃ ব্যবসা ও বাণিজ্যলব্ধ ধনে ইহারা কোনও কালেই হিন্দু হইতে ন্যূনতর ছিল না, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইহারা কখনই হিন্দুর সমকক্ষ হইতে পারে নাই; শিক্ষা, স্বভাব ও ধর্ম্মজ্ঞানে ইহারা এখনও হিন্দুর তুলনায় কোটি ক্রোশ পশ্চাতে অবস্থিত। লাহোরে শিখ রাজার শাসন সময়ে, পাঠানেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজা রণজিত সিংহের রাজত্বকালে পাঠান দলপতিরা শিখদিগের প্রভুত্বকে উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর বিদ্রোহী হয়। বিক্রমকেশরী এবং সমরকুশল রণজিত সিংহ এজন্য বিশেষ চিন্তিত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি যুবক হরি সিংহ (ওরুফে হর্‌ সিং) মহাশয় অতীব বলবান ও সাহসী শিখসেনাকে সঙ্গে লইয়া, খ্রীষ্টীয় ১৮১৮ অব্দে পেশোয়ারে, আগমন

পূর্ব্বক ক্রমাগত সপ্তমাস কাল পর্য্যন্ত অমিত সাহস, অভূতপূর্ব্ব অধ্যবসায়, বিশিষ্ট বিক্রম এবং অনন্যসাধারণ উদ্দীপনার সহিত পাঠানদিগকে যেরূপে দমন করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা। স্থূল কথা এই যে, এরূপ আশ্চর্য্য দমন ও শাসন ব্যাপার পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়। হরি সিংহ রূপ শিখ-নকুল, অহিরূপ পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহাদের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। পাঠানকে দমন করিবার জন্য শিখেরা পুনঃ পুনঃ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল; শিখকে দমন করিবার জন্য পাঠানেরাও পরিশ্রম-পরায়ণতার পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে ত্রুটি করে নাই। মার্কবী নামক জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন—"It was a regular contest between labour and genius" দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া একত্রে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহাদের মধ্যস্থানে একটা বৃহদাকার মৃন্ময় পাত্রে তপ্ত অঙ্গার রাখা হইত এবং সেই অঙ্গার পূর্ণ হাঁড়িতে শুষ্ক লঙ্কামরিচ নিক্ষিপ্ত হইত, পাঠানেরা কাসিতে কাসিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। বড় বড় লম্বমান দাড়ী সমাযুক্ত পাঠানদিগের দাড়ী পরস্পরের দাড়ীর সহিত বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইত, কাহাকেও বা উন্মত্ত সারমেয় বা শৃগালের দ্বারা দংষ্ট্র করান হইত, কাহাকেও ঊর্দ্ধপদ এবং অধোশির ভাবে বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা তাহার গায়ের চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিত। এইরূপ ব্যবহার নৃশংস জনোচিত কি না, তাহার বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু নিরপরাধী শিখ ও হিন্দু পুরুষ এবং সতী স্ত্রীলোকদিগের উপরে পাঠানেরা যে সয়তানী ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যে কঠোর দণ্ডের উপযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা অকারণে রাজবিদ্রোহী হইয়া সমগ্র রাজ্যের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। পেশোয়ার নগর মধ্যে একটা স্থান আছে, তাহার নাম "হরিসিংহের মাতম্", উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে সহস্র সহস্র পাঠান হরি সিংহের তরবারিতে নিহত হইয়াছিল। পাঠানেরা দূর হইতে এখনও সেই মাতম্ দর্শন করিলে ভয়ে ভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেনাপতি হরিসিংহের বয়স তখন মোটে ২৭ বৎসর! বাস্তবিক, শিখের কাছে পাঠানেরা শিষ্য মাত্র। হরি সিংহের মত কত শত বীর ভারতের ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তখন ২৭ বৎসরের যুবারা সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইত, এখন একটী বিলাতফেরৎ

সবলদেহী সুশিক্ষিত ও সাহসী বাঙ্গালী বাবুকেও ইংরাজ প্রভু ভলণ্টিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে নারাজ!!

পাঠানেরা সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত,ইহাদের কেহই শিয়া নহে। পাঠান শব্দ "পিয়াঠাম" শব্দের অপভ্রংশ, পিয়াঠাম শব্দ পিয়াথাম শব্দের বিকৃতি, এবং পিয়াথাম শব্দ সংস্কৃত "প্রিয় স্থান" শব্দের অপভ্রংশ। রঘু রাজার দিগ্বিজয় কালে ভারতের যে "প্রিয় স্থান" নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহাই এক্ষণে পাঠান মুলুক বলিয়া পরিচিত। রঘু রাজা সমগ্র পাঠন দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম ছিল না। রণজিত সিংহের শাসন কালে কাবুল শিখের করতলগত হয়। এই প্রাচীন "প্রিয় স্থানের" লোকেরা দুর্ভাগ্যক্রমে, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের দোষে, সভ্য জাতির নিকটে এক্ষণে অতীব, "অপ্রিয়" বলিয়া পরিগণিত উঠিয়াছে। পাঠানের উপদ্রবে ভারতবাসীদিগকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ভারতের বহিঃপ্রান্তে পথিকেরা পাঠানদিগের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে। ডাক লুণ্ঠনের ত কথাই নাই; ডাকাইতি, রাহাজানী, মানুষ চুরি, ধর্ম্মনাশ, সতীত্ব নাশ প্রভৃতিতে ইহারা খুব পটু। সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের অনেক ডাকাইতি মোকর্দ্দমায় পঞ্জাবের পাঠানেরা অপরাধী বলিয়া গুরুতর দণ্ড পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান সাহেব আবদুল্লা নামক এক পাঠান-ঘাতকের শাণিত ছুরিকাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আণ্ডামান দ্বীপে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মোয়া সের আলি নামক এক পাঠানদস্যুর হস্তে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। ইংরাজেরা পঞ্জাবের পাঠানকে দমন করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়, কত যত্ন স্বীকার, কত খোসামুদী, কত প্রলোভন এবং শেষে কত ভয় প্রদর্শন ও কত কুট কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু পাঠান যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। এখনও ইহারা বলে—

জান্‌কা বদল্ মে জান্ হাতকা বদল্ মে হাত।
আওরৎ কা বদল্ মে আওরৎ দাঁতকা বদল্ মে দাঁত॥

খ্রীষ্টানের বাইবেলে লিখিত আছে, "An eye for an eye and a tooth for a tooth" কিন্তু খ্রীষ্টীয় পাদ্রী প্রায়ই তাহা করেন না, কিন্তু এক জন পাঠান সুবিধা পাইলে, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ, স্ত্রীর পরিবর্ত্তে স্ত্রী, হাতের পরি-

বর্ত্তে হাত এবং দাঁতের পরিবর্ত্তে দাঁত লইতে কখনই নিরস্ত বা অস্বীকৃত হয় না। পাঠান দেশ কি ভয়ানক !!

এক পেয়ালা মদ !

অনেকের বিশ্বাস, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুরাপান করিলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার অধোগতি হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে মদিরায় অভ্যস্ত হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়; এ কথা সত্য। কিন্তু এক পেয়ালা মদে যে এক বিন্দু বিষের ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। বাল্যকালে বিশেষতঃ যৌবনের প্রারম্ভে সকলেরই এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর।

এক সময়ে ভুবনবিখ্যাত সম্রাট আকবরশাহ্ তাঁহার শত বিদ্যাধর হিন্দুমন্ত্রী রাজশ্রী বীরবলকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মন্ত্রি, যেমন মনুষ্য মধ্যে কেহই সম্পূর্ণ গুণহীন অথবা দোষযুক্ত হয় না, সেইরূপ আহার্য্য বা পানীয় পদার্থপুঞ্জের মধ্যে কোনটাই নিরবচ্ছিন্ন গুণহীন বা দোষহীন হইতে পারে না; সুতরাং মদিরার মধ্যেও কোনও বিশেষ গুণ থাকা সম্ভব—নিতান্ত সম্ভব।" মৃদু-মধুর হাস্য করিয়া বীরবল কহিলেন, "হে দিগ্বিজয়ী নরশ্রেষ্ঠ! মদিরায় আপাততঃ তিনটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটী এই যে, যে ব্যক্তি সুরাপান করে, তাহাকে কুক্কুরে বা শৃগালে দংশন করিতে পারে না; দ্বিতীয় গুণ এই যে, সুরাপায়ীর মস্তকের কেশ কখনও শুভ্র হয় না; তৃতীয় গুণ এই যে, যাহারা মদিরা পান করে, তাহাদিগের গৃহে কখনও তস্কর প্রবেশ করে না।" বীরবলের মুখে এই সকল কৌতুককর কথা শ্রবণ করিয়া সম্রাট আকবর আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মন্ত্রীবর, এইরূপ আশ্চর্য্য কথা ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও মুখে শ্রবণ করি নাই। যে মদিরায় লোকের ধন, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, যশ, সুখ, শান্তি, জ্ঞান প্রভৃতি লুপ্ত হয়, সেই মদিরায় এত গুণ, ইহা জানিতাম না। যাহা হউক, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; এই রহস্যময় উত্তরের সরলভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমার কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করুন।" পুনরপি হাস্য করিয়া বীরবল কহিলেন, "হে নরাধিপ, যে সকল ব্যক্তি সুরাপান করে, তাহারা প্রায়ই হৃৎরোগ,

(Heart-disease), বাত, হস্তপদাদির অবসন্নতা প্রভৃতি রোগে নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হয়; সুতরাং যষ্টি ভিন্ন গৃহের বাহির হইতে পারে না। হস্তে যষ্টি থাকিলে কুকুর বা শৃগাল যষ্টিধারীর নিকটে আসিতে সাহস করে না। এইজন্য প্রায়ই সুরাপায়ীর জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগ হয় না। দ্বিতীয়তঃ মদিরাপায়ী-গণ ক্রমাগতঃ এই মহাবিষ সেবন করিতে করিতে বহুপ্রকার প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয় এবং নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের সহিত বহুপ্রকার উৎকট চিন্তায় এবম্প্রকারে হীনবুদ্ধি হইয়া যায় যে, চত্বারিংশ বর্ষ বয়ক্রম অতীত না হইতে হইতেই মদিরাপায়ীগণ অতীব মনোকষ্টের সহিত ভবলীলা সম্বরণ করে। মস্তকের কেশ শুভ্র হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রাণবায়ু পার্থিব দেহ হইতে বহি-র্গত হইয়া যায়; সুতরাং সুরাপায়ী কেহই দীর্ঘজীবী হয় না। তৃতীয় কথা এই যে, মদিরাপায়ীগণ প্রায়ই যক্ষ্মা ও কাশরোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়, সুতরাং রাত্রিতে তাহাদের সুনিদ্রা হয় না, প্রায় সমস্ত রজনী তাহাদিগকে জাগিয়া থাকিতে হয়. এই জন্য তাহাদিগের গৃহে তস্করের প্রবেশের সুবিধা থাকে না। অধিকন্তু মাতালেরা মদের নেশায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া প্রায়ই দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করে, সুতরাং এইরূপ দরিদ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া তস্করগণ কেন অনর্থক সময় নষ্ট করিবে? বীরবলের কথা শুনিয়া সম্রাট আকবর উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নিকটে সচিবশ্রেষ্ঠ আবুলফাজেল দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি কহিলেন, "হুজুর, সুরাপান-সম্বন্ধে আমার কাছেও একটা সারগর্ভ অথচ হাস্য-কর গল্প আছে। যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে ব্যক্ত করি।" সম্রাটের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীবর ফাজেল যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমি নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।—

একজন সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ, সুস্থদেহ এবং সম্পূর্ণ চরিত্রবান্ যুবাপুরুষ একদা পরিব্রজন করিতে করিতে বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালায় ক্লান্ত হইয়া শ্রান্তিদূর করিবার অভিপ্রায়ে এক সুবৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিতেছিলেন; অদূরে এক বৃহদাকার এবং মনোরম অট্টালিকা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ যুবা তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন,—অট্টা-লিকার চারিটী দ্বার; এক দ্বারে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান হইয়া অট্টালিকা-দর্শনাকাঙ্ক্ষী পথিকগণকে কহিতেছে, যদি কেহ এই দ্বার দিয়া অট্টালিকা-ভ্যন্তরে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমার সম্মুখস্থিত পাত্রমধ্যে যে শূকর মাংস রহিয়াছে, তাহাই তাহাকে খাইতে হইবে। অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে

এই দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" যুবক কহিল, আমি পরম হিন্দু, ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমার পক্ষে এইরূপ ম্লেচ্ছজনবিগর্হিত আচার সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। যাহা হউক, যুবক দ্বিতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন,এক পরমা লাবণ্যময়ী যুবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা হইয়া কহিতেছে, "আমি সতী ; এ পর্য্যন্ত পরপুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করি নাই ; যদি তুমি এই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইতে চাহ, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর।" কথা শুনিয়া ধার্ম্মিক যুবার দেহ কণ্টকিত হইল। চোখে ও মুখে কাপড় দিয়া তিনি তৃতীয় দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক বলিতেছে, "যদি তুমি এই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইতে চাও, তাহা হইলে আমাকে বধ করিয়া আমার গাত্রস্থিত অলঙ্কারসমূহ অপহরণ কর।" যুবা কহিল, "কি সর্ব্বনাশ ! এই দ্বারে চৌর্য্য এবং নরহত্যা এই দুই মহাপাপ বর্ত্তমান।" যাহা হউক, যুবা শেষ দ্বারে অর্থাৎ চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছে, "আমার হাত হইতে এক পেয়ালা মদ লইয়া খাও, তবে ভিতরে যাও।" সুশিক্ষিত যুবা মনে মনে ভাবিলেন, শুনিয়াছি এরূপ অট্টালিকা জগতে আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং একবার এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু প্রথম তিন দ্বারের মহাপাপ সমূহ আমার দ্বারা কিছুতেই সংঘটিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান দ্বারে কেবল একটি ছোট পেয়ালা মদ অর্থাৎ সামান্য মাত্র মদিরা পান করিলে ভিতরে যাইতে পারা যায়। এই ভাবিয়া "দুর্গা দুর্গা" উচ্চারণ করিয়া যুবক অবাধে ঐ সামান্য মদিরা পান করিল। যুবা কখনও মদ খায় নাই। সুতরাং এক পেয়ালা মদেই তাহার যথেষ্ট নেশা জন্মিল। বলা বাহুল্য, ঐ নেশার সময়ে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া যুবক ক্ষুধিতাবস্থায় শূকরমাংস ভক্ষণ, তদন্তর পাশব প্রবৃত্তিতে উৎফুল্ল হইয়া সতী স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ এবং তাহার পরে ঐ বালকের প্রাণবধ ও তাহার মূল্যবান অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিল না। অবশেষে নিশীথকালে নেশায় বিভোর হইয়া এক গর্ত্তে পতিত হওয়ায় তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। ইত্যবসরে পুলিশের লোকেরা আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারপূর্ব্বক হাজতে বদ্ধ করিল। এখন দেখা গেল এবং বুঝা গেল, এক পেয়ালা মদ-পানে পৃথিবীর কোন মহাপাপই আর বাকী রহিল না। যাহারা বলে, অল্প মদে অনিষ্ট হয় না, তাহাদের জানা উচিত, এক পেয়ালা

মদিরা এক বিন্দু সুতীব্র হলাহলসমতুল্য। বস্তুতঃ মানুষে মদ খায় না, কিন্তু মদ মানুষকে খায়!

কুমারিকা অন্তরীপে।

কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে সুদূর মান্দ্রাজনগরে উপনীত হইলাম। বাঙ্গালাভাষায় যাহাকে আমরা মান্দ্রাজ এবং ইংরাজিতে ম্যাড্রাশ বলি, মহাভারতোক্ত তাহাই প্রকৃত মদ্ররাজ্য। মান্দ্রাজে অবস্থান করিতে করিতে কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin) দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। অনিকেতনী পরিব্রাজকেরা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, সুতরাং অন্ধকারময়ী রজনীর দ্বিপ্রহরে জলে ভিজিতে ভিজিতে এগ্‌মোর (Egmore) ষ্টেশনে ত্রিনেবেল্লী (Tinevelly) নগরীর টিকিট লইয়া রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিলাম। মান্দ্রাজ হইতে ত্রিনেবেল্লী যাইতে হইলে আঠার ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। ত্রিনেবেল্লী নগরী ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সর্ব্বশেষ বৃটিশ ডিসট্রীক্ট (জেলা)। ইহার পরে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরে কোচিনের মহারাজার অধিকার, তাহার পরে ভারতমহাসাগর; এইস্থানেই সুবিশাল ভারতবর্ষের শেষ সীমা। ত্রিনেবেল্লী নগরী তাম্রী নদীর তীরে অবস্থিত, এখানে বারমাস আম পাওয়া যায়। নারিকেল, সুপারি এবং আম এদেশে খুব সস্তা; জলবায়ু বঙ্গদেশাপেক্ষা উষ্ণতর। এই নগরী, দক্ষিণ পথের রেলওয়ে লাইনের শেষ সীমা। এখানে অনেকগুলি বলদ-শকটের (Travancore Bullock Train Company) আফিস আছে। ইহাদের শকটে আরোহণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যাওয়া যায়। কুমারিকা নগরী ত্রিবাঙ্কুর মহারাজার অধিকারভুক্ত। ত্রিনেবেল্লী হইতে একেবারে কুমারিকা অন্তরীপের টিকিট পাওয়া যায় না, যে আড্ডার টিকিট প্রথমে পাওয়া যায়, তাহা দেড়দিনে পৌছিতে হয়। আমরা একটা অফিসে টিকিট খরিদ করিয়া দেড়দিনে যে স্থানে পৌছিলাম, সেস্থানে একটা সুবৃহৎ গ্রাম ছিল; সেই গ্রামে বিশ্রামলাভ করিয়া, কেবল মুড়ি, মুড়কি ও চিড়ে ভিন্ন তথায় আর কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া, তাহাতেই তৃপ্তির সহিত উদর পূরণ করিলাম। এই গ্রামের পার্শ্বে একটা খুব প্রাচীন কালীমন্দির আছে। এক সময়ে সেখানে নরবলি

ও নরমেধ যজ্ঞ হইত, এখন আর তাহা হইতে পায় না। গ্রামের ভিতর আর একটা বৃহৎ মন্দির আছে। তাহার প্রাঙ্গণে তৈলের খনি দেখিয়াছিলাম। খনির আকার ঠিক কূপের মত; কূপের তৈল দেখিতে মলিন হইলেও তাহাতে দুর্গন্ধ ছিল না। ভাল ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি,এই তৈলকূপে স্নান করিয়া বহুসহস্র কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। এজন্য নানাস্থান হইতে সেখানে সচরাচর পথিকেরা আগমন করিয়া থাকে। এই গ্রামে দুই দিন মাত্র অবস্থান করিয়া আমরা আবার টিকিট খরিদ করতঃ দেড়দিনে আর একটা গ্রামে পৌছি-লাম। সেখানে আমরা মোটে দশ ঘণ্টার অধিক ছিলাম না। পুনরায় নূতন বলদশকটে আরোহণ করিয়া দেড়দিবসে নাগরকোয়েল নগরে উপস্থিত হই-লাম। ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে নাগরকোয়েল একটা বড় সহর এবং একটী বড় ডিষ্ট্রিক্ট (জেলা)। এখানে মহারাজার নানাবিধ কাছারী এবং স্কুল আছে, তদ্ভিন্ন বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিশ এবং টেলিগ্রাফ ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। নাগর-কোয়েলের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ সুন্দর। এখানে দেখিবার অনেক পদার্থ আছে। এই নগরের সর্ব্বত্র "নাগ" (সর্প) পূজা হইয়া থাকে,বোধ হয়,তজ্জন্য ইহার নাম নাগরকোয়েল। এখানকার সম্মুখস্থ পর্ব্বতও দেখিতে ঠিক নাগের (সর্পের) ন্যায়। এখানে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টান বাস করে। দ্বিতীয়শতাব্দীর সিরিয়ান (Syrian) খ্রীষ্টানের বংশ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানাপেক্ষা রোমান কাথলিকদিগের সংখ্যা প্রায় দশগুণ অধিক। তাহাদের এখানে খুব বড় বড় গির্জ্জা আছে এবং সেই সকল গির্জ্জার মাঠে প্রতি বৎসর বড়দিনের (Xmas Day) পর্ব্বের সময় খুব ধূমধামের সহিত মেলা হয়। যে সকল দেশীয় খ্রীষ্টানের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা কপালে শ্বেতচন্দন বা রক্তচন্দনের ফোটা ও তিলক ব্যবহার করে, গলায় মালা পরে, কেহ কেহ উপবীত রক্ষা করিয়া থাকে এবং "ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান" বলিয়া পরিচয় দেয়। নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টানবৃন্দ নিম্নজাতীয় খ্রীষ্টানের সহিত আহার করে না এবং কন্যাপুত্রের বিবাহ দেয় না। নাগরকোয়েল হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে প্রসিদ্ধ পদ্মনাভপুর গ্রাম। এখানে পদ্মনাভনামে অতি প্রাচীন মূর্ত্তি এবং সুবৃহৎ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদে আছে, "ভোজনে জনার্দ্দন এবং শয়নে পদ্মনাভ," এই মন্দির সেই পদ্মনাভের মন্দির। ত্রিনেবেল্লী হইতে নাগর-কোয়েল পর্য্যন্ত আমরা পথের দুইধারে কেবল মাঠ, বন এবং বড় বড় পর্ব্বত দেখিয়া ছিলাম, মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে দুই একটা গ্রামও ছিল। নাগরকোয়েল

পৌঁছিতে যখন দুই মাইল বাকী ছিল, তখন একটা বৃহৎ গ্রাম দেখিয়াছিলাম, এই গ্রামের পার্শ্বে একটা খুব উচ্চ পর্ব্বতের নিকটে বৃহৎ এবং সুন্দর জলপ্রস্রবন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, পর্ব্বতের গাত্র হইতে চব্বিশ ঘণ্টাকাল অতীব শীতল, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর সলিল নির্গত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের চারিদিকে মহাবন, সেই বনে ভয়ানক ব্যাঘ্র, দ্বিপী, রৌহিষী, শার্দ্দুল, সর্প এবং সিংহ বিচরণ করে; নাগরকোয়েল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ তিনক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

একজন উচ্চপদস্থ দেশীয় রাজপুরুষের সহায়তায় আমি নাগরকোয়েল হইতে (তাঁহারই বলদশকটে) কুমারী অন্তরীপাভিমুখে রওয়ানা হইলাম; পথের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর গ্রাম, মনোহর শস্যক্ষেত্র এবং নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর তরুলতার কুঞ্জাবলী দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কুমারিকা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, অধিবাসীর প্রায় তের আনা ব্রাহ্মণ। অতি সামান্য মাত্র লোক এখানে বাস করে। ভারতমহাসাগরের তটের উপরে এই গ্রাম অবস্থিত। সমুদ্র হইতে গ্রাম, পঞ্চাশ হস্তের অধিক দূরবর্ত্তী নহে, কিন্তু সমুদ্র হইতে গ্রাম অধিকতর উচ্চ বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গে ইহা ডুবিয়া যায় না। কুমারিকার তটে দাঁড়াইয়া ভারতমহাসাগরের অতীব সুন্দর নীলোর্ম্মিমালা দর্শন করিলে মনপ্রাণ বিমোহিত হয়। সমুদ্রের শোভা বর্ণনাতীত; তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে সাধ মিটে না। ভারতমহাসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মহাকবি কালিদাসের "শ্রীবিশালা বিশালা" শ্লোকটি মনে পড়ে। আমি কুমারিকা গ্রাম হইতে ভারতমহাসাগরের যে অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। কুমারিকা গ্রাম, "কুমারী" মূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। প্রবাদ আছে, রঘুকুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন সাগরবন্ধনে হতাশ্বাস হয়েন, তখন এইস্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। যেস্থানে মহামায়া ভগবতী কমললোচন রামকে কুমারীকন্যাবেশে দর্শন দিয়া অভয় দান করিয়াছিলেন, ঠিক্ সেইখানে ভগবতীর কুমারীমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির খুব বড় নহে, কিন্তু ঠিক সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত। সাগরের তটদেশ সমূহ বড় বড় প্রস্তর দিয়া বাঁধান এবং মন্দিরের সম্মুখে অতি সুদৃঢ় এবং সুন্দর ঘাট আছে। সেই ঘাটে বসিলেই মহাসাগরের তরঙ্গরাশি আসিয়া উপবিষ্ট মনুষ্যের দেহকে ধৌত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেকে জলে নামিয়া স্নান করিবার আদৌ

আবশ্যকতা দেখেন না, কিন্তু অবতরণ ও অবগাহন করিয়া সমুদ্রজলে স্নান না করিলে সাগরজলের উপকারিতা অনুভব করা যায় না। প্রবল তরঙ্গের আঘাতে সাগরের তীরে প্রতিমুহূর্ত্তে নানা জাতীয় শঙ্খ, শম্বুক, মৎস্য প্রভৃতি জীব সমূহ আসিয়া পৌঁছে। সমুদ্রের জল খুব লবণাক্ত, পানের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত।

"কুমারী" মূর্ত্তি ঠিক বালিকামূর্ত্তির ন্যায়। মূর্ত্তিখানি সুবর্ণ পরিচ্ছদে আগাগোড়া আবৃত। মূর্ত্তি দেখিতে অতি সুন্দর। এই অপরূপ লাবণ্যময়ী দেবীমূর্ত্তির একহস্তে শাণিত তরবারী এবং অপর হস্তে শঙ্খ। সেই শাণিত তরবারী হস্তে বিস্ফারিত লোচনে "কুমারী" দেবী সুবিশাল ভারতমহাসাগরের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয়, ভারতের উত্তরদিকে কৈলাসাচলে মহাদেব যেমন নন্দী ভৃন্দী লইয়া ভারতের একদিকের সীমা-রক্ষা করিতেছেন, আর একদিকে (দক্ষিণে) যেন মা ভগবতী কুমারী কন্যা বেশে খড়্গহস্তে, হীনতেজ ভারতকে প্রহরিণীরূপে রক্ষা করিয়া "মাতা" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন; আমি পৃথিবীর আর কোনও স্থলে, মহাসাগরের এত সুন্দর শোভা আমার জীবনে দেখি নাই।

কুমারিকায় তিন দিবস অবস্থান করিয়া আমরা নাগরকোয়েলে ফিরিয়া আসিলাম। নাগরকোয়েল হইতে অন্যত্র যাইবার সময় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার টাকা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য, এদেশে পয়সা চলে না, এদেশের সমুদয় মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত। এক টাকায় "চক্রম" নামে প্রায় একশত অতি ক্ষুদ্র রৌপ্য খণ্ড পাওয়া যায়, তাহাই পয়সারূপে এদেশে চলিয়া থাকে; টাকা ও আধুলির একদিকে শঙ্খ মূর্ত্তি এবং অপরদিকে নারিকেল গাছের আকৃতি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্ব্বত্র তাল, নারিকেল, সুপারি এবং আমগাছ সুপ্রচুর। এখানকার ভাষার নাম "মালয়ালী" কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত লোক সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। কুমারী অন্তরীপে স্কুল বা ডাকঘর নাই। সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই ইংরাজী জানে না।

জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ।

নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে যে সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার পথ

অপ্রশস্ত ছিল—যখন দিগ্বিজয়ী বৃটিশ বীরকেশরীর বিশিষ্ট বিক্রম পরিদর্শন করিয়াও এদেশে প্রজা-সাধারণের চিত্ত ইংরাজি ভাষার দিকে সম্যকরূপে আকৃষ্ট হয় নাই—বঙ্গভূমির সেই দূরবর্ত্তী অন্ধকার সময়ে এমন এক একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, এমন এক একজন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী পুরুষ-ধুরন্ধর জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যে, অধুনাতন কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যের সুস্পষ্ট আলোকে তেমন একজন লোককেও আর জন্মগ্রহণ করিতে দেখি না। যখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস, ইলেক্‌ট্রিক কারখানা প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল না; যখন সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, বক্তৃতা, কংগ্রেস, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির সহিত বঙ্গদেশবাসী অত্যুচ্চ শ্রেণীর ভাগ্যবান্ পুরুষদিগেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না; তখন যে সকল অসামান্য ব্যক্তির অমিত অধ্যাবসায়, অপ্রতিহত যত্ন, দেবোপম সাধুতা, পরমহংসোচিত সরলতা, জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ, অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈ-ষিতাগুণে হতভাগ্য বঙ্গের কালোমুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল—যাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালীজাতি সমগ্র ভারতে এবং সুদূর ইউ-রোপে প্রখ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—প্রস্তাবশীর্ষোক্ত জাঁজরেল কাশী-প্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। এই মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানের পরে আমরা ইঁহার সমতুল্য অতি অল্প লোককেই দেখিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজশ্রী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অনরেবল রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, স্বদেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র, অনরেবল প্যারীচাঁদ, রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন, বিচারপতি দ্বারকানাথ, অথবা জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ প্রভৃতি বঙ্গের পুণ্যচেতা পুরুষপুঙ্গবগণ আর নাই; তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া স্বর্গের অক্ষয়ানন্দ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের শূন্যস্থান পরিপূরণ করিতে আর কাহাকেও দেখিলাম না। যেমনটি যায় তেমনটি আর আসে না; আসে না বলিয়াই এত কাতরতা; সেই জন্যই গতাসুবর্গের জীবনচরিত্রের আদর ও মূল্য অত্যন্ত অধিক, সেই জন্যই মহাপুরুষদিগের পবিত্র জীবনচরিত লিখিয়া লেখনীকে সার্থক করিতে ইচ্ছা হয়। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ গৃহযোগী বলেন,—"A great man is the product of a great age," অর্থাৎ যোগ্য সময়েই মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালায় যে সময়ে কাশী-প্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে কাশীপ্রসাদের মত লোকের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ—"A great man is not born without a

great mission," অর্থাৎ মহৎ লোকেরা মহৎ উদ্দেশ্য ভিন্ন—মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন—ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন না। জাঁজ্রেল কাশীপ্রসাদ যেমন আদর্শ সংসারী পুরুষ ছিলেন, তেমনি আদর্শ সাধক ও আধ্যাত্মিক বাঙ্গালী ছিলেন—মনুষ্যত্ব Humanity এবং দেবত্ব Divinity তাঁহাতে একাধারে সম্মিলিত হইয়াছিল। আমরা এই পবিত্র জীবন-চরিতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

আনুমানিক সার্দ্ধেক শত বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ১১৬০ সালে, পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মানদী তটে, ঢাকা নগরীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের একটি প্রশস্ত লবণ-কারখানা Salt-factory ছিল। প্রজাসাধারণ ইহাকে "নীমকের কুঠি" বলিয়া সম্বোধন করিত। মুন্সী তুলসীরাম ঘোষ নামে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কুলীন কায়স্থ এই কুঠীরে দেওয়ান ছিলেন। ১২০৫ সালে কোম্পানী কর্ত্তৃক ঢাকার কুঠির কার্য্য বন্ধ হইবার আদেশ হওয়ায়, তুলসীরাম কলিকাতায় আগমন করিয়া খিদিরপুর গ্রামে তাঁহার শ্বশুর রামনারায়ণ সর্ব্বাধি-কারী (বসু) মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হয়েন এবং সেই বৎসর হইতেই ঢাকা-নগরীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। তুলসীরামের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের নাম শিবপ্রসাদ, ইহারই কুলপাবন পুত্রের নাম বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার দিবসে, জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ খিদির-পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ঐ দিবসে কলিকাতায় ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বঙ্গদেশে বি-এ, এম-এ পরীক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না। সে সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষ মধ্যে একটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একমাত্র সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন নিশির শোভা শশী এবং শশীর শোভা তারা, সেই প্রাচীন সময়ে তেমনি গৌড়ের শোভা কলিকাতা এবং কলি-কাতার শোভা হিন্দুকলেজ ছিল। মাতামহ রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী, প্রিয়তম দৌহিত্র কাশীপ্রসাদকে গৃহমধ্যে কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা, পারস্য ও ইংরাজি শিক্ষা দিয়া, হিন্দুকলেজে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। অসাধারণ মেধাবী কাশীপ্রসাদ অষ্ট বর্ষ কাল ব্যাপিয়া হিন্দুকলেজে বিদ্যা শিক্ষা করতঃ একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কলেজ জীবনের কথ-ঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি প্রতি বৎসর

বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন; অষ্ট বর্ষ কাল মধ্যে ৫টী রৌপ্যপদক, তিনটি সুবর্ণপদক, তিন শত পঞ্চাশ খানি পুস্তক এবং নগদ ছয় শত টাকা পুরস্কার হস্তগত করিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য এচ্ এচ্ উইলসন, অধ্যাপক হেনীংটন, চিফজষ্টিশ ক্বেবার, লর্ড বিশপ আর্কডে, মিষ্টর ডেবিড্ হেয়ার প্রভৃতি, তরুণবয়স্ক কাশীপ্রসাদের আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, স্মরণ শক্তি, ইংরাজি ভাষায় অধিকার, চরিত্র এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি "The Young Poet's First Attempt" এবং "A short Review of James Mill's History of British India" নামক দুইটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। জেম্‌স্ মিল, ভুবন-বিখ্যাত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা ছিলেন; ইনি তাঁহার ইংরাজি ভারতেতিহাসে অকারণে ভারতবাসীদিগকে অতীব অন্যায়রূপে গালি প্রয়োগ করিয়াছেন। অজাতশ্মশ্রু কাশীপ্রসাদ, এই সুবিখ্যাত ইউরোপীয় লেখক-ধুরন্ধরের যুক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিয়া, লেখককে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন। কাশীপ্রসাদের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা Asiatic Journalএ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে খ্রীষ্টীয় ১৮২৮ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইহা আদ্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বালক কাশীপ্রসাদের পক্ষে ইহা কম সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

কাশীপ্রসাদ একদিন কলেজ হইতে মাতামহের বাটীতে আসিয়া নির্জ্জনে কি চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার মাতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাশী, তুমি কলেজে যাইতেছ, সাহেব মাষ্টারেরা তোমাকে ভালবাসে ত?" বালক কাশীপ্রসাদ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া উত্তর দিল,—"মাষ্টারেরা এখনও আমাকে ভালবাসিতে শিখে নাই। কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা আমি সত্বরে তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।" প্রবৃদ্ধা মাতামহী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি বালক, তুমি কেমন করিয়া সেই প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধদিগকে শিক্ষা দিবে?" বালক কিছুই উত্তর দিলনা; কিছুকাল পরে মেধাবী কাশীপ্রসাদ যখন কলেজের সমুদয় বালককে পরাস্ত করিয়া উঠিল, যখন সাহেব মাষ্টারেরা বুঝিতে পারিলেন, কাশীপ্রসাদ একজন সামান্য বালক নহে, তখন একদিন কাশীপ্রসাদের সুকোমল শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"কাশী! আমরা তোমার শিক্ষক (গুরু), তুমি আমাদের ছাত্র (শিষ্য), অদ্য হইতে তোমার সহিত আমাদের গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ঘনীভূত হইল। আমরা

ভালবাসি না বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ, কিন্তু আজিকার দিবস হইতে তদ্রূপ আক্ষেপের আর কোনও কারণ রহিল না।" কাশী কহিলেন,—"গুরু শিষ্যের সম্পর্ক খুব গুরুতর হইলেও তাহা উচ্চ অঙ্গের স্নেহের পরিচায়ক নহে; উচ্চ অঙ্গের স্নেহের পরিচায়ক হইলেও তাহা প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক নহে। স্নেহ হইতে প্রেম অনেক প্রভেদ।" সাহেব মাষ্টারেরা এই গুরুতর দার্শনিক (Philosophical) কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নীরবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে, এক দিবস মধ্যাহ্নে কাশীপ্রসাদ কলেজে যাইতেছেন। পথিমধ্যে শুনিলেন,—"অদ্য কলেজ বন্ধ! প্রিন্সিপাল সাহেব ভয়ানক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায়বৎ শয্যাশায়ী হইয়া আছেন, দুই চারি জন ইউরোপীয় অধ্যাপক তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে গিয়া কলেরা রোগে ধরাশায়ী হইয়াছেন।" অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রিন্সিপালের বাসা বাটীতে কাশীপ্রসাদ গমন করিলেন। তথায় সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের নিষ্ঠীবন, পুরীষ, ন্যক্কার, মূত্রাদি প্রভৃতি স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। রজনী প্রভাত হইলে,প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকেরা রোগমুক্ত হইয়া যখন জানিতে পারিলেন, ছাত্র কাশীপ্রসাদের অনবরত চেষ্টায় এবং সেবা ও সুশ্রূষায় তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে, তাঁহারা কাশীর মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত কহিলেন,—"কাশী! অদ্য হইতে আমাদের সহিত তোমার পিতাপুত্রের সম্পর্ক আরম্ভ হইল। ধরাধামে আমরা যত দিবস জীবিত থাকিব, তত দিবস পর্য্যন্ত তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতে থাকিব এবং তোমার কল্যাণার্থ সমস্ত প্রাণের সহিত যত্ন করিব।" কাশীপ্রসাদ এই বলিয়া উত্তর দিলেন,—"মহাশয়গণ! পিতা-পুত্রের সম্পর্ক খুব পবিত্র, কিন্তু এরূপ পবিত্র সম্পর্কেও যথার্থ প্রেম ঘনীভূত হয় না।" কাশীর কথায় তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; কিন্তু সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কলেজ পরিত্যাগের সময়, কাশীপ্রসাদ যখন তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সাহেবেরা বলিয়াছিলেন,—"কাশী বাবু! এখন তুমি আমাদের আর ছাত্র নহ, এখন তুমি আমাদের সখা, আমাদের পারস্পরিক বন্ধুতা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।" মৃদু-মধুর হাসিয়া কাশীপ্রসাদ কহিলেন, —"প্রভো! বুঝিলাম, এতদিনে আমাদের প্রেম প্রকৃতরূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সখাভাবই প্রকৃত প্রেমের ভাব; মনুষ্যের পারস্পরিক সখ্যতা

পরিণামে ঐশ্বরিক সখ্যতার কারণ হইয়া উঠে।" কথা শুনিয়া অধ্যাপকদিগকে প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন,—"কাশীপ্রসাদের এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।" সুপ্রসিদ্ধ ডেবিড হেয়ার বলিয়াছিলেন,—

"The spiritual sermon which Babu Kashi Pershad preached on that day appealed to my heart. I do not remember to have heard any such thrillingly eloquent and soul-stirring sermon from any Hindoo, not even from any Christian preacher of Calcutta." পাঠক মহাশয়! কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-বংশে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই সখ্যভাব তাঁহার মেদ ও মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছিল। জগতে সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিল।

বৈষ্ণবের দয়াভাব কাশীপ্রসাদের বাল্য জীবনেই প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। সমপাঠীদিগের অভাবমোচনে, দুঃখীর দুঃখমোচনে, পথের বিবস্ত্র কাঙ্গালীদিগকে বস্ত্রদানে, পীড়িত প্রতিবাসীদিগের সেবায় এবং ভগবানের অর্চ্চনায় তাঁহার বাল্যজীবন অতি পবিত্র ও মধুরভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি মিথ্যার কখনও প্রশ্রয় দেন নাই এবং অকারণে কাহারও শরীরে বা মনে কষ্ট দিয়া ভগবানের নিকটে অপরাধী হয়েন নাই। এরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বালক সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যায় না, এরূপ নিরপরাধী কলেজছাত্র আজিকালিকার দিনে প্রায়ই মিলে না।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কাশীপ্রসাদ বহুসংখ্যক ইংরাজি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "The Minstrel"; "The Shair," "The Hindu Festivals,""The Poems,""The Motherland,"India, the Ancient land of glory" প্রভৃতি কাব্য শিক্ষিত সমাজে খুব প্রসিদ্ধ। সে সময়কার Calcutta Literary Gazette, Mookherjee's Magazine প্রভৃতি ইংরাজি পত্রের ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। "Memoirs of Indian Dynasties" নামক তাঁহার ইংরাজি গদ্য-পুস্তক এখনও ইংরাজি সাহিত্যের অন্যতম অলঙ্কার বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইতেছে। "The Hindu Intelligencer" নাম দিয়া তিনি একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বিলাত, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বড় বড় লেখকেরা এই ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে শত শত প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসারথী কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডশন সাহেব কাশীপ্রসাদের কবিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Let some of those narrow-minded persons, who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt, read Baboo Kashi Pershad's poems with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own.' "Selections from the poets" Nov. I., 1834.

আচার্য্য অর্ম্মও ইলিয়ট সাহেব কশীপ্রসাদের ইংরাজি-ভাষায় অধিকার-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Views from India and China."

"In English, in which Baboo Kashi Pershad expressed himself with so much strength,grace and facility, as fastly to be encountered in composing poetry in a foreign language. His works established the reputation of his in India and favourably noted in England."

কাশীপ্রসাদ কেবল ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বহুসংখ্যক বাঙ্গালা কবিতা ও বাঙ্গালা গীতের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ খানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই। তিনি ইংরাজি ভাষায় "Bengalee works and writers" নামক পুস্তক লিখিয়া, নিধিবাবু, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। কাশীপ্রসাদের স্বরচিত দুইটী বাঙ্গালা গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

১। তুমি জ্ঞান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে শাস্ত্র অদর্শন।
উৎপত্তি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়,
কভু খণ্ডিবার নয় যতেক করি যতন।

২। শ্বেত শতদলোপরে, শ্বেতাম্বর কলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেতবরণী।

বেদ বেদাঙ্গ তন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্র,
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা, মধুলোভে মধুলোভা,
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভ বরদা, অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা,
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমাতা নারায়ণী।

কাশীপ্রসাদের মাতামহকুল পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পিতামহকুল পরম শাক্ত ছিলেন। তিনি উভয়কুল হইতেই বৈষ্ণব ও শাক্তের উপাসনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাশীবাবু অতি উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন।

কাশীপ্রসাদ অতীব দয়ার্দ্রচিত্ত এবং বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। অসত্য এবং অন্যায়কে তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি যে বিষয়কে সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতেন না। Fiat Justitia ruet caelum অর্থাৎ Let Justice reign though Heaven should fall এই তাঁহার নীতি ছিল; স্বর্গের রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেলেও তিনি ন্যায়ের রাজ্যকে উপেক্ষা করিতেন না। যাহাকে তিনি সত্য বলিয়া স্থির করিয়া লইতেন, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার প্রচুর জিদের উৎপত্তি হইত; যাহাতে হাত দিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" এই তাঁহার মন্ত্র ছিল। এই জন্য কলিকাতা অঞ্চলে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ "জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ" নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন একটা নীচজাতীয় অথচ প্রভূত বলশালী পালোয়ানের মত বাঙ্গালী যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যোড় হাতে বলিয়াছিল,—"হুজুর! আমি অমুক সাহেবের কুঠিতে চাকুরী করিতাম, সাহেব আমাকে তিনি মাস বেতন দেয় নাই, বেতন চাহিলেই আমাকে মারিতে আইসে। এক দিন আমার স্ত্রী বেতন চাহিতে গিয়াছিল, সাহেব আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। সাহেবকে আমি, ভাল মানুষের মত ব্যবহার কর, একথা বলায় সাহেব অদ্য আমাকে বেত ও জুতা দ্বারা প্রহার করিয়াছে। হুজুর আমাকে রক্ষা করুন, হুজুর আমাকে অভয় দিউন।" কাশী বাবু তাহার কথা শুনিয়া এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে,—"ওরে মূর্খ! ওরে নির্ব্বোধ! তোকে দেখলে যেন ঠিক ভীমাবতার বোলে বোধ হয়, এই যৌবন বয়সে—এই বিপুল বপু বহন করিতে করিতে তুই অকারণে একটা ফিরিঙ্গির হাতে,

বেত ও জুতার দ্বারা প্রহারিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিস্ না? যদি তুই সেই দুষ্ট ফিরিঙ্গিটাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া বীরের ন্যায় বুক ফুলাইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিতিস্ 'হজুর! আমি ফিরিঙ্গিটাকে মারিয়া আসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন,' তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোর সহায়তা করতাম, কিন্তু তোর মত নির্লজ্জ ও কাপুরুষকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেওয়া আমার নীতি নহে।" কথা শুনিয়া লোকটা আশ্চর্য্য হইয়া চলিয়া গেল।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে কাশীপ্রসাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সে সময়ে এদেশে যতগুলি ভাল কার্য্য হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদয়ের সহিত কাশী বাবু সম্মিলিত ছিলেন। কলিকাতার শ্যামবাজারে কাশীপ্রসাদ আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ বংশ কাশীপ্রসাদেরই বংশ। কাশী বাবু অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া, ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া গিয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনর এবং জষ্টিশ অব্ দি পিশ্ ছিলেন। বহু শত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বিধবার দুঃখ মোচন করিয়া, সহস্র সহস্র কাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের অভাব অপনোদন করিয়া, নানা বিদ্যা ও নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে, অতি পবিত্রভাবে মহাত্মা কাশীপ্রসাদ বাঙ্গালা ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতা নগরীতে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

নবাব সার সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ বাহাদুর কে, সি, এস, আই।

প্রাচীন ও পবিত্র পঞ্চনদ কর্ত্তৃক বিধৌত সুপ্রসিদ্ধ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃর্গত রাওলপিণ্ডি জেলার অধিভুক্ত ওয়া গ্রাম অতীব মনোহর স্থান। গ্রামটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রাকৃতিক শোভায় অতীব সুন্দর। কুলু কুলু বাহিনী নির্ঝরিণীর সুশীতল, সুন্দর, স্বচ্ছ, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর সলিল, চতুর্দ্দিকস্থ গিরি-মালার সর্ব্বরোগহর সমীরণ, অনায়াস-সম্ভূত বিবিধ প্রসূন পুঞ্জ, খাদ্যের সুলভতা

এবং বিশেষতঃ দ্রাক্ষা, আক্‌রোট প্রভৃতি প্রচুর ও সুলভ ফলাদিতে ওয়া গ্রাম অতীব চিত্তভৃপ্তিকর বলিয়া গণ্য। এখানে দুই এক ঘর পঞ্জাবী হিন্দু ও দুই এক ঘর শিখ ভিন্ন সমস্ত অধিবাসীই পাঠান মুসলমান। প্রবাদ আছে, সম্রাট আওরঙ্গজেব একদা এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ সোলেমান অদ্রিমালার সৌন্দর্য্য,ঝরণার নির্ম্মল সলিল, ফল ফুলের শোভা, স্ত্রীলোকদিগের মোহিনী মূর্ত্তি এবং উৎকৃষ্ট জল বায়ু দেখিয়া বলিয়াছিলেন "বাঃ! বাঃ! ইয়ে কশ্‌বা বাঃ হায়!" তদবধি এই গ্রাম বাঃ (wah) অর্থাৎ "ওয়া" নামে প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। আমি অনেক দিবস এই গ্রামে ছিলাম; পঞ্জাব রেলওয়ের হোশেন আব্‌দাল ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মধ্যে পদব্রজে এই মহা সুন্দর গ্রামে দর্শকেরা পৌছিতে পারেন। এই গ্রামের পরেই কোহাট ও পেশোয়ারের সীমা। যাহা হউক, এই গ্রামের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সর্দ্দার বংশে হেয়াৎ খাঁর জন্ম হয়। ইহার পিতামহ ও পিতা মহাশয় সৈনিক বিভাগে উচ্চ বেতনে কার্য্য করিতেন, তদ্ভিন্ন ইহাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় মৌলবীর নিকটে উর্দ্দু এবং (পঞ্জাবের মাতৃ ভাষা) গুরুমুখী শিক্ষা করেন। তদন্তর কয়েক বৎসর বাটীর কোনও আত্মীয়ের নিকট পশতু ভাষা শিক্ষা করিয়া রাওলপিণ্ডি নগরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে গমন করেন। তখন এণ্ট্রান্স বা এল, এ পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে যুবা হেয়াৎ খাঁ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বহু সংখ্যক শিক্ষিত পুরুষকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারস্য ও আরব্য শিক্ষা করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পারস্য ব্যাকরণ ও কাব্যে তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। তিনি অতি সুন্দর পারস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং দেওয়ান হাফেজ, মওলানা রুমী, সেকেন্দর নামা প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতে অতি সুন্দররূপে পারস্য কবিতা আবৃত্তি করিয়া অনেককে মোহিত করিতেন। কাশ্মীরে এবং তাঁহার জন্মভূমিতে আমি অনেক দিবস তাঁহার সহিত একত্রে যাপন করিয়াছি,তাঁহার মত কাব্যরস-প্রিয় সুরসিক মুসলমান বোধ হয় আর দ্বিতীয় দেখি নাই। ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া তিনি রাওলপিণ্ডি নগরে কোনও কার্য্যালয়ে কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এত বড় বিদ্বান এবং স্বাধীনতা-প্রিয় বীরপুরুষ কি কখনও সামান্য কেরাণীগিরির গোলামন্থে (Drudgery) পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট থাকিতে পারে? বিশেষতঃ তিনি সাধুচেতা লোক ছিলেন। সত্বরেই

এই হীন চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; মালিকেরা জিজ্ঞাসা করিল "চাকুরী ছাড়িলে কেন ?" স্বাধীনচেতা হেয়াৎ খাঁ বীরের স্থায় বুক ফুলাইয়া বলিল "For conscientious scruples," প্রশ্নকারীরা অবাক হইয়া দেব-ভাব-সম্পন্ন পাঠান যুবকের সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

চাকুরী ছাড়িয়া অল্পদিন মাত্র হেয়াৎকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যেই তিনি সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে অত্যন্ত যোগ্যতা দেখাইয়া তিনি তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হয়েন। তদন্তর এক্সট্রা আসিস্‌টাণ্ট কমিশনর পদে উন্নীত হইয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্ট-রের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক বৎসর এই পদে অসাধারণ দক্ষতা সহকারে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ডেপুটী কমিশনর পদে উন্নীত হয়েন ; হেয়াতের পূর্ব্বে পঞ্জাব প্রদেশে আর কোনও দেশীয় পুরুষের ভাগ্যে এই মহা-সম্মানিত পদ লাভ হয় নাই। মুলতান নগরে ডেপুটী কমিশনারের কার্য্য করিতে করিতে কয়েকটি মোকদ্দমায় হেয়াৎ খাঁ অপূর্ব্ব যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করেন। কলিকাতার ষ্টেটশম্যান পত্রে ঐ সকল মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ডেপুটী কমি-শনরী করিয়া তিনি জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই পদেও তাঁহার পূর্ব্বকার যোগ্যতা ও যশঃ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে কাশ্মীরমহারাজার বিস্তৃত রাজ্যে সুবন্দোবস্তের শিথিলতা হওয়ায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁকে কাশ্মীরের হোম্ মেম্বর করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। এই পদে হেয়াৎ খাঁ মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতন পাইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিন বৎসরের পরে কাশ্মীরাধিপতির সহিত সর্দ্দার বাহাদুরের মনোমালিন্য ঘটে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে পদত্যাগ করিয়া কাশ্মীর হইতে চলিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে তিনি পেন্সন গ্রহণ করেন। পেন্সন গ্রহণ করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই ; মহামান্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁকে অনারেরী জজের ক্ষমতা প্রদান করেন। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া সর্দ্দার বাহাদুর ডিবিজ্‌নাল ও সেসন জজের কার্য্য করিতেন। পঞ্জাবে সম্প্রতি এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু হেয়াৎ খাঁই এই গৌরব সর্ব্বপ্রথম লাভ করেন। প্রায় ছয় বৎসর হইল, হেয়াৎ খাঁ জ্বর ও বিস্ফোটক রোগে স্ব গ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃ পুরুষদিগের সমাধিস্তম্ভসমূহ ওয়া গ্রামে বর্ত্তমান আছে, ঐ সমাধিক্ষেত্রে হেয়াৎ মৃত্তিকাবৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোহর সমাধি দেখিবার যোগ্য।

মৃত্যুর প্রায় সার্দ্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সর্দ্দার গোলাম মহম্মদ সাহেবের মৃত্যু হওয়ার এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে সর্দ্দার গোলাপ খাঁ নামে আর এক সহোদরের মৃত্যু হওয়ায়, হেয়াতের শরীর স্বাস্থ্যশূন্য এবং চিত্ত অবসন্ন উঠিয়াছিল। মৃত্যু সময়ে হেয়াতের প্রায় ৬২ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। মৃত্যুর সময়ে মুখে "রসুল""রসুল" উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর হেয়াৎকে অনেক সময়ে অনেক প্রকারে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি শেষে "নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সার সর্দ্ধার হেয়াৎ খাঁ বাহাদুর কে, সি, এস, আই নামে খ্যাত হইয়াছেন! মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি নবাব উপাধিতেও বিভূষিত হইয়াছিলেন। হেয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে একৃস্‌ট্রা আসিস্‌টাণ্ট কমিশনর; জামাতা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ভ্রাতুস্পুত্র কাশ্মীরের অন্যতম দেওয়ানী শাসনকর্ত্তা এবং পরমাসুন্দরী কন্যা নানা ভাষায় পণ্ডিতা।

আলিগড়ের নবাব সৈয়দ আমেদ, নবাব হেয়াৎ খাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। উভয়ে মিলিয়া মুসলমান জাতির মধ্যে সুশিক্ষা প্রচারের প্রায়ই পরামর্শ করিতেন। মহম্মদীয় সুশিক্ষার জন্য নবাব হেয়াৎ খাঁ পঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, ঢাকায় এবং কলিকাতায় মহা প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন। মহম্মদীয় এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মস্পৃহা খুব বলবতী ছিল। এবং ইসলামীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দাতব্যতার জন্য নবাব হেয়াৎ খুব বিখ্যাত ছিলেন। রীতিমত নমাজ পড়া তাঁহার নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। তাঁহার গ্রামে কোনও মুসলমান নমাজ না পড়িলে, হেয়াৎ খাঁর আদেশে, ঐ মুসলমানের আট আনা জরিমানা হইত। তিনি ইংরাজি, পারস্য, আরব্য, হিন্দি, উর্দ্দু, পশ্‌তু এবং গুরুমুখী ভাষায় পরাদর্শী ছিলেন। তিনি কোনও প্রকার নেশার দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না এবং এত বড়লোক হইয়াও নিরহঙ্কারী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও যুবার উৎসাহ তাহাতে বর্ত্তমান ছিল। রুগ্ন অবস্থাতেও তাঁহার সুরসিকতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমি যখনই তাঁহার নিকটে বসিয়াছি, তখনই হাসিতে হাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

অধ্যবসায় ও সুচরিত্রতার, নবাব হেয়াৎ খাঁ, অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিনি কখনই কোনও কারণে নিজের চরিত্রকে দুষিত হইতে দেন নাই। অধ্যবসায় থাকায় বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বালক বিদ্যার্থীর ন্যায় ল্যাম্পের সম্মুখে পুস্তক রাখিয়া

পাঠ করিতেন, কখনও কখনও সমস্ত রাত্রি লেখাপড়া করিয়াও পরিশ্রান্ত হই-তেন না। নবাব সার সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ বাহাদুর কেবল পঞ্জাবের পাঠান মুসলমানদিগের গৌরবের দৃষ্টান্ত নহেন, তিনি সমগ্র মুসলমান জাতির মহা-গৌরব ও মহা অলঙ্কার। তিনি পঞ্জাবী মুসলমান হইয়াও আমাকে (বাঙ্গালী হিন্দুকে) অকৃত্রিম বন্ধুতাসূত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার কথা মনে পড়ে, তখনই চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিনা।

নবাব হেয়াৎ খাঁর জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই উল্লেখ করিয়া একদিন তিনি বলিয়াছিলেন "এই নশ্বর সংসারে ভগবানের উপাসনা এবং তাঁহার নামকীর্ত্তন করা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক কর্ম্ম আর নাই, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু তাহাই পরিণামে অসার।" এত বড় ধনী, এত বড় মানী, এত বড় ঘোরতর সংসারী হইয়াও নবাব হেয়াৎ বাহাদুর এক দিনের জন্যও ভগবানকে ভুলিয়া যান নাই। তিনি সমস্ত জীবন মুসলমান জাতির উন্নতি-কল্পে, পঞ্জাবের হিতসাধনে এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সেবায় অতি গৌরবে ও পবিত্র ভাবে যাপন করিয়াছেন। হিন্দু জাতি নানা কারণে নবাব হেয়াতের নিকটে ঋণী। তিনি কখনও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না; আমাকে কতবার বলিয়াছেন, এদেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মূর্খ, মূর্খ না হইলে ঘরে ঘরে মারামারি করিয়া মরিতেছে কেন? নবাব হেয়াৎ আর নাই, কিন্তু তাঁহার সুনাম এবং সুকীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান।

দেওজী শর্ম্মা।

যেমন গ্রামের শোভা সরোবর এবং সরোবরের শোভা সরোজ, তেমনি সৃষ্টির শোভা মানব এবং মানবজাতির শোভা "মহাপুরুষ।" ধার্ম্মিকেরা সংসারের অলঙ্কার স্বরূপ। এখনও জগতে ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিক আছেন বলিয়া, পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে—সেই জন্য এখনও দিন রাত্রি হয়, এখনও কালোকে কালো এবং সাদাকে সাদা বলিয়া চিনিতে পারা যায়। গৃহযোগী, উদাসীযোগী, কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী প্রভৃতি শ্রেণীর মহানুভবগণ—বিশেষতঃ যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, পরমহংস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক "মহাপুরুষেরা" ইহ-সংসার-ক্ষেত্রকে এখনও পবিত্র করিয়া থাকেন বলিয়া—বসুমতী এখনও ধ্বংস-বারিধির

অতল-গর্ভে নিমগ্না হয় নাই। বাস্তবিক মহাপুরুষেরা জগতের রক্ষক, জগতের পরিচালক এবং জগতের উপদেশক। এই জন্যই হিন্দুমতে শুনিতে পাওয়া যায়, "জগৎ-গুরু ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-গুরু সন্ন্যাসী।" এই জন্যই কোরাণে ও বাই-বেলে সাধু সন্ন্যাসীর এত আদর ও মান। প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার নামোল্লেখ করিয়াছি, ইনি একজন প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম এবং ইঁহার সহিত আলাপ পরিচয় ও কথোপকথন করিয়া অতীব কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি পঞ্জাব হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলান্তর্গত বুলন্দসহর নামক নগরে যাইতেছিলাম। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের চোলা (Chola) ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া অনেক মাইল পথ পদব্রজে অথবা অশ্বশকটে গমন করিলে বুলন্দসহরে পৌছিতে পারা যায়। আমি বলদশকটে যাইতেছিলাম, যাইতে যাইতে দেখিলাম, একটা লোক, চোলা ষ্টেসন হইতে বুলন্দসহর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের যে তার বিস্তৃত হইয়াছে, অতি উর্দ্ধে সেই তারকে দুই হস্তদ্বারা জোরে ধারণ করিয়া, ঝুলিতে ঝুলিতে অবলীলাক্রমে অতীব দ্রুতগতিতে বুলন্দসহরের দিকে গমন করিতেছে। শকটবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মহাশয়! আপনি বাবা দেবজী শর্ম্মার নাম শুনিয়াছেন কি? ইনিই সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতার এবং অদ্ভুত প্রকৃতির অসাধারণ সন্ন্যাসী—উঁহারই নাম দেওজী শর্ম্মা।" আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু শর্ম্মাজী এমন দ্রুতগতিতে—তীরের ন্যায়—অবলীলাক্রমে, তার ধরিয়া যাইতেছিলেন যে আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতেও পাইলাম না। তিনি দেখিতে দেখিতে এত দূর গিয়া পৌছিলেন যে, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। আমি বুলন্দসহর নগরে গিয়া, তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়া এক পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট এক বৃক্ষতলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বুলন্দসহরে তিনি অনেক দিন ছিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ক্ষয়কাশ (Consumption) রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, বহুল অর্থ ব্যয়ে বহু প্রকার চিকিৎসাদ্বারাও তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, চিকিৎসকেরা এই উৎকট রোগকে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া নিরাশ-হৃদয়ে চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগীর শয্যা হইতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, দেহে অস্থি ও চর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। অনেক অনুনয় ও অনুরোধের পরে বাবা দেওজী শর্ম্মার তিনি অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। বাবা তাঁহার মস্তকে হাত

রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"শীঘ্র এই পুকুরের জলে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও এবং সেখানে গিয়া তোমার গর্ভধারিণী জননীর পদধৌত করিয়া, ঐ পদধৌত জল পেট ভরিয়া পান কর। এইরূপে সপ্তদশ দিবস মাতার চরণ ধৌত জল পান করিলে তুমি নির্ব্যাধি হইয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য,রোগীর আত্মীয়েরা রোগীকে পাল্কীতে শোয়াইয়া পুকুরের ঘাটে বৃক্ষতলে সাধুর নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক, রোগীর সহিত রোগীর মাতার সপ্তদশ বৎসর হইতে বিবাদ ছিল। এবং সেই বিবাদ জন্য ১৭ বৎসর কাল ব্যাপিয়া মাতা ও পুত্রে কথোপকথন বন্ধ ছিল। সপ্তদশ দিন অল্প অল্পরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া অষ্টাদশ দিবসে রোগী বাস্তবিকই রোগশূন্য হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই, মাতা ও পুত্রে আর বিবাদ রহিল না,—তাহাদের অসুখের ও অশান্তির সংসার আবার সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইল। আর এক ব্যক্তির বহুবর্ষকাল স্থায়ী অর্শ রোগ ছিল, তাহাকেও এই আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ অতি অলৌকিক ক্রিয়ায় আরোগ্য করিয়াছিলেন। বুলন্দসহরের অনেক লোক ইতিপূর্ব্বেই দেওজী শর্ম্মার নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখেন নাই। তিনি যে দিন নগরে পদার্পণ করেন,সেই দিন হইতে তাঁহার অবস্থানের শেষ দিন পর্য্যন্ত একজন বাঙ্গালী যুবা প্রাণপণে এবং যথার্থ ভক্তি ও প্রেমের সহিত এই মহাপুরুষের সেবা করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী যুবা অতি দরিদ্রের সন্তান, চাকুরীর চেষ্টায় অতি কষ্টে পথ হাঁটিয়া চব্বিশ পরগণা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া পৌছিয়াছিল। তাহার টাকা কড়ি ছিল না, আত্মীয় বা সহায় কেহ ছিল না এবং বিদ্যা বুদ্ধিও অতি সামান্য ছিল, তদ্ভিন্ন বহুকালের একটা ব্যাধিও ছিল। এই সৌভাগ্যবান্ যুবা অবশেষে এই মহা মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইল। দেওজী শর্ম্মা তাহাকে কি দিয়াছিলেন বা তাহার সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন, জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, ঐ যুবা ঐ মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টিতে রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া সুন্দর দেহ ও সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে, না পড়িয়াও অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে, ধনে মানে যশে বুদ্ধিতে দিগ্বিজয়ী লোক হইয়া উঠিয়াছে, সংসারে অতীব সুখী পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে ও চরিত্রে মহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই যুবা এখনও জীবিত, কিন্তু এখন আর যুবা নহে, এখন তাহার প্রবীণাবস্থা। ঐ মহাপুরুষের এমনই কৃপা, এই সৌভাগ্যবান্ বাঙ্গালী যখনই যে কাজে হাত দিয়াছে; তখনই সেই কাজে অল্পকাল মধ্যে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছে। যে কাজ লোকে

দশদিনেও শেষ করিতে পারে কি না, সন্দেহ,—মহাপুরুষের কৃপায়,—এই সৌভাগ্যবান্ বাঙ্গালী-শিষ্য তাহা দশ মিনিটে শেষ করিয়া থাকেন।

মহানুভব দেও শর্ম্মাজী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল। আহার বিষয়ে তাঁহার কোনও বিশেষ প্রবৃত্তি বা সখ্ ছিল না, যে যাহা দিত, তিনি তাহাই খাইতেন, আহারের পরিমাণ অতি সামান্য ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিতেন, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের বিরোধী মাংসাদি তিনি কখনও স্পর্শ করেন নাই। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে দেও শর্ম্মাজী খুব ভালবাসিতেন এবং সন্দেশ, মিঠাই, ফল, ফুল প্রভৃতি বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সততই সন্তুষ্ট করিতেন। তামাকুর ধূম পানে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও প্রিয় ছিলেন।

মহাপুরুষ দেও শর্ম্মাজী বাবাকে সহজে চিনিয়া লওয়া কঠিন কর্ম্ম ছিল। যখনই সংসারী লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত, তখনই তাঁহাকে সকলে বিরক্ত করিত। কেহ ব্যাধির জন্য, কেহ দারিদ্র্য-দুঃখ-ভঞ্জন জন্য, কেহ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, কেহ ভবিষ্যতে সুখী হইবার জন্য, কেহ বা কার্য্যবিশেষে সফলকাম হইবার জন্য, নানা প্রকার কারণে গৃহী লোকেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাঁহার আশীর্ব্বচন শুনিবার জন্য বিরক্ত করিত। বাবা দেওজী শর্ম্মা এজন্য অনেক সময়ে পাগল সাজিয়া, মৌনী সাজিয়া, ভিখারী সাজিয়া অথবা অন্য প্রকার ছদ্মবেশে লোকালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সংসারী লোকে সহজে তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিত না। কোনও কোনও সময়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারে দেহখানিকে সুশোভিত করিয়া বেড়াইতেন।

জুতা আর গুঁতা।

"সম্ভবত্যে বাক্যত্বে বাক্যভেদো ন জায়তে"। (বৈশেষিক দর্শন) জৈমিনী।

আমার বিবেচনায়, আরশুল্লা যদি কখনও পক্ষী হয়, চৌকিদার যদি কখনও হাকিম হয়, গরু যদি কখনও গুরু হয়, মুড়ো ঝাঁটা (সম্মার্জ্জনী) যদি কখনও নারিকেল বৃক্ষ হয়, অথবা আনড়া যদি কখনও মালদহের আম হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী আবার "মানুষ"—বাঙ্গালী আবার একটা "জাতি"—আবার

একটা "শক্তি" (power)বলিয়া প্রখ্যাত ও পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু "সাত মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচ্‌বে না!" আমড়া কখনও আম হয় না, গরুও কখনও গুরু হয় না। তোমরা বলিতে পার, বাঙ্গালী মেয়েরা কি বক্তৃতা করিতে অথবা বাইশিকেল হাঁকাইতে শিখে নাই, বিলাতে গিয়া বাবুরা কি ইংরাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই, আমেরিকায় গিয়া বাঙ্গালী বীর স্পেনের যুদ্ধে সৈনিক পুরুষরূপে প্রেরিত হয় নাই এবং সাহিত্যে ও বিজ্ঞানতত্ত্বে কি গৌড়বাসীর গৌরব ও সৌরভ বাড়ে নাই? ভাই! তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হাসি পায়; তোমাদের কথা শুনিয়া বহু পূর্ব্বকালের যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর সেই পুরাতন গানটা এতদিনে আবার স্মরণ হইল;—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ। নইলে শুধুই মদন॥

ভাই! তোমরা যে এখন কেবল "শুধুই মদন" হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তাহা কি একবার চিন্তা করিবার অবসর পাও? তোমাদের কার্য্যক্ষেত্ররূপ ব্রজধামে তোমরা "কৃষ্ণ" রূপে বর্ত্তমান আছ বটে, তাহা জানি, কিন্তু যতক্ষণ ফিরিঙ্গি-রাধা তোমাদের সঙ্গে,ততক্ষণই তোমরা "মদনমোহন," নতুবা গজভুক্ত কপিত্থ-বৎ "শুধুই মদন"!! এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? পথে পথে ট্রাম, ট্রলি ও রেলওয়ে চলিতেছে বটে; ছেলে, মেয়ে, মা, ভগ্নী, পিসী, মাসি, বন্ধু ও বৈবাহিককে পর্য্যন্ত শাসন করিবার জন্য "স্বায়ত্বশাসন" আইনের সৃষ্টি হইয়াছে বটে; পুকুরের বাঁশ গাছ, দিঘির পুঁটি মাছ, ঘরের জানালা অথবা ক্ষেতের মূলো কলা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইবার জন্য কিম্বা মেথরের মুখে গালি শুনাইবার জন্য মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হইয়াছে বটে; নগরে নগরে গ্যাস, ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠন, কেরোশীন তৈল এবং ফুলমালার ন্যায় দীপমালা জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু;—

"পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

অনেক ফেরিওয়ালা রায় বাহাদুর, অনেক কলাওয়ালা কৈশর-এ-হিন্দ্‌, অনেক "কুয়োর ঘটিতোলা" রাজা বাহাদুর, অনেক কশাই ভায়া খাঁ বাহাদুর এবং অনেক পাঠশালার গুরুমহাশয় মহামহোপাধ্যায় হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধির নাম আর কিছুই নহে, কেবল "ছি-এ ছাই"!! (C. S. I.)নিত্য নিত্য চাঁদার জুলুমে, নাচ গান তামাসা "বল্‌" ডিনার মিটিং, স্কেটিং, পবলিক স্পিরিট আর উহাঁদের

হোটেল সম্বন্ধীয় ডিনারের স্পিরিটের "বিলে" এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, এ সকলই ছি-এ-ছাই !! তোমরা এ দেশের বার্ষিক শাসন বিজ্ঞাপনীতে Administration Report মধ্যে কোটি কোটি টাকার আমদানির কথা পাঠ কর,রেলওয়ে হইতে কোটি কোটি টাকা লাভের কথা শুনিয়া থাক,প্রতি বৎসর জাহাজের সংখ্যা ছারপোকার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতেছে, কত সোণার খনি ও কত রূপার আকরের আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু সে সকল শুনিতে ও পড়িতেই ভাল। "বেল পাকিলে তাহাতে কাকের কিছু লাভ হয় না।" এখনও বুঝিলে না—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ। নইলে শুধুই মদন ॥

এখন ঐ পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিই। এখন আসল কথা এই যে, জুতা ও লাথি দ্বারা নিত্য প্রহারিত হইয়াও যে জাতির চৈতন্য হয় না, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সম্মার্জ্জনীর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও যে জাতির মনে মানহীনতার ধারণা আইসে না, অসংখ্যাসংখ্য নিরপরাধিনী কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট হইতে দেখিয়াও যাহাদের ধমনীস্থ শোণিত একটুও তীব্রতা বা উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় না, যাহাদের কাণমলায় কলঙ্ক অথবা অবিচার বা অত্যাচারে অপমান বোধ হয় না, সংক্ষেপতঃ যাহাদের পাপের প্রতি ঘৃণা, সত্যের প্রতি ভক্তি, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সরলতার প্রতি স্নেহ,অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি বিদ্বেষ কিম্বা যথেচ্ছাচারিতার দিকে অশ্রদ্ধার উদ্ভব হয় না, তাহাদের কি কখনও জাতীয় জীবন—জাতীয় উন্নতি—জাতীয় চরিত্র সম্বর্দ্ধিত বা সংরক্ষিত হইতে পারে ? আমি যাহা লিখিলাম, তাহা বাস্তবিক নিতান্তই কঠোর নিষ্ঠুর এবং দুঃশ্রাব্য, কিন্তু আমিও বাঙ্গালী। "বাঙ্গালী" বলিয়াই এত কাঁদি এবং সেই কারণেই আজি মনের দুঃখে দুটো কথা লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি।

প্রতি সপ্তাহে সমাচার পত্রে পড়িতেছি, প্রতি স্থানেই গল্প শুনিয়া আসিতেছি, অমুকদিন, অমুক ফিরিঙ্গির হাতে একটা কাল আদ্‌মির প্রাণ গেল ; অমুক দিন একটা গৌরবর্ণ গোরার পদাঘাতে একটা কাল রংএর নেটিভ নিগরের প্লীহা ফাটিয়া গেল, অমুক দিন রেলওয়ের সীমানায় বা চা-বাগিচার মোহানায় একটা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হইল। কোথায় গুলির আঘাতে—কোথায় বা চপেটাঘাতে—কোথাও বা ঘুসির প্রবলতায়—সংক্ষেপতঃ সর্ব্বত্রই জুতা আর গুঁতোর ব্যবহারে ভারতবাসীর ভবপারের ভাবনা ঘুচিয়া যায় !! আবার

সেই সম্বাদপত্রেই পড়িলাম, "অপরাধীগণ গ্রেপ্তার হইয়া বিচারাধীন আছে; বিচারের ফলাফল সত্বরে পাঠকবর্গকে সবিস্তারে জ্ঞাত করা যাইবে।" কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে শুনা গেল, "আসামীগণকে পুলিশের প্রভু ডাকাইয়া আনিয়া অশ্বযানযোগে অমুক রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন, তদন্তর দ্বিতীয় শ্রেণীর বাষ্পীয় শকটে বসাইয়া দিয়া অমুক স্থানে আনয়ন করেন। বিচারপতি অত টাকায় জামিনে আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পথে আসামীর কোনও কষ্ট হয় নাই—তাহার হাতে হাতকড়িও ছিল না, পুলিশের সহিত নিরীহ সাহেবের কোনও বিবাদ হয় নাই; আসামী এক্ষণে বাঙ্গালাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, মোকর্দ্দমার দিনে তাঁহার বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিবেন। শুনা গেল, আসামীকে রেলওয়ের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং ষ্টিমার-যোগে আনিবার জন্য, আর তাঁহার খানার খরচ, পথশ্রম শান্তি জন্য বিলাতী পাণি প্রভৃতিতে এত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আসামের আর এক সাহেব কুলীহত্যায় এক মাস কাল বিনা পরিশ্রম সহ দণ্ডিত হইয়াছেন, কিন্তু আসামের জেলে ইউরোপীয় কয়েদীর থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকায়, আসামীকে আপাততঃ বিলাতী হোটেলে রাখা হইয়াছে, বোধ হয়, সত্বরে কলিকাতায় সে ব্যক্তি আনীত হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক কাঠ খড় পোড়াইয়া, অনেক বৈদান্তিক কচকচি এবং নৈয়ায়িক খচখচির শ্রাদ্ধ করিয়া সাতটা আইনসাগর এবং তেরটা যুক্তিনদী পার হইয়া, শেষে দয়ারসাগর, বুদ্ধির নাগর, ন্যায়ের আকর এবং ধর্ম্মের অবতারস্বরূপ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহিমান্বিত বিচারপতি মহাশয়েরা বিশিষ্ট অনুগ্রহ সহকারে যেরূপ রায় দেন, তাহার দুই একটা নমুনা দিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

১। নেটিবকে একেবারে মারিয়া ফেলিবার জন্য, শ্বেতদ্বীপবাসী শ্রীমান্ শড্রু সাহেব আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নেটিব বাবাজীর ম্যালেরিয়া আক্রান্ত পল্লীতে জন্ম হওয়ায় তাহার উদর মধ্যে একটা বিলাতি কুষ্মাণ্ডের ন্যায় সুবৃহৎ প্লীহা থাকা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়, ডাক্তারের সাক্ষ্য দ্বারাও সে কথা প্রতিপন্ন হইতেছে; অতএব শ্বেতদ্বীপবাসী শ্রীমান্ শড্রুকে ১২০ ঘণ্টার জন্য অর্থাৎ ৫টা সম্পূর্ণ দিবসের জন্য বিনা পরিশ্রমে শ্রীঘরে যাপন করিবার জন্য প্রেরণ করিবার আদেশ দেওয়া গেল। ২নং—যেহেতু পাখী শিকার করিবার

জন্য এবং বিশেষতঃ আসামী যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইবার জন্য, শ্রীমান গোমীজ সাহেব শকুনি বা খ্যাঁকশিয়ালী ভ্রমে গুয়েরাম গুঁই এবং ফটিকচাঁদ বক্সীকে হত্যা করিয়াছে, ইহাতে আসামীকে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী করা অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। জুরীরাও সে কথা বলেন। শিকারের স্থানে পাগলী খ্যাঁক-শিয়ালী দলে দলে বিচরণ করে, ইহারা দংশন করিলে মানুষ পাগল হইয়া যায়, সুতরাং প্যারীশ নগরের পেষ্টর ইনিষ্টিউটে চিকিৎসা জন্য পাঠাইতে হয়; এরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক ছোড়া এবং সেই বন্দুক কর্ত্তৃক নেটিবের প্রাণনাশ হওয়া বিশেষ একটা অপরাধ নহে। যাহা হউক, হত্যাপরাধ হইতে আসামীকে মুক্ত করা গেল। তদ্ভিন্ন আর এক কথা। হোশেনমোল্লা ও হয়দর সেখ প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা আসামীকে একাকী দেখিয়া গ্রেপ্তার করিতে আসায়, সাহেব আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে গুরুতররূপে জখম করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমরা সাহেবকে এই বলিয়া অপরাধী স্থির করিলাম যে, আত্মরক্ষার জন্য এতটা করা আসামীর পক্ষে শোভা পায় নাই। যাহা হউক, আসামীকে অপরাধী স্থির করিয়া পঞ্চদশ মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল।

৩। কৃপাময়ী দাসীকে এবং তাহার শিশুপুত্রকে আসামী ওয়াল্টর সাহেব ভালুক ভ্রমে বন্দুক ছুড়িয়া, পরলোকে প্রেরণ করিয়াছে, অতএব কৃপাময়ী দাসীর স্বামীকে ৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়া ওয়াল্টার রাজীনামা লিখাইয়া লইবে, এইরূপ আদেশ করা গেল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়, সুতরাং ওয়াল্টরের জন্য বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

৪। "বর্ত্তমান সময়ে ফিরিঙ্গিগণ কর্ত্তৃক নেটিভ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার এবং কালা আদ্মীর প্রাণনাশ প্রভৃতির কথা শুনা যাইতেছে, অতএব এইরূপ ঘটনার দমন করিবার জন্য আমরা আসামীদিগকে এবম্প্রকার দণ্ড দেওয়া উচিত বিবেচনা করি, যেন সেই দণ্ডে তাহাদের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আসামী (সাহেব), একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশ এবং তাহার পরে মূল্যবান অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। যে সকল হিন্দু ও মুসলমান ইহাকে ধরিতে আসিয়াছিল এবং পুলী-শের যে সকল আইনানভিজ্ঞ লোক ইহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল, আসামী তাহাদিগকে ভয়ানকরূপে জখম করিয়াছে, ইতিমধ্যে একজন জখমী মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জুরীরা আসামীকে নির্দ্দোষী স্থির করিতে-ছেন, আমারও তাহাই মত। সাক্ষীদিগের জবানবন্দী কেবল বিষম মিথ্যায়

পরিপূর্ণ, অতএব আসামী খালাস পাইল; আদালত হইতে আসামী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বাহিরে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইতে অধিকারী—"The accused is honorably aquitted. He quits this court without least stain on his character." আসামীর সঙ্গে কয়েকজন দুষ্ট চরিত্রের বাঙ্গালী ছিল—ইহাদের একজনের নাম খয়রু হাজী, একজনের নাম গদাধর গোয়ালা এবং আর একজনের নাম গোবর্দ্ধন মাঝি। অতি সুস্পষ্ট, অকাট্য, অখণ্ডনীয় এবং আইন-সঙ্গত প্রমাণাবলী দ্বারা বুঝা গেল, ইহাদের দ্বারাই এ সমুদয় মহাপাপ-জনিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং জুরীগণ ইহাদিগকে অপরাধী স্থির করিয়াছেন, আমারও তাহাই মত। আমার বিবেচনায় এই মোকর্দ্দমায় আসামীদিগের Exemplary punishment দেওয়া আবশ্যক। অতএব গোবর্দ্ধন মাঝির জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস এবং গদাধর গোয়ালার জন্য ১৪ বৎসরের কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে। খয়রুহাজী নিশ্চয়ই স্বহস্তে মৃতা স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিল। অতএব তাহার সম্বন্ধে এই হুকুম দেওয়া গেল যে, যাবৎ তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইরে বহির্গত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহার শরীরটাকে দড়ী দ্বারা ঝোলাইয়া রাখা হইবে—"To be hanged by the neck till he is dead." Section 368 C. P. Code.

(নং ৫) মোকর্দ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, নিহত নেটিবের স্ত্রী কহিতেছে, তাহার স্বামী নিদ্রিত ছিল এবং তাহার পার্শ্বে তাহার ঐ স্ত্রী শিশু-সন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছিল; এমন সময়ে আসামী (ইংরাজ) আসিয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা স্বামীর গলা কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোক চীৎকার করায় তাহাকেও খুন করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাকে পদ দ্বারা লাথি মারিয়াছিল। এই মোকর্দ্দমায় কতকগুলি নেটিব ও কতকগুলি ইউরোপীয় পুরুষ সাক্ষী ছিল। নেটিব সাক্ষীদের কথার সামঞ্জস্য নাই, তাহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার হেতু দেখাইয়াছি। আসামী যে মদ খায়, এবং উদ্ধত-প্রকৃতি (তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে মাথা পাগলা হয়) তদ্বিষয়ে প্রমাণ রহিয়াছে। (অতঃপর আসামীকে সম্বোধন করিয়া বিচারপতি কহিলেন) হে অভিযুক্ত পুরুষ! তোমারই স্বদেশীয়গণ জুরীরূপে তোমাকে এই গুরুতর মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি দিলেন। আমিও তাঁহাদের অভিমতে সামিল হইয়া তোমাকে মুক্তি দিলাম। দেখিও সাবধান! সাবধান! আর যেন মদ না খাও; উদ্ধত-প্রকৃতি-সম্পন্ন না থাক; আর যেন এরূপ না শুনিতে হয়। ইত্যাদি।

হরিবোল হরি! আসামী মহাশয় আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিল, ইংরাজেরা তাহার কর-মর্দ্দন করিয়া তাহাকে পরমাপ্যায়িত করিয়া দিল। কিছু দিন পরে সাহেবেরা ও সাহেবদিগের সভা অত্যন্ত ক্রোধ ও অভিমানের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠাইলেন "পুনঃ পুনঃ এরূপ মিথ্যা মোকর্দ্দমায় এ দেশের ইংরাজেরা একেবারে জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, মুক্তি-প্রাপ্ত ইংরাজ ভদ্রলোকটীকে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষরূপে ক্ষতিপূরণ স্বরূপে অর্থ দেওয়া উচিত, আর বিলাতী জাহাজে বসাইয়া তাহার টিকিটের ও ভোজনাদির ব্যয় জন্য টাকা দিয়া তাহাকে তাহার বিলাতের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।" গবর্ণমেণ্ট কহিলেন, "ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাইবে না, কিন্তু বিলাত গমনের ব্যয়াদির জন্য অবশ্য টাকা প্রাপ্ত হইবে।" সাধু! সাধু! সে ব্যক্তি তাহাই পাইল; এ দিকে ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, রসাতল, তলাতল, ত্রিতাল, অন্তুতাল, উপতাল, বিতাল প্রভৃতি বিদীর্ণ করিয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিতে লাগিল; অবশেষে প্রমাণ হইয়া গেল, ভারতবাসী নেটিব মিথ্যাবাদী, রাজ-বিদ্রোহী, বদমায়েস, মোকর্দ্দমাপ্রিয়, দুষ্ট, কপট, ইংরাজ-বিদ্বেষী এবং ধর্ম্মকর্ম্মশূন্য!! সাধু! সাধু! ইংরাজ মহলে তাহাই আলোচিত হইতে লাগিল, অনেকে কহিল "এই সকল বদমায়েসকে ধরিয়া জেলে বা আণ্ডামান দ্বীপে পাঠাও; দেশে কোর্ট মার্শাল আইন জারী কর; নেটিব খবরের কাগজ একেবারে বন্ধ করিয়া দাও; রেগুলেশন লাঠি চালাও; তোপের বা বন্দুকের গুলিতে সভা-সমিতি উড়াইয়া দাও; বক্তৃতা বন্ধ কর, আর মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান করিয়া তুল।" সাধু! সাধু!! অতঃপর মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত মাজিষ্টর বাহাদুরের দুই একটা দেব-দুর্লভ রায়ের নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

১ম। এই মোকর্দ্দমায় ফরিয়াদী নেটীব এই বলিয়া এজাহার দিয়াছে যে, সে রেল অপিশে কেরাণীগিরি (চাক্‌রী) করিত; ভ্রমক্রমে আফিশের এক দিকের একস্থানে নিষ্ঠীবন (থু থু) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ছোট সাহেব ইহা অকস্মাৎ দর্শন করিয়া বড় সাহেবের নিকট রিপোর্ট করে। বড় সাহেব ঐ স্থানে আসিয়া কেরাণীকে বলে, "তুমি কি জাতি?" ফরিয়াদী কহিল, "আমি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।" সাহেব কহিল, ভাল কথা! তবে তুমি তোমার জিহ্বার দ্বারা এই থু থু উঠাইয়া লও। ফরিয়াদী তাহা না করায় সাহেব কহেন, তবে হাতের দ্বারা উঠাইয়া লও। ইহাতেও অসম্মত হওয়ায়, সাহেবের

হুকুমে আফিশের চাপরাশী ঐ ব্রাহ্মণের গলায় জুতার মালা পরাইয়া তাহার কাণ ধরিয়া তাহাকে আফিশের সম্মুখে ঘুরাইয়াছিল। এক্ষণে ঐ ব্রাহ্মণ আমার আদালতে সাহেবের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। আমার বিবেচনায়, এই ঘটনাটা এমন কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে যে, তজ্জন্য বিচারের আবশ্যক। এমন হইয়াই থাকে; আফিশের সাহেবরা একটু প্রভুত্ব না দেখাইলে আফিস চলিবে কেমনে? অতএব মোকর্দ্দমা ডিশমিশ করা গেল।

২য়। লালাযুগল কিশোর এই বলিয়া এজাহার দিতেছে যে, সে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন কালে প্রখর রৌদ্রের সময় ছাতা মাথায় দিয়া সরকারী রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। একটু দূরে য়োয়েন্ টুইট্‌কট্ সাহেব আসিতেছিলেন, তিনি কয়েক হস্ত দূর হইতে চীৎকার করিয়া কহিলেন "ইউ ড্যাম্ নেটিব! ছাতা বন্‌ড্ করো। টোম্ ডেক্‌টা নেই ইংরাজ আটে হেঁ।" লালাযুগোল কিশোর ইংরাজী জানে; তাহার উকিল কহিতেছে, সে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক; সুতরাং অতীব সাহস সহকারে সাহেবকে কহিল, "এরূপ হুকুম দিবার তোমার অধিকার নাই। আমিও এরূপ হুকুম তামিল করিতে বাধ্য নহি।" ইহাতে সাহেব অপমানিত বোধ করিয়া, ক্রোধ সহকারে, লালাযুগল কিশোরের গলা ধরিয়া তাহাকে আনুমানিক ২০ হস্ত দূরে ঠেলিয়া লইয়া যায়, এবং ঘুসি ও লাথি মারে। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার কটূবাক্য প্রয়োগ করে। শোণিতে যুগল কিশোরের সর্ব্বশরীর লালবর্ণ হইয়া যায়। এই জন্য ফরিয়াদী যুগল কিশোর এই মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। আদালতের বিবেচনায়, যুগলকে অপমানিত করা সাহেবের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। দুর্দ্দান্ত বা অবাধ্য ছেলেকে শিক্ষক বা পিতা যেমন শিক্ষাচ্ছলে শাসন করে, যুগলকে ওয়েন্‌টুইট্‌কট্ সাহেব তদ্রূপ শিক্ষা মাত্র দিয়াছে। এরূপ অভিযোগ আদালতে না আনাই উচিত ছিল। আসামীকে মুক্তি দেওয়া গেল।

৩য়। এই মোকর্দ্দমার অভিযোগকারী (ফরিয়াদী) মিষ্টর উইলিয়ম বর্ডট্রজন্‌টন্ সাহেব এই বলিয়া এজাহার দিতেছেন যে, তিনি বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনে সায়াহ্ন কালে ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে বায়ু সেবন করিতেছিলেন, সঙ্গে আর একটী ঘোড়ায় তাঁহার স্ত্রী ছিলেন এবং তৃতীয় অশ্বে তাঁহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা আরোহিতা ছিলেন। প্রত্যাগমনের সময় তাঁহারা দেখিলেন, একটা পুকুরের ধারে গজপতি রায় চৌধুরী তাহার ভৃত্য (দোকড়ি ঘোষকে) সঙ্গে লইয়া কাটারি হস্তে তাহাদের পুকুরের বাঁশ কাটি-

তেছে। সাহেবের অশ্ব, বংশ কাটার শব্দে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাব প্রকাশ করায়, সাহেব কহিলেন, বাঁশ কাটা বন্ধ কর। ইহাতে গজপতি বা দোকড়ি মনোযোগ না দিয়া বাঁশ কাটিতে লাগিল। বাঁশ বনের চারিধারে তারের বেষ্টন ছিল। সাহেব ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া তারের বেষ্টন ভাঙ্গিয়া বাঁশ বনে প্রবেশ পূর্ব্বক গজপতি ও দোকড়িকে চাবুক দ্বারা প্রহার করায় তাহারা হস্তস্থিত কাটারি ঊর্দ্ধদেশে উত্তোলন করে, সাহসী সাহেব তাহাতে পলায়ন না করিয়া ক্রমাগত প্রহার করিতে থাকে। ইহাদের ভীষণ চীৎকার শুনিয়া বহু লোক একত্রিত হয়, সাহেবের কোটের পকেটে ছোট রিভলভর (বন্দুক) ছিল, সাহেব গুলি ছুড়িতে লাগিলেন, সৌভাগ্যক্রমে একত্রিত জনগণের মধ্যে কাহাকেও গুলি লাগে নাই। যদি লাগিয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য—প্রায় নগণ্য। সাহেবের সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে দুইটি মাত্র গুলি ছিল, অধিক গুলি না থাকায় সাহেব তাড়াতাড়ি প্রত্যাগমন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নীলকুঠিতে ফিরিয়া আইসেন। ফিরিয়া আসিবার সময়, গ্রামের ঐ সকল লোক তাঁহার যুবতী কন্যার দিকে নাকি তাকাইয়া ছিল এবং প্রেমসূচক ইঙ্গিত প্রদর্শন পূর্ব্বক হাসিয়াছিল। যাহা হউক, সাহেব এক্ষণে এই বলিয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে যে, প্রথমতঃ তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ ঊর্দ্ধদেশে কাটারি তুলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তৃতীয়তঃ বাঁশ কাটার শব্দ দ্বারা তাহাদের তিনজনকে ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এবং চতুর্থতঃ তাঁহার সুন্দরী পত্নী ও অবিবাহিতা যুবতী কন্যার মর্য্যাদার হানি করা হইয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসামীগণ অনেক সাক্ষী আনিয়াছিল, তাহাদের অনেক উকিল মোক্তার ছিল, কিন্তু সাক্ষীগণের কথা নানা কারণে একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য। তাহার কারণ রায়ের স্থানান্তরে লেখা গিয়াছে। উকিল মোক্তারদিগের যুক্তি একেবারেই বালকত্বে পরিপূর্ণ। এক্ষণে আসামীগণকে এই আদালত অপরাধী স্থির করিয়া হুকুম দিতেছেন যে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এক বৎসরের জন্য সপরিশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেককে দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল, তাহা না দিলে বা দিতে না পারিলে আরও এক বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তা ছাড়া, ইহারা যখন জেল হইতে মুক্ত হইয়া আসিবে, তখন প্রত্যেকের নিকট হইতে শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চশত মুদ্রার মোচলেকা গ্রহণ করা যাইবে, না দিলে আর

এক বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে দুই বর্ষ জন্য পিউনিটিব পুলীশ স্থাপন করা হইবে, গ্রামের অধিবাসীগণকে তাহার ব্যয়ভার বহণ করিতে বাধ্য করা যাইবে। মোকর্দ্দমার বিচার কালে জানা গিয়াছে, ঐ গ্রামের জমিদার এই হাঙ্গামার মূলে অবশ্যই গোপনীয় ভাবে কার্য্য করিতেছিল, এই জন্য তাহাকে একচল্লিশ দিনের জন্য স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা গেল। আর অবশেষে এই হুকুম দেওয়া গেল, কোন ইউরোপীয় পুরুষ ঐ পুকুরের ধার দিয়া আসিবার সময় কেহ যেন তথায় বাঁশ না কাটে। বাঁশ কাটিলে কর্ত্তনকারীর তিন মাস সপরিশ্রম কারাবাস-দণ্ড দেওয়া যাইবে এবং গবর্ণমেণ্টের লোক আসিয়া বাঁশ সমূহ একেবারে কাটিয়া দিবে। মিষ্টর উইলিয়ম বর্ডেট রজন্টন্ সাহেব ক্ষতিপূরণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আদালতের বিবেচনায় এতটা করার আর প্রয়োজন নাই। মিষ্টর রজন্টন্ সাহেব এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ নীলকর সাহেব, এখানকার সমস্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় লোক তাঁহাকে সাধুপুরুষ বলিয়া জানে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে জানেন না, এই আদালত তাঁহাকে প্রিয়ভাষী এবং পরোপকারী খ্রীষ্টান পুরুষ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। যাহা হউক, আশা করা যায়, নেটিব আসামীদের এবারে যথেষ্ট শিক্ষা হইল। অতঃপর এইরূপ ঘটনা আর হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যখন এইরূপ মোকর্দ্দমায় কোন প্রতিকার প্রাপ্ত না হয়, যখন ভারতবাসী মনে করে, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে এবং আইনের বৈপরীত্য সাধিত হইয়াছে, তখন সেই অধমতারণ পতিতপাবন পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন ইংরাজ কৃপা করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা হইলে কিরূপ উত্তর পাওয়া যায়, তাহার নমুনা দেখুন। প্রথমতঃ প্রশ্নটা শুনুন।

হতভাগ্য ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া পার্লামেণ্টের জনৈক সাহেব—মেম্বর কৃপা পূর্ব্বক সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গত ছয় মাস কাল মধ্যে ভারতবর্ষ দেশে পঞ্চবিংশ জন কালা আদমী ইংরাজের পদাঘাতে, ঘুসির আঘাতে, বন্দুকের গুলিতে এবং চাবুকের প্রহারে এবং অন্যবিধ কারণে নিহত হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি সকল আদালতের বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কি ষ্টেট্-সেক্রেটরী অবগত আছেন? অমুক স্থানে অমুক সম্বাদপত্র সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিয়া, হাতকড়ি

দিয়া বাঁধিয়া, হাজতে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তদনন্তর তাহার নামে রাজবিদ্রোহের মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহাকে দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছে, ইহা কি ষ্টেট-সেক্রেটরী অবগত আছেন? কতকগুলি ইংরাজ সম্বাদপত্র সম্পাদক তাহাদের কাগজে আইনবিরুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীদিগকে গালি প্রয়োগ করিয়াছে এবং অকারণে তাহাদের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে, ইহা কি তিনি শুনিয়াছেন? অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জমিদার ও রাজাকে কতকগুলি মাজিষ্ট্রেট ভয়ানক রূপে অপমানিত করিয়াছে, কতকগুলি নীলকর, চাকর ও গোরা সৈন্য ভারতের কতকগুলি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, কতকগুলি গ্রাডুয়েটকে স্পেশাল কনেষ্টবল করা হইয়াছে, অনেক সভা সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অনেক স্থানে সুবিচার হয় নাই; সর্ব্বত্র জলকষ্ট, অন্নকষ্ট ও নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; ইত্যাদি, ইত্যাদি, বিবরণ কি ষ্টেট্-সেক্রেটরী অবগত আছেন? এক্ষণে প্রশ্ন এই, ষ্টেট্ সেক্রেটরী মহাশয় এই সকলের কোনরূপ প্রতিবিধান করিয়াছেন কি না? যদি না করিয়া থাকেন, করিবেন কি না?" প্রশ্ন শুনিয়া সেক্রেটরী উত্তর দিলেন—"হাঁ হাঁ আমি এই সমুদয় কথা অবগত আছি। কিন্তু ভারতবর্ষে জজ আছে, মাজিষ্ট্রেট আছে, কলেক্টর আছে, ছোটলাট আছে, বড়লাট আছে, ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট আছে, তাহারাই অবশ্য ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার উপযুক্ত। আমাদের সে কথায় কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইত্যাদি।" প্রশ্নকর্ত্তা যদি আবার ঐ সকল কথা উত্থাপন করেন, তাহা হইলে এবারে উত্তর হইবে যে "আমি এ সকল বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে অসম্মত"!! হরিবোল হরি! সাধু! সাধু!!

আসল কথা এই, হিউমেরই শরণাগত হও, আর ওয়েডারবরণেরই আশ্রয় লও, সামুয়েল স্মিথকে সহায় কর, আর সার হেনরি কটন, ঘটন্, জটন্, সাহেবকেই ভারতবন্ধু বলিয়া স্বীকার কর, "ভবীর মা কিছুতেই ভোল্‌বার নয়।" তোমরা কি এখনও বুঝিলে না—চণ্ডালে পড়ে না চণ্ডী আর ডমের ছেলে হয় না দণ্ডী? চাউল দাও, ডাউল দাও, ছানা মণ্ডা মাখন মিছরি যাহাই কিছু দাও, ভবীর মা কিছুতেই ভোল্‌বার মাগী নয়।

মাখন দাও, মিছরি দাও আর দাও গজা।
ঘৃত দাও, চিনি দাও; দেও বর্দ্ধমানের খাজা।
মুগ দাও, মশুর দাও; দাও পাটনার ছোলা।

লুচি দাও, রোটি দাও; দাও মর্ত্তমান কলা।
সন্দেশ দাও, জিলাপী দাও, দাও খাসা মণ্ডা।
বোতলের দাও গরম পাণি, আর বরফ ঠাণ্ডা।
ঢাকায় দাও পাতক্ষীর, যতই উত্তম হয়।
কিন্তু ভবীর মাতা কিছুতেই ভোল্‌বার নয়॥

হরিবোল হরি! সাধু সাধু! তাহাতেই বলিতেছি, ভায়াদের মুখের জারি জুরীর বলিহারী যাই! পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত দোড়! কিন্তু ভায়া এখনও বুঝিল না যে, সাহেবেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে লাড়ু বিলাইতে বা ঘাস কাটিতে আইসে নাই, তাহারা রাজ্য করিতে আসিয়াছে। আসল কথা এই, কাশীর মন্দিরেই যাও, কিম্বা মক্কার মশিদেই যাও, এই কথাটা স্মরণ রেখো যে—

তাঁতীর শোভা তাঁতখানা, দর্জ্জীর শোভা সূতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে, জুতো আর গুঁতো॥

এইবারে একবার সেই মহামহিমান্বিত ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় (কৌন্সিলে) উকি মারিয়া তথাকার ব্যাপারটা দেখিয়া লইতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি না কি, সমুচয় কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, পুলিশ সাহেব, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার প্রভৃতির এই সভাই হ'চ্ছে মালিকের মালিক। এখানে যে সকল বাবু বসেন, তাঁহারা হচ্ছেন শ্রীল শ্রীযুক্ত "হনরেবল।" বিবিধ বর্ণের চোগা চাপকান্ অথবা কোট-প্যাণ্টালুন-পরিহিত শ্রীল শ্রীযুক্ত হনরেবল বাবু, গোঁপে "তা" দিয়া, হাত পা তুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "অমুক স্থানের সাহেব মাজিষ্ট্রেটের ভয়ানক অত্যাচার, অবিচার, জুলুমপ্রভৃতির কথা কি গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন? অমুক স্থানের পুলীশ সাহেবের ভয়ানক হইতে ভয়ানকতর অবৈধ ব্যবহারের কথা কি গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন?" প্রশ্ন করিয়া শ্রীমান হনরেবল বাহাদুর উপবেশন করিলেন; সেক্রেটরী সাহেব উত্তর দিলেন "মাজিষ্ট্রেটরা জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা, তাহারা জেলার হাকিম। তাহাদের হাতে একটু বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে কাজ চলে না। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।" অতঃপর আর একটি হনরেবল বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "গবর্ণমেণ্ট কি বলিতে পারেন, কি কারণে অমুক স্থানে অনর্থক এত টাকা অপব্যয় করা হইল? কি কারণে এই সকল অন্যায় ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও রাজ কর্ম্মচারীগণ কিছুই প্রতিবিধান

করেন না? কি কারণে হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্য কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী চেষ্টা করিতেছেন?" উত্তর হইল—"বেঙ্গল কৌন্সীল এই সকল বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত স্থান নহে। এই সকল বিষয়ের কাগজ পত্র গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন।" হরি বোল হরি!! সাধু! সাধু! ধন্য! ধন্য! জয় মা কালী!!

তবুও শ্রীযুক্ত হনরেবলগণ ছাড়িবার লোক নহেন। আবার প্রশ্ন হইল—"দশজন সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ২৭ বৎসর কাল উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া অসাধারণ যোগ্যতা ও সাধুতা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটেও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি একজন ইংরাজ ছয় বৎসর মাত্র চাকুরী করিয়া এই দশজনের উপরিস্থিত পদে উন্নীত হইল কেন? আর এই দশজনের উন্নতির কথা শোনা যায় না কেন? কি কারণে ২৭ বৎসরের রাজকর্ম্মচারীকে ৬ বৎসরের কর্ম্মচারী উপেক্ষা করিয়া উন্নত হইল?" সেক্রেটরী উত্তর দিলেন, ইহার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে যোগ্যতাই বিশেষ কারণ। "Merits and not seniority are generally observed." শ্রীল শ্রীযুক্ত অনরেবল কহিলেন "ইহাদের অপেক্ষা ঐ সাহেব যে অধিকতর যোগ্য ও সাধু, তাহার প্রমাণ কি?" সেক্রেটরী বলিলেন "তাহা তোমরা দেখিয়া লও।" সাধু! সাধু! ধন্য! ধন্য!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও অনরেবল ভায়াগণ কৌন্সীলের মেম্বর হইবার জন্য ভোট সংগ্রহে এমন ব্যস্ত থাকেন যে, ভাত খাইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না। মেম্বর ভায়াদের গৌরব, সৌরভ, মান, খাতির, সমাদর প্রভৃতি বুঝিয়া লইলে কি? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ভায়ারা যে আসল কথা বুঝেন না, ইহাই আমার পরম দুঃখ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ভায়ারা বিশ্বাস করেন, সাদাতে এবং কালাতে মিলিতে মিশিতে পারে—শ্বেতকায় ইউরোপীয় পুরুষে আর কৃষ্ণকায় ভারতবাসীতে প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিতে পারে। বাবু এখনও বিশ্বাস করেন, কালা আদমীর জন্য শ্বেতকায় প্রভুর হৃদয় যেন দয়া দাক্ষিণ্যে ফাটিয়া যায়!! সাধু! সাধু! আহা, বাবুর কি ধারণার বলিহারী!!

বিড়ালে ইন্দুরে সখ্য, হবিষ্যান্ন বাঘের ভক্ষ্য,
দেখে শুনে বুদ্ধি হ'লো হত।
ইংরাজে নেটিবে হবে মিল, তালের তুল্য হবে তিল,
বধিরে শুন্‌বে বোবার গান শত।

অসম্ভব কি হয়রে বোকা! চাঁদের তুল্য জোনাকি পোকা?
বাসুকি নাগের তুল্য হয় কি ঢোঁড়া?
তুল্য হয় কি গরুড়ে কাকে, মেঘের গর্জ্জন ঢাকে কি ঢাকে,
ঘোড়ার সঙ্গে তুল্য হয় কি ভেড়া?
সাধুর কাছে যেমন চোর, হাতির কাছে বন্য-শূকর,
পদ্ম ফুলের কাছে কি শিমুল ফুল?
শুকের কাছে কি শকুনির শোভা, সাগরের কাছে কি সার ডোবা,
গজমতির কাছে কি শোভে কুল?
তুল্য হয় না কাঁচ আর হিরে, গুব্‌রে পোকা আর সত্যপীরে,
ফকিরের কাছে কি ফক্কড়্ শোভা পায়?
ভায়া! অমৃতের তুল্য হয় না বিষ, পুতুলের তুল্য কি জগৎকর্ত্তা জগদীশ?
রেলের তুল্য কি ছেলে চলে যায়?
বক মানায় না হংস মাঝে, মুর্গীকে কি ময়ূর সাজে,
বেতো ঘোড়া পক্ষীরাজে, তুল্য হয় কি শুকে বাজে।
গাধায় কি বয় হাতির বোঝা, শেয়ালে কি হয় সিংহের রাজা?
বাতাসা কি হয় খাসা খাজা? তুল্য হয় কি তীরে বাজে?
তেলের সঙ্গে মিশেনা জল, ডিমের সঙ্গে মিশে কি ফল?
সাধুর সঙ্গে মিশেনা খল, পাথর সাথে মিশে কি কাদা?
ভায়া! সম্ভবে মিলেনা অসম্ভব, ভৈরবী রাগে মিশেনা গাধার রব,
জীবিতের সাথে মিলেনা শব, কালোতে মিশিবে কেমনে সাদা?

ভায়া হে! আসল কথা এই, সাদায় কালোয় মিশে না এবং মিশিবে না—ইংরাজে ও ভারতবাসীতে মিলে না ও মিলিবে না। আর কেবল কি কথায় কথায় কার্য্যোদ্ধার চলে? সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য, ত্যাগস্বীকার, সাধুতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বদেশীয় ধর্ম্ম, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-প্রেম প্রভৃতি না থাকিলে কেবল কি গলাবাজিতে আর লেখনীর বাহাদুরীতে কাজ চলে? কাজ কৈ? কেবল তো বাক্যই দেখি! বাক্য আর বাক্য আর বাক্য!! আদিতে বাক্য, মধ্যে বাক্য, শেষে বাক্য এবং মরণান্তেও বাক্য! কেবল কথা আর কথা!! In the beginning there was word, in the middle there was word and in the end there will be word and word and word and word only. The word was with the Devil and the word was

made into flesh and blood and the word became the People of Bengal !!

তোমরা কার্য্যকালে ফাঁকি, আর তর্ক কালে দড়।
কথায় পুটুলি তোমরা, কলেজের পোড়ো॥
পরের দোষ গেয়ে বেড়াও, নিজকে দেখা নাই।
কথায় তুমি বিশারদ, কার্য্যকালে নাই !!
মুখেতে সাহস বাঁধা, বুকে বাঁধা ভয়।
পকেটে না পাবে 'পাই', লাক দু'লাক কয়।
নকলেতে বাহাদুরী, আসলেতে ছাই।
কথায় তুমি বিশারদ, কার্য্যকালে নাই।
তোমরা ষাঁড়ের গোবর, ভায়া ! ন যজ্ঞে ন হোমে।
দেশোদ্ধার তরে ছুট, ফ্রান্সে আর রোমে।
ভায়া ! ইংরাজ গোষ্টির নাম বলে দিতে পার।
বাপ পিতাম'র নামে তোমরা গায়ে ঘাম ঝর।
তোমাদের জুতোর বক্‌মা, চোকে চশ্‌মা, পরণে ঢাকাই।
কথায় তোমরা বিশারদ, কার্য্যকালে নাই।
বুকেতে চাদর বাঁধা, অঙ্গে ঢাকা সাট্।
বলিহারী যাই কিবা চুলের সে কাট্।
সাম্নে দশ আনা রাখা, পিছনেতে নাই।
হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি, মুখে বার্ডশ্‌আই।
ছাঁচিপাণে ঠোঁট রাঙ্গা, ঘরে ভাত নাই।
কথায় তোমরা বিশারদ, কার্য্যকালে নাই।
গ্রীষ্মকালে পা দুঃখানি ইষ্টকীনে ঢাকা।
সাবানে কামাই নাই, ওগো, ঘন ঘন মাখা।
তোমাদের বন্দ্যোপাধ্যায় বাণার্জ্জি, রায় মহাশয় "রে।"
নয় সাহেব, নয় বাঙ্গালী, ওগো চিন্‌বে এদের কে ?
ভায়া ! বাজারেতে জারি জুরী, ঘরে কিছু নাই।
কথায় তোমরা বিশারদ, কার্য্যকালে নাই !!
ডালে ভাতে রুচি নাই, হোটেলেতে যাওয়া।
চপ্, কট্‌লেট্ কোর্ম্মা আর পিরুর হাতে খাওয়া।

ধর্ম্ম কর্ম্মে আস্থাশূন্য, মজা তাতে নাই।
কথায় তোমরা বিশারদ, কলির বাবু ভাই !!
তাঁতীর শোভা তাঁতখানা, দর্জ্জির শোভা সূতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে, জুতো আর গুঁতো।

এখন বুঝিলাম, কালো নিগরের প্রাণের মূল্য পাঁচ কড়া কড়ি এবং তাহার মা, মেয়ে, ভগ্নী ভাগ্নীর সতীত্বের মূল্য এক কড়া কাণা কড়িরও সমতুল্য নয়। কি জানি, কোন্ দেবতার কৃপায়, অনেক বর্ষ হইল, (বোধ হয় সত্যযুগে) একটা ইংরাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু সে লোকটা কালা নেটিবকে মারে নাই,—মারিয়াছিল একটা শ্বেতদ্বীপবাসী শ্বেত প্রভুকে!! তাহার পরে য়োহারা (O'Hara) নামে দমদমার একটা গোরার ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, কিন্তু হাইকোর্ট হইতে যেদিন এই হুকুম জারী হয়, তাহার পরদিন পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে না ডুবিতে ডুবিতে সাদা চামড়ার সমুদয় ব্যারিষ্টার ধর্ম্মঘট করিয়া আইনের সাতটা সমুদ্র ও তেরটা তটিনী তৈয়ার করিয়া জজদিগকে তাহাতে ডুবাইয়া দিলেন এবং জোর করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমরা য়োহারা সাহেবকে ছাড়ান্ দেও।" জজেরা আইন-সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া দিশাহারা হইয়া গেলেন, সুতরাং আদেশ করিলেন, "নিরপরাধী য়োহারা মুক্ত হইল।" কেবল তাহাই নহে; য়োহারাকে লইয়া সাহেবেরা আনন্দে খানা দিল, নাচ গান করিল এবং রাশি রাশি টাকা চাঁদা তুলিয়া জাহাজ ভাড়া করিয়া সসম্ভ্রমে বিলাত পাঠাইয়া দিল। এদিকে কালা আদ্মীর প্রাণের জন্য, স্ত্রীলোকের সতীত্ব জন্য, পাপের প্রশ্রয় জন্য, একটা লোকও এক বিন্দু অশ্রু ফেলিল না। এই ঘটনা কি নিত্য নিত্য দেখিতে, পড়িতে ও শুনিতে পাইতেছি না? পৃথিবীর আর কোনও দেশে কি এরূপ ঘটিতে পারে? এরূপ অমানুষিক, এরূপ অসহনীয়, এরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অত্যাচার এবং ন্যায়ের অপব্যবহার পৃথিবীর আর কোনও জাতিতে কি সম্ভব? কালা আদ্মীর হত্যার জন্য ইউরোপীয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা কখনও শুনিতে পাও কি? প্রাণদণ্ড দূরে থাকুক, গুরুতর কারাবাস দণ্ডের কথা কখনও কাণে উঠে কি? গুরুতর দণ্ডের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয় আসামীকে "কালা আদ্মীর" ন্যায় কখনও হাজতে আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়াছ কি? তাহাতেই বলিতেছি, নেটিবের জন্ম কেবল জুতা আর গুঁতা খাইবার জন্য। বোম্বাই হাইকোর্টের মহামান্য জজ সৈয়দ বদ্রুদ্দীন তায়েব্জি বাহাদুরের সন্তান, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, সেদিন বোম্বা-

য়ের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে জাহাজের একটা ইউরোপীয় খালাসীর তুল্য লোক রক্তাক্ত করিয়া মারপিট করিয়া গেল এবং "শুয়র" "শালা" প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছিল। অথচ পুলিশের লোক তাহাকে ধরিতে অস্বীকার করে, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে তার পাঠাইয়া তবে সাহেবের নাম পাওয়া যায়। তাহাতেই বলিতেছি, নেটিবের জন্ম জুতা আর গুঁতার চরিতার্থতা সম্পাদন জন্য। বর্ষায় পতঙ্গ জন্মে লণ্ঠনের আলোকের তাপে পুড়িয়া মরিতে; বিছানায় ছারপোকা জন্মে মেয়েদের অঙ্গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে; আর নেটিব নিগার জন্মে ইংরাজ প্রভুর শ্বেতশতদলসমতুল্য সুকোমল কর-কমলের সুখ সম্পাদনে!!

তাঁতীর শোভা তাঁতখানা, দর্জ্জির শোভা সূতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে, জুতো আর গুঁতো॥

বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, বৈষ্ণবের প্রেম "নিতুই নব"; সেই নব নব প্রেমের আর ভাটা বা বিরাম নাই। সম্বাদ-পত্র পাঠ করিয়া নিতুই দেখিতেছি, সাহেবের হাতে নেটিবের প্রহারের বন্দোবস্তটা বাস্তবিকই "নিতুই নব," অথচ সকল ঘটনা সমাচার পত্রে প্রকাশ পায় না। যেখানে সম্বাদদাতা আছে, যেখানে খবরের কাগজ লিখিবাব লোক আছে, যেখানে টাকা বা সাহস আছে, সেখানকার ঘটনার মধ্যে দুই একটা ঘটনা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, নতুবা অধিকাংশ ঘটনাই গুপ্ত ও লুপ্ত হইয়া যায়। কাহাকেও বেত্রাঘাতে, কাহাকেও চপেটাঘাতে, কাহাকে ঘুসি বা কিলের আঘাতে, কাহাকে বন্দুক বা জুতার সহযোগে, কাহাকেও বা লাঠি বা গুঁতার ব্যবহারে সাহেবেরা "প্রাণান্ত" অথবা জখম করিতেছে। কোথাও কুলী হত্যা, কোথাও বাবু হত্যা, কোথাও কেরাণী হত্যা, কোথাও স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ, কোথাও জমিদারের সর্ব্বনাশ, কোথাও বা কেরাণী বা গোমস্তার গলায় জুতার মালা পরাইয়া সাহেবেরা ঘুরাইতেছে, কেবল যে রেলওয়ের বা সৈনিক বিভাগের কিম্বা চা বাগানের নিম্ন শ্রেণীর সাহেবেরা এরূপ করিতেছে, তাহা নহে, এক একটা মাজিষ্ট্রেট এবং এক একটা পুলিস সাহেবের জুলুম ও জবরদস্তীতেও বাঙ্গালীরা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে। জাহাজের ইংরাজ খালাসীই বল, আর কয়লার কারখানার মেটে ফিরিঙ্গিই বল, নেটিবকে জুতা আর গুঁতায় দোরস্ত করিতে কেহই বাকি রাখিতেছে না। অথচ আমরা একটা "জাতি" বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করি, সেই বৃথা অহঙ্কারে আকাশের দিকে

মাথা তুলি এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করি! ভায়া! তোমাদের দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদিতেছে, অথচ তোমাদের মনে একটুও ঘৃণা নাই, একটুও ক্ষোভ নাই এবং একটুও মহত্ব বা মনুষ্যত্ব নাই। জ্ঞানের আলোক, বিজ্ঞানের আলোক, রাজনীতির আলোক, গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক্ লণ্ঠনের আলোক, এ সমুদয়ই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার!!

"পর দীপমালা নগরে নগরে। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে॥"

জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি পরমহংস? আমি জানি, পাথরের মানাপমান জ্ঞান নাই, আর পরমহংসের মানাপমান জ্ঞান নাই; তোমরা নিশ্চয়ই এই দুয়ের মধ্যে একটা। যদি পাথর হও, তাহা হইলে আবার দশরথের জন্ম হওয়া আবশ্যক, আবার কৈকেয়ি কর্তৃক রামের বন গমনের আবশ্যক, কারণ আবার রাম বনে না গেলে অহল্যা পাথরের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। যদি পরমহংস হও, তাহা হইলে পরমহংসত্বেরও একটা সীমা আছে,——"যোগবাশিষ্ঠ" এ বিষয়ে কি বলেন, শ্রবণ কর——"যতি, যোগী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও পরমহংস, ইঁহারা সকলেই নিয়মের অধীন।" মুসলমানের শাস্ত্রেও সেই কথা লিখিত আছে, খৃষ্টান শাস্ত্রেও তাই। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারাও সহিষ্ণুতার একটা সীমা দেখাইয়াছিলেন; দধিচি মুনি হইয়াও "অতি সহিষ্ণুতার" প্রতিবাদ পূর্ব্বক স্বীয় শরীর হইতে অস্থি নির্গত করিয়া দিয়া যুদ্ধের জ্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না এবং সহজেই কাতরা, কিন্তু তাহারাও মাথার চুল কাটিয়া দিয়া, তরবারী ধারণ করিয়া, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, অত্যাচারের প্রতীকারে সাহায্য করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে, সহিষ্ণুতা গুণ খুব ভাল হইলেও ইহার একটা সীমা আছে; চিরখল সর্পজাতি অতীব ভয়ানক বিষধর হইলেও সাধারণতঃ সহিষ্ণু, কিন্তু ইহারও সহিষ্ণুতার সীমা দেখায়। সুতরাং ভায়া! তোমরা পরমহংস হইলেও পরমহংসত্বের একটা সীমা আছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং তীব্র বৈরাগ্যে যে ব্যক্তি পরমহংস বৃত্তির বশীভূত হয়, আমি সেই মহাপুরুষের পদতলে আমার মস্তক রাখিতে প্রস্তুত, কিন্তু আলস্য, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, জাতিবৈরীতা, নির্ব্বুদ্ধিতা অথবা চরিত্রহীনতার জন্য যে ব্যক্তি কৃত্রিম পরমহংসত্বের ভাণ করে এবং সেই ভাণের উপরে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ, ধন, মান, চরিত্র, দেশ, সমাজ ও জাতিকে পরপদে অর্পণ করিয়া বলে, "আমরা পরমহংস এবং সেই জন্যই সহিষ্ণু" অথবা "আমরা সহিষ্ণু, সেই জন্যই জুতা ও গুঁতায়

অপমান অনুভব করি না।" সেই মহাপাপীর গলায় সাত শত মণ ওজনের একটা পাথর বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলেও বোধ হয় পাপ হয় না।

আসল কথা এই, যতই পুণ্য কর, যতই সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, পুণ্যের, ধর্ম্মের এবং সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই, কিন্তু "অতি-দানে" বলী রাজার বন্ধন হয় নাই কি? মানটা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু 'অতি মানে' কৌরবকুলের দুর্গতিটা মনে পড়ে কি? সুতরাং সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে, সেই সীমার মধ্যে না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের মহত্ত্ব, একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

তোমরা নিত্য নিত্য বৃকতাড়িত মেষ-শিশুর ন্যায় তাড়িত হইতেছ, কাণ-মলার কলঙ্কে কালোমুখ আরও কালো করিতেছ, জুতার চোটে জব্দ হইতেছ, কটাক্ষেতে কাবু হইয়া যাইতেছ, বেত্রাঘাতে বিকল হইতেছ, এবং কটু বাক্যে কাঁপিয়া উঠিতেছ, অধিক কি, পাঠশালার "পোড়ো"র ন্যায় তোমাদিগকে "নাড়ু গোপালের" প্রথানুসারে কাণ ধরিয়া তোমাদের প্রভুরা তোমাদিগকে উঠাইতেছে ও বসাইতেছে, তবুও তোমাদের মনে একটুও ঘৃণা, একটুও আত্ম-মর্য্যাদা অথবা একটুও মহত্ত্ব দেখিতে পাই না। তোমরা কি একেবারেই পাথর হইয়া গিয়াছ? বোধ হয়, রোটী, গোস্‌ৎ, ডাল বা চপ্ খাইবার জন্য কোন্ দিন তোমাদিগকে লইয়া তাহারা বাটী, ঘটি, গেলাশ, পেয়ালা বা ডিস্ করিয়া তুলিবে। পাথরের ডিশ্ অথবা প্লেট্ মন্দ হয় না!! বাস্তবিকই অতি দুঃখের সহিত, কবির ভাষায় বলিতে হয়—

"রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে, আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি।
অতি উচ্চ রবে, যারে তারে কবে, ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি॥"

আবার বলি, যে জাতির প্রাণের মূল্য পাঁচ পয়সা, যে জাতির অলঙ্কারের নাম জুতা আর গুঁতা, যে জাতির সম্ভাষণের নাম ব্ল্যাগারড্ ব্ল শূকর, যে জাতির মা, মেয়ে, ভগ্নী বা ভাগ্নীর মর্য্যাদার মূল্য একটা কাণা কড়ি, যে জাতির কাণগুলা কেবল ফিরিঙ্গির হাতের খেলনা এবং পিঠটা কেবল শ্বেতহস্তের বেত্র পরীক্ষার "চাঁদমারি," সে জাতির "জাতি" বলিয়া গর্ব্ব করিবার কিছু আর আছে কি? কেবল তাহাই নহে, অন্যদিকেও একবার চাহিয়া দেখ। ঘরের একটা কোণে গুড় পড়িলে যত পিপীলিকা জমে, অথবা পল্লীগ্রামে প্রদীপের আলোকের পার্শ্বে বর্ষাকালের রাত্রে যত কীট মরে, গত ২৫ বৎসর মধ্যে

এদেশের জেলায় জেলায় প্রতি সপ্তাহে তত লোক অনাহারে (দুর্ভিক্ষে) মরিয়া গিয়াছে, অথচ তোমার আমার কথাটী কহিবার ক্ষমতা নাই। এদেশের বার্ষিক আয় ৮৬ কোটী টাকা অর্থাৎ কিছু কম এক পদ্ম টাকা !! কিন্তু "বেল পাকিলে কাকের তাহাতে কি ?" যার টাকা তার টাকা, তুমি আমি কে ? এ কি ইংলণ্ড, এ কি রুসিয়া, এ কি আমেরিকা বা ফ্রান্স যে, প্রজা-সাধারণের কথা চলিতে পারে ? তুমি যতই সম্বাদপত্র লেখ, যতই বক্তৃতা কর, যত বড়ই উচ্চ পদে আসীন হও, তোমার ভাগ্যে জুতো আর গুঁতো !!

"তাঁতীর শোভা তাঁতখানা। দর্জ্জীর শোভা সূতো ॥
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে, জুতো আর গুঁতো ॥

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কাল মধ্যে সাহেবের হাতে কত 'নেটিব নিগার' নিহত হইয়াছে, কত নেটিব নিগর আহত হইয়াছে, কত লোক অপমানিত হইয়াছে, কত লোকের অকারণে জাতি, কুল, মান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেহ কি তাহার সংখ্যা করিতে পারে ? কিন্তু যাত্রার দলে পুরুষেরা সং সাজিয়া স্ত্রীলোকের বেশে যতটুকু কৃত্রিম ক্রন্দনে আসরকে শোকাপ্লুত করে, এদেশের একটা লোকও ততটুকু কাঁদে নাই এবং কাঁদিতে শিখে নাই। কেবল তাহাই নহে, তোমাদের ঘরের অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। এখনও তোমাদের ছুঁচটি এবং আলপিনটি বিলাত হইতে আইসে, তোমাদের লিখিবার কলম, পরিবার কাপড়, পায়ের জুতা, মাথার ছাতা এবং চোখের চস্‌মা পর্য্যন্ত সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আইসে এবং (ইদানীন্তন দেখিতেছি) "মেম" স্ত্রী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আসিতেছে। সুতরাং বাহাদুরীর আর বড় বাকী নাই, অতএব তোমরা নিশ্চয়ই হিমালয় হইতেও একটা বড়—খুব বড়— জাতি ; "অত্র বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে ; মুনিরও মৌনের সীমা আছে, যোগীরও যোগের নিয়ম আছে এবং ধার্ম্মিকেরও ধর্ম্মপথের একটা সীমা আছে। পাপে ঘৃণা করিতে, অসত্য দমন করিতে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে, অত্যাচারের প্রতীকার করিতে, অরাজকত্বের প্রভাব নষ্ট করিতে এবং অবিচারের মূলোৎপাটন জন্য সাহস অবলম্বন করিতে যদি সহিষ্ণুতা নষ্ট করিতে হয়, তাহা অপরাধ বা অপকর্ম্ম নহে, তাহা নিশ্চয়ই সুকর্ম্ম এবং সেই সুকর্ম্মই ধর্ম্ম। শাস্ত্রও তাহাই বলে, যুক্তিও তাহাই সমর্থন করে। যে ছেলেটা খুব চালাক, খুব তেজী, খুব স্বাধীন প্রকৃতিক এবং খুব সত্যপরায়ণ, সেই

ছেলেটা মিথ্যাবাদী বাপের নিকট চিরদিনই ভয়ের কারণ; যে ছেলেগুলা প্রহার খাইয়া কেবল কাঁদে, আর কিছু কহেনা বা করে না, যে ছেলেগুলা কথায় কথায় গোলামী করে এবং পরাধীনত্ব, পরপদলেহনত্ব, আলস্যজাত কাপুরুষত্ব বা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ নিরীহত্ব দেখায়, সেই ছেলেগুলার উপরেই বাপ মায়ের জুলুম, জবরদস্তী, অত্যাচার, উপদ্রব ও গোলযোগ!! শক্ত ছেলের কাছে বাবা আর অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ "শক্তের তিনকুল মুক্ত!!" শক্ত ছেলের কাছে তাহার বাপ মা ভয়ে জড়সড়, কিন্তু শান্ত ছেলেকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়েও ঘুম ভাঙ্গাইয়া বাবা বলে, "বাছা! কল্‌কেটায় একবার তামাক সেজে দাওত।" ছেলে যদি তাহা করিল, অমনি বাবা আবার বলিল "বাছা! আমার চা খাবার জন্য একটু জল গরম করে দাওত?" কিন্তু শক্তের তিন কুল মুক্ত!! 'দুষ্ট ছেলে' হয় ত এ সময়ে খুব মজায় নাক ডাকাইয়া শয়ন করিয়া সুনিদ্রার সুখ-সম্ভোগ করিতেছে, কিন্তু 'শান্ত ছেলে' বাবার তামাকু সাজিতে, বড় দাদার গামোছা কাচিতে, মায়ের চা খাবার জল গরম করিতে, বড় দিদির বিছানার মশা মাছি তাড়াইতে অথবা কাহারও গা টিপিতে টিপিতে রাত্রি কাটাইয়া দিতেছে। যে শক্ত তার তিন কুল মুক্ত!! আর একটা দৃষ্টান্ত দেখ। বাবুদের আস্তাবলে যে ঘোড়াটা খুব বলবান এবং খুব দুষ্ট, সে ঘোড়াটাকে গাড়ীতে যুতিতে গেলে অমনি লাথি মারে এবং লাফাইয়া উঠে, হয়তঃ কাহাকে জখম করে। সেই ঘোড়াটার দিকেই বাবুর এবং বাবুর সহিসের খুব যত্ন এবং খুব দৃষ্টি থাকে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গাড়ী যুতিতে হইলে অথবা রাত্রি দুইটার সময় কাহারও পীড়ার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিতে হইলে, গাড়ী যুতিবার সময় বাবু বলিয়া দেন, "দেখ সহিস্! ঐ দুষ্ট ঘোড়াটাকে যুতিও না, কি জানি, অন্ধকার রাত্রে কোথায় গর্ত্তের মধ্যে বদমায়েস ঘোড়া গাড়ীখানা ফেলিয়া দিবে; তুমি ঐ সাদা রংয়ের শান্ত সুধীর ঘোড়াটাকে যুতিয়া লও।" আমরা দেখিতে পাই, বলবান্ ঘোড়াগুলা প্রায়ই বিশ্রাম পায়, সহিসও তাহাকে ভয় করে, কিন্তু শান্ত ঘোড়াগুলা ট্যাং ট্যাং কোরে সমস্ত দিন এবং প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া মরে, আর দুইশত বার চাবুক খায়। ভায়া! এতক্ষণ বুঝিলে কি, সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে—একটা ধারণা ও একটা রকম আছে। "অতি দানে" বলী রাজার বন্ধনের ন্যায় "অতি সহিষ্ণুতা" ও আমাদের বন্ধনের কারণ' ইহাই আমাদের অবনতির উপাদান। কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে কি? বুঝিতে পারিলে তোমাদের এরূপ অধোগতি

হইত না। ক্রমাগত মলমূত্রের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন মেথরের মনে মল বা মূত্রের মলিনতায় বা দুর্গন্ধে ঘৃণা বোধ হয় না, ক্রমাগত লাথি, জুতা, গুঁতা, ঘুঁশি, কিল প্রভৃতির আঘাতে এবং গালি ও কটুকাটব্য শ্রবণে তোমরা একেবারেই এমনই অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছ যে, এগুলি তোমাদের দেহের ও মনের এক প্রকার শোভাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অলংকার, এই অপূর্ব্ব শোভা তোমরা কি আর পরিত্যাগ করিতে পার? যাহা হাড়ে হাড়ে মিশিয়াছে, তাহা কি আর ছাড়া যায়? এই শোভার বাহার কত দেখ দেখি !!

নিশির শোভা শশী যেমন, শশীর শোভা তারা।
ঐরাবতের ইন্দ্রসভা, জরার শোভা মরা॥
শিখের শোভা তরবারী, পাঠান শোভা ছোরা।
সাহেব শোভা সারমেয়, কেল্লার শোভা গোরা॥
নদের শোভা রাইকিশোরী, ব্রজের শোভা শ্যাম।
ঢাকার শোভা "পাৎক্ষীর", সরযূর শোভা শ্যাম॥
অধ্যাপকের টিকি শোভা, মেকি শোভা টাকশাল।
ফাঁকির শোভা বিজ্ঞাপনে, বাকীর শোভা 'কাল॥'
তাঁতীর শোভা তাঁতখানা, দর্জ্জীর শোভা সূতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাত, জুতো আর গুঁতো।

এই জুতো আর গুঁতো যতদিন পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটে মধু হইতে মধুরতর বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে, ততদিন "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে," এবম্প্রকার দুর্ব্বিসহ দুরবস্থা হইতে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে না, ইহা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

মক্‌দুম্‌ জাঁহানীয়া

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, বিদ্যা-বিভব-সম্পন্ন ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এরূপ ভক্তি-বিশ্বাস-বৈভব সম্পন্ন ধর্ম্মবীর, এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-সমলঙ্কৃত কর্ম্মবীর, এরূপ তপঃপ্রভাবশালী তমোহীন তাপসবর এবং এরূপ জন-

হিতৈষী পরিব্রাজক ও মেধাবী মানব, ইশলামকুলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, এই গণনীয় ও বরণীয় পুরুষ ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়াও ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত সমাজে আজি পর্য্যন্ত প্রখ্যাত বা সুপরিচিত হয়েন নাই। ইংরাজি ১৯০৪ অব্দে পীড়িত শরীরে, যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, আমি পশ্চিমোত্তর প্রদেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ কনোজ নগরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। ইশলামকুলের মুখোজ্জ্বলকারী এই মহাপুরুষের গৌরব ও সৌরভের কথা তথায় শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কনোজ নগরের পার্শ্বে পরিভ্রামক মহাশয়েরা দণ্ডায়মান হইলে, যে অভ্রভেদী, অত্যুচ্চ এবং সুরম্য সৌধ দর্শন করিয়া বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধ মানবের মত কপলোপরে হস্ত রাখিতে বাধ্য হয়েন, তাহাই প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত মহাপুরুষের মহাগৌরবের স্মরণ-সৌধ। এই প্রকাণ্ড সৌধ এবং ইহার বিরাট প্রাঙ্গণ ও স্তম্ভাদি কেবল তৎকালীয় হিন্দু ও মুসলমান ভাস্করদিগের অচিন্তনীয় পারদর্শীতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু মানবগৌরব মকদুম্ জাঁহানীয়ার অমরত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই ধর্ম্ম-বীরবরের অশেষ গুণপনা ও ঐ রমণীয় অট্টালিকার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করি।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কনোজের প্রাচীন বিভব অথবা বর্ত্তমান সাময়িক অধঃপতনের কথা লইয়া আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি কেবল এই অশেষ গুণভূষণ তাপসবরের এবং তাঁহার স্মরণ-সৌধের কথা লইয়াই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের যে স্থান এক্ষণে ফতেগড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যস্থ বর্ত্তমান দুর্গের নিকটে, আনুমানিক পঞ্চশতবর্ষাধিক কাল পূর্ব্বে, একখানি সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ছিল; এই গ্রামে সেখ্ হয়দর্ নামে এক সুবিদ্বান মুসলমান বাস করিতেন। কৃষিকার্য্য, শস্যরক্ষণ এবং পৌরোহিত্য ইঁহার জীবিকা ছিল। হয়দরের একমাত্র কুলপাবন পুত্রের নাম সমসুদ্দীন। বালক সমসুদ্দীন গ্রাম্য পাঠশালার মৌলবী মহাশয়ের নিকটে কোরাণ ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। এই বালকের সুতীক্ষ্ণ মেধা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় দর্শন করিয়া শিক্ষক এবং আত্মীয়েরা হয়দরকে কহিয়াছিলেন "এই অসাধারণ বুদ্ধিমান বালক যদি রীতিমত সুশিক্ষা ও সৎসংসর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহা

হইলে পরিণামে পরমপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।” শিক্ষক, আত্মীয় ও গ্রামবাসী বিদ্বানদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উৎসাহসূচক বাক্যে উৎফুল্ল হইয়া, হয়দর তাহার সন্তানের শিক্ষার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, বালক সমসুদ্দীন উত্তরোত্তর জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, স্বাস্থ্যে ও সাত্বিকতায় সকলের সমীপে প্রীতিভাজন হইয়া উঠিতে লাগিল। আরব্য ও পারস্য ভাষায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ইশলাম-ধর্ম্মতত্বানুশীলনে সমসুদ্দীন বিশেষরূপে যত্নপর হইলেন এবং সে সময়ে তদ্বিষয়ক যে সকল প্রধান প্রধান পুস্তকাদি বর্ত্তমান ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমসুদ্দীন, তৎকালীয় প্রাজ্ঞ সমাজে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিত বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যার সরযূতটে গুলজার সা নামে এক সুপ্রসিদ্ধ দর্ব্বেশ (সন্ন্যাসী) বাস করিতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নিঃস্বার্থ জনহিতৈষণা, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান, তপঃসাধন, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির জন্য তিনি প্রায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। সমসুদ্দীন তাঁহার পিতা মাতার অনুমতি লইয়া এই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন; সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে এতাদৃশ বৈরাগ্য ও সংসার-বিরক্তির উদয় হইল যে, তিনি ঐ দর্ব্বেশের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সরযূতটে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন এবং গুরু আশ্রমে অবস্থান করিয়া তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; প্রবাদ বাক্যে শুনা যায়, পিতৃগৃহে তিনি আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। দীক্ষাকালে গুলজার সা, তাঁহার নবশিষ্য সমসুদ্দীনকে “মকতুম” এই নাম দান করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে, সমসুদ্দীন “মকতুম সা” নামেই আখ্যাত হইতেন।

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, মুর্শেদের (গুরুর) সহিত যুবক সমসুদ্দীন কাবুল, কাহান্দার প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া, গজনী নগরীতে উপনীত হয়েন এবং তথায় গুরুর তত্বাবধানে এবং কতিপয় ধনবান গৃহস্থের সহায়তায় প্রধান প্রধান ইশলামীয় পণ্ডিতদিগের নিকটে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। গুরু গুলজার সা উদরের গুরুতর দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় কিছুকাল শয্যাগত থাকিয়া ভবলীলা পরিহার করিলেন; তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গজনী নগরীর সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হইল।

দেখিতে দেখিতে, মকদুম্ সা ইশলাম সমাজের পণ্ডিত ও তাপসদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। গুরুর বিয়োগে গজনী নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি পৃথ্বী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনা গিয়াছে, সে সময়ে পরিজ্ঞাত পৃথিবী মধ্যে এমন কোন প্রয়োজনীয় দেশ বা প্রদেশ ছিল না, এমন কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত-সমাজ ছিল না, এমন কোন নৈসর্গিক শোভাসম্পদ-সম্পন্ন জনপদ অথবা মানবীয় হস্তনিসৃত কারুকার্য্য-খচিত চিত্র বিচিত্র সুসভ্য রাজ্য ছিল না, যাহা মকদুম্ সাহের আগমন, আচরণ, শিক্ষা, দীক্ষা, উপদেশ, সাধুসংসর্গ এবং সাত্বিক প্রভাবে উপস্থিত হয় নাই। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মুসলমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মকদুম্ সা সন্ন্যাসী (ফকির) বেশে সমস্ত জাঁহান্ (পৃথিবী) পরিব্রজন করিয়াছিলেন। এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না; মকদুম্ জাঁহানীয়া (বিশ্বপর্য্যটক) বলিয়া আখ্যাত ও প্রখ্যাত। শুনা যায়, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ ও তদনন্তর ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও আরব্য, পারস্য, তাতার প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ্য সমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বহুবর্ষকাল ব্যাপিয়া বসুধার বহুজনপদ ও বহুরাজ্য পর্য্যটনপূর্ব্বক, মকদুম্ জাঁহানীয়া মহাশয় পুনরায় গজনী নগরীতে আগমন করেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন পুরাতন বন্ধু গাজিমিঞাকে বোগ্দাদ নগর হইতে আনাইয়া উভয়ে ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করেন। তাঁহার প্রিয় বান্ধব গাজি মিঞা একজন সদ্বিদ্বান সন্ন্যাসী ছিলেন; উভয়ের পারস্পরিক সখ্যতা যেমন অটুট ও সুখময় ছিল, পরস্পরের পূতজীবনও তেমনি জনসাধারণের হিতকল্পে যাপিত হইত। উভয়ের হৃদয়, সঙ্কল্প ও কার্য্যকলাপ প্রায় একই উদ্দেশ্য সূত্রে গ্রথিত ছিল।

বহুশত ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক, সুদীর্ঘকাল পরে, ঐ দুই তাপসবর কাশীধামে উপনীত হইয়া প্রীতমনে বিশ্রাম লাভ করিলেন। বারাণসী নগরীর প্রান্তভাগে এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গাজিমিঞা তাঁহার আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এই আশ্রমেই অবস্থান করিবেন, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিলেন। বাস্তবিক তাঁহার মরণকাল পর্য্যন্ত গাজিমিঞা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও প্রয়াণ করেন নাই। পথিকদের মধ্যে যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রাক্কালে কাশীনগরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য গাজিমিঞার মেলা দর্শন অথবা ইহার কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এখনও কাশীর প্রত্যেক নরনারীর নিকটে গাজিমিঞার নাম গার্হস্থ্য শব্দবৎ সুপরিচিত; তাপস-

দুম মকদুম্‌সাহ, বারাণসী ধামে তাঁহার বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিদ্যা-বিভব-সম্পন্ন কনোজ নগরে গমন করিলেন। সেখানকার হিন্দু রাজারা তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, অবর্ণনীয় সাধুতা, অলৌকিক ক্ষমতা, অনন্যসাধারণ সংযম, সামর্থ্য, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কনোজ নগরে অবস্থান পূর্ব্বক তত্রত্য জনসাধারণকে আলোকিত করিতে অনুরোধ করেন; তদনুসারে মকদুম্ সাহা ঐ নগরেই জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সমভাবে ও সমাদরে তাঁহার সেবা করিতেন; হিন্দু রাজারা তাঁহাকে রাজমন্ত্রী অপেক্ষাও শতগুণে অধিকতর সম্মান দান করিতেন। অন্যান্য দেশের তুল্য কনোজ নগরেও তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ব্রহ্মোপাসনা, পরহিত, লোকশিক্ষা, ভগবৎ গুণগান, দান, ধ্যান, দুঃখীর অশ্রুমোচন, জীবে দয়া এবং পরমেশ্বরের নাম প্রচারে যাপিত করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহে রাজারা এই দিগ্বিজয়ী ব্রহ্মদর্শী প্রাজ্ঞ সাধুর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং নানা স্থান হইতে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপবেশনপূর্ব্বক প্রশান্ত মনে ও পরম সুখে সাধুর অমৃতময়ী উপদেশ কথা শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইত। মকদুম সাহকে কনোজের রাজারা "জাঁহানীয়া" (বিশ্বপর্য্যটক) এই সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, সেই হইতে মকদুম্ সা "জাহানীয়া" উপাধিতে পরিচিত। জাঁহানীয়া মহাশয় কখন বিবাহ করেন নাই, তিনি স্ত্রীজাতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে তিনি কখনই বিস্মৃত হয়েন নাই। জাঁহানীয়ার হৃদয়ের উদারতা, মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা, আত্মার পবিত্রতা, মুখের প্রিয়ভাষণ, আশ্রমের সদাচরণ, স্বভাবের সাত্ত্বিকতা এবং দেহের দেবোপম সৌন্দর্য্য তাঁহাকে প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে সম্মানিত, সমাদৃত, শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতির আস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল। ফলতঃ এরূপ পুণ্যচেতা ও সুখস্মরণীয় নামা মহাপুরুষ ইশলামকুলে সতত সুলভ নহে।

কনোজ নগরে মকদুম সাহের মৃত্যু হইলে হিন্দু রাজারা তাঁহার সমাধির উপরে একটি স্মরণ-স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অনেক বর্ষ পরে, দিল্লীর সম্রাট ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত রাশি রাশি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে কনোজ নগরের পার্শ্বদেশে যে প্রকাণ্ড স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই সন্ন্যাসী মকদুম্ জাঁহানীয়ার রমণীয় স্মরণসৌধ। এই অত্যুচ্চ ও সুন্দর সৌধ অভ্রভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে এখনও অটুট ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কত শত বৎসরের

প্রবলা ঝটিকা, মুসলধারের বৃষ্টি, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতিতেও ইহার অংশ মাত্রের ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সুদৃঢ়, মনোহর ও বিস্ময়োৎপাদক প্রকাণ্ড সৌধ দেখিবার যোগ্য; কনোজ নগরের ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। প্রস্তর-নির্ম্মিত এই আশ্চর্য্য মন্দির "মকদুম্ জাঁহানীয়া" নামেতেই প্রসিদ্ধ। ইহা বিশ্বপর্য্যটক সন্ন্যাসী মকদুম্‌কে অমর করিয়া রাখিয়াছে; পথিকেরা যখন ইহা দর্শন করেন, তখনই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়েন এবং তখনই তাঁহাদের মনোমধ্যে অশেষ গুণভূষণ মকদুম্ জাঁহানীয়ার পুণ্যময় ও সুখস্মরণীয় নামটি উদিত হইয়া থাকে। জাঁহানীয়া-সৌধের নির্ম্মাণ প্রণালী, কারুকার্য্য, সুদৃঢ়তা, বিরাট স্তম্ভাদি, মনোহর প্রাঙ্গণের প্রশস্ততা, চারিদিকের শোভনীয় পদার্থপুঞ্জের চিত্তামোদকারী দৃশ্য, দ্বার সমূহের গঠন, ভাস্কর-দিগের শিল্প-সামর্থ্য এবং বিশেষতঃ এই স্থানের পবিত্রতা, সাত্বিকতা ও গাম্ভীর্য্য পরিব্রাজকদিগকে বিস্মিত, বিনত, পৃক্ত, পুলকিত এবং পরিণামে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া তুলে। আমি চারি দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, এই মুসলমান তাপসবর অতি সুন্দর স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমি এই মহামহিমান্বিত মহাপুরুষের সুপবিত্র সৌধে দণ্ডায়মান হইয়া পুলকে কণ্টকিত-দেহ হইয়াছিলাম এবং প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে তাহার বহির্দ্দেশে আগমনপূর্ব্বক কবির ভাষায় কহিয়াছিলাম—

মায়া মুক্ত নর "শিব," মায়া যুক্ত নর "জীব"; কে বুঝিতে পারে ভবমায়া।
অজ্ঞান তাহার যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়, ব্রহ্ম যারে দেন পদছায়া॥

তমালবনের তরু।

সুখময় বসন্তের সুমধুর প্রভাতে সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে দেখিলাম, প্রকৃতিসুন্দরী নবীন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া অলিরাজকে সমাদরে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মনোমোহন ঋতুবরের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। অনতিদূরে শ্যামসলিলা পুণ্যতোয়া যমুনাতটে তমালের তপোবনে প্রেম ও ভক্তির নিকেতনস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী ভক্তাধিকভক্তগণ, বিমানবিহারী বিহঙ্গ-বর্গের বিনোদকাকলি শ্রবণ এবং নবফুল্লফুলদলের চিত্তানন্দদায়িনী সুগন্ধি আঘ্রাণ করিতে করিতে, হৃদয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সহিত শ্রীহরির পতিতপাবন

মধুর নামোচ্চারণপূর্ব্বক যমুনাকূলকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। তাম্ররসসুরভিসমতুল্য সুগন্ধিতে দিগদিগন্তামোদিত তমালবনের পার্শ্বে এক প্রবৃদ্ধ তরুবরকে দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যুগের পরে যুগ গত হইয়াছে, ঋতুর পরে ঋতু গত হইয়াছে, মাঘের পর মাঘ, জ্যৈষ্ঠের পর জ্যৈষ্ঠ এবং কত বর্ষার পরে কত অগণ্য বর্ষা বিগত হইয়া গেল, তথাপি এই প্রাচীন তরু ঐ তমালবনের সন্নিকটে অভ্রভেদী অত্যুচ্চাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া, যেন অতীত শতাব্দীর পরে অতীত শতাব্দীর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই প্রবৃদ্ধ তরুরাজ যেন যোগী বা মহাপুরুষের ঔদ্ভিদিক দৃষ্টান্তরূপে যমুনাকূলকে আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, নির্দ্দয় নিদাঘের প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডময়ূখমালার হুতাশনসম প্রভাবে, প্রাবৃটের গুরুগম্ভীর বজ্রনাদে, অথবা অবিরলজলধারায়, শীতের হিমানী, ভাদ্রের বন্যা, জ্যৈষ্ঠের করকাঘাত, কিম্বা গ্রামনগরবিধ্বংসী ঝটিকার উৎপাতে এই প্রাচীন মহীরুহবর যোগিজনোচিত সহিষ্ণুতায় এরূপভাবে অবস্থিত ছিল যে, সহসা তাহার পতন হয় নাই। একদিবস তরুবর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এই অসীম অখণ্ড বিশ্বমাঝে, এই অগণ্য প্রাণী, পদার্থ ও তরুলতার মধ্যে, আমি ক্ষুদ্র হইতে কত ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর হইতে কত ক্ষুদ্রতম! এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, প্রবৃদ্ধ ও সামর্থ্যহীন তরুর আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার শীর্ষদেশ অনন্ত আকাশকে ভেদ করিয়া এতটা উচ্চতায় উপনীত হইয়াছে যে, বিহঙ্গগণ আর উর্দ্ধশাখায় উপবেশন করিতে সম্মত হয় না; আমি পত্রবিহীন তরু অথবা কেবল শুষ্কপত্রসমাচ্ছন্ন গাছ মাত্র, সুতরাং পরিশ্রান্ত পথিকেরা আমার ছায়ায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপনোদন পূর্ব্বক শান্তিলাভে অসমর্থ। পক্ষী বা পশু আমার তলে চরে না, আমার অঙ্গের বহু অংশ কীটকুলকর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং আর এই শুষ্ক ও অসার দেহভার বহন করিয়া মাতা বসুমতীকে ভারাক্রান্ত করি কেন? আমার দ্বারা কাহারও উপকার হইয়াছে বা হইতেছে, অথবা হইতে পারে, এমন কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার অস্তিত্বে! এই অসার জীবনে কোন ফল দেখি না। অতএব মৃত্যুই এক্ষণে শ্রেয়ঃ। আমি অকারণে অভ্র-ভেদী অত্যুচ্চ তরু না হইয়া যদি ক্ষুদ্র তৃণ বা শাক হইতাম, তাহা হইলেও পশু, পক্ষী বা কোন ক্ষুধিত দরিদ্র মানবের উপকারে আসিতে পারিতাম। ধিক্ আমার জীবনে; আমার পক্ষে মরণই শ্রেয়বিধি।"

কিছু দিবস পরে, বনস্বামিমহাশয় ভৃত্যগণসহ তমালবনের পার্শ্বদেশে আগমন করিয়া আদেশ করিলেন, "এই বৃদ্ধতরুকে ছেদন কর।" সহচর ও সেবকগণ তাহাই করিল; সুতীক্ষ্ণ কুঠারের আঘাতে প্রবৃদ্ধ মহীরুহ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইয়া গেল। পতনের সময়ে তরুবর কহিয়াছিল "হায়! অসারজীবন এইরূপ অপঘাতেই বিলুপ্ত হয়। এতকাল আমি বৃথায় এই ধরাধামের এক ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিতেছিলাম। হায়! এখন সকলই শেষ হইল।"

বৃক্ষের পতন হইলে পর, ব্রজধামের ভিষককুলগণ তরুবরের রাশি রাশি বল্কল লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা এক মহৌষধি প্রস্তুতপূর্ব্বক কতকগুলি দুশ্চিকিৎস্য রোগের দমন করিয়াছিলেন, ইহাতে বহু সংখ্যক হতাশ রোগীর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তৈলব্যবসায়িগণ বৃক্ষের বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত করায় ঐ তৈল রাত্রিকালে অগণ্য লেখক, পণ্ডিত, গ্রন্থকার, সংবাদপত্র-সম্পাদক, বিদ্যার্থী, শাস্ত্রকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন রাজপথের লণ্ঠনে প্রয়োগ করিয়া নগরের অন্ধকার দূরীকৃত করা হইয়াছিল। কতকগুলি বীজ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বপন করায় ঐ বীজ পরিণামে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ বৃক্ষে পরিণত হইয়া বৃন্দাবনের শোভাবর্দ্ধন এবং ব্রজধামকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। নগরের বদান্য ও ধনবান লোকেরা বৃক্ষের পত্রে বিবিধ পাত্র প্রস্তুত করিয়া অসংখ্য অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক, দরিদ্র ও ভিক্ষুককে পরিতৃপ্তি সহকারে ঐ পাত্রসমূহে অন্নাদি ভোজন করাইয়াছিল। সুগন্ধি দ্রব্যের বণিকগণ তরুবরের মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কয়েক প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা বিক্রয় দ্বারা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গাছের কাষ্ঠে কত গৃহস্থের অন্নপাক, কত ঋত্বিকের "হোম" ক্রিয়াসমাধান, কত রেলওয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার এবং কত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। টেবিল, চেয়ার, নৌকা, আলমায়রা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায়ীরা বহু অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়াছিল। খাট-পালঙ্ক ইত্যাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রোগী, বৃদ্ধ, শিশু, রাজা, ধনী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা শয্যারূপে তাহা ব্যবহার করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। দেশের রাজা গাছের কাষ্ঠরাশি দ্বারা দুইখানি সুবৃহৎ তরণী তৈয়ার করাইয়া রাজ্যের যে পরমোপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার যোগ্য। একখানি জাহাজ রণতরীরূপে

ব্যবহৃত হইয়া বিদেশীয় শত্রু হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিত এবং আর একখানি জাহাজের সহায়তায় স্বদেশ হইতে বিদেশে ও বিদেশ হইতে স্বদেশে অগণ্য বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ ও আনয়ন করায় জাতীয় ধনের বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সুখস্বচ্ছন্দতার বর্দ্ধন হইয়াছিল। এই পতিত, প্রবৃদ্ধ ও মৃত তরুবর জীবিতাবস্থায় যে ঝটিকার আশঙ্কা করিত, তাহারই কাষ্ঠে নির্ম্মিত উপরি উক্ত দুইখানি তরণী কত বিশাল সাগরের ভয়ঙ্করী উর্ম্মিমালা, কত শত্রুসেনার তোপের আক্রমণ, কত জলচর জন্তুর বিকট নিনাদ, কত ঋতুর শৈত্য, উষ্ণতা, করকাঘাত ও প্রবল বর্ষাকে তুচ্ছ করিয়া বীরদাপে গমনাগমন পূর্ব্বক নিজের অসাধারণ সামর্থ্য ঘোষিত করিয়াছে। এখন বুঝিলাম, বৃক্ষ যতদিন জীবিত থাকিয়া কেবল নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিত, আত্মমর্য্যাদাহীন হইয়া কেবল জীবনকে অসার ও অপদার্থ ভাবিত, এবং স্বকীয় স্বার্থ ব্যতীত অপরের বা পৃথিবীর কোন উপকারেই আসিত না, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার জীবন বাস্তবিক মরণের সমতুল্য ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার জীবন বাস্তবিক স্বার্থে পরিপূর্ণ থাকিয়া অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ইহার মৃত্যুতে ইহার প্রকৃত নবজীবন আরম্ভ হইল; স্বার্থত্যাগ করিয়া আত্মোৎসর্গ দ্বারা ইহার মৃত্যু ধন্যাদপি ধন্য হইয়া উঠিল; মৃত্যুই ইহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে; মৃত্যুই ইহাকে পৃথিবীর লোকের নিকট পরমোপকারী সখা বলিয়া সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, কিয়দ্দিবস মধ্যে তমালবনের ঐ প্রবৃদ্ধ তরুবরের পরমাত্মা আগমন করিয়া নগরবাসীর শিক্ষা ও চৈতন্য জন্য অতীব চীৎকার করিয়া নাকি কহিয়াছিল—"বলিদানেই নবজীবনের আরম্ভ—Self-sacrifice is the beginning of usefulness." অহো! দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, আত্মার মঙ্গলের কারণ মৃত্যু কি সুখকর! কি শান্তিময়! যেখানে আত্মোৎসর্গ, যেখানে মৃত্যুতে ভয়হীনতা, যেখানে পরের কল্যাণ জন্য স্বার্থত্যাগ, সেইখানেই স্বর্গ, সেই স্থানেই সুখ ও শান্তি। আপনা ভুলিয়া যে ব্যক্তি পরকে ভালবাসিতে না শিখিয়াছে, সে পশু অপেক্ষাও অধম। স্বার্থের বলিদানেই স্বর্গের সুবর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়; ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আইস, আমরা ঐ মৃততরুকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, উহার পতনক্রিয়া হইতে পরোপকার নামক পরমধর্ম্মকে শিখিয়া লই। নিষ্কামধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দ্বারা মানব-জীবনকে সার্থক করি। মানব-জীবনকে মর্য্যাদাহীন বা প্রয়োজনীয়তা-হীন বলিয়া যেন কখন না ভাবি।

দেখিয়াছ কি, যব গোধূম ইত্যাদি মরিয়া ও পচিয়া না গেলে তাহা অঙ্কুরিত ও গাছরূপে পরিণত হয় না? A barley sprouts when the seeds die and rot. ইহা মহামতি যিশুখৃষ্ট ও মহাসাধু পলের দৈববাণী। মৃত রক্তবীজের দেহস্থ শোণিতের এক একটা বিন্দু হইতে এক একটা রক্তবীজ জন্মগ্রহণ করিত; পুরুভুজকে যত কাটা যায়, ততই পুরুভুজ জন্মে; জীবিতাবস্থায় একটা রক্তবীজ ও একটা পুরুভুজ ভিন্ন অধিক পাওয়া যায় না, সুতরাং মৃত্যুই নবজীবনের সূত্রপাত। যাঁহারা স্বর্গলোক ও নরকলোকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জানা উচিত, মৃত্যু না হইলে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয় না; মৃত্যু না হইলে সারূপ্য, সাযুজ্য, সামীপ্য প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গসুখ ভোগ করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা আত্মোৎসর্গের মন্ত্রঋষি, তাঁহাদের পক্ষে ইহকালেও স্বর্গ এবং পরকালেও স্বর্গসুখ বিদ্যমান; এরূপ মহাপুরুষের পবিত্র শ্রীচরণে আমার অধম মস্তক শত কোটিবার অবনত হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত। এরূপ মহাপুরুষেরা মানবরূপে দেবতা; ইঁহারা এই দুঃখময় সংসার-অরণ্যে ফুটন্ত একটি মহাসুন্দর গোলাপকুসুমতুল্য। গোলাপফুল জীবিতাবস্থাতেও জগতের চিত্ত বিনোদিনী সুগন্ধি দ্বারা আমোদিত করে এবং শুকাইয়া গেলেও ইহার সুগন্ধি কমে না, বরং অধিকতর মনোমোহন হইয়া উঠে। ইহাকে তরল জলে পরিণত করিলেও "গোলাপ জল" হয়, তাহা আরও মনোহর; তৈলরূপে পরিণত করিলে "আতর" হইয়া উঠে, ইহা রাজাধিরাজের সেব্য; খাদ্যরূপে পরিণত করিলে "গুলকন্দ" হয়, তাহা আরও মূল্যবান এবং সম্রাটসমতুল্য মানবের সুবর্ণপাত্রে ভোজনযোগ্য হইয়া উঠে। যাঁহারা নিষ্কামপরোপকার নামক পরমধর্ম্মকে পালন করেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেও মহান্ এবং মরিলেও মহান্ ও মূল্যবান। মহাপুরুষের কি মৃত্যু আছে? নিষ্কামধর্ম্মের নামই মহাপৌরুষত্ব। ইঁহারা গোপনে কার্য্য করিলেও, অনন্ত আকাশের মধ্য হইতে দিনমণি তাহা লোকশিক্ষার জন্য পূর্ণালোকে প্রকাশিত করিয়া দেন। পরোপকারীর গৌরব ও সৌরভের বিঘ্ন করিতে পারে, এমন সামর্থ্যশালী লোক এখনও পৃথিবীতে জন্মে নাই। যিনি প্রকৃত কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও দানবীর, পৃথিবী তাঁহার যতই বৈরী হয়, তিনি ততই উচ্চসীমায় উঠিতে থাকেন, নিন্দাকারী অবশেষে হতাশ হইয়া মরে, কিন্তু সেই চিরজীবী মহাত্মা নিত্য অমররূপে বিদ্যমান থাকেন। পৃথিবীর এতটুকু গৌরব ও পুণ্য না থাকিলে, পৃথিবী এতদিনে শ্মশানভূমি হইয়া রসাতলে ডুবিয়া যাইত। প্রকৃত স্বার্থত্যাগী, প্রকৃত নিষ্কামধর্ম্মপালনকারী কর্ম্মবীর

ও ধর্ম্মবীরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে বা তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিন্দিত করিতে পারে, এমন সামর্থ্য দেবতারও হয় না, মানুষের পক্ষে হওয়া অসম্ভব হইতেও অসম্ভবতর।

বুঝিলাম, উপনিষদকারগণ যথার্থই কহিয়াছেন "মৃত্যুই অনন্ত জীবন লাভের উপায়।" না মরিলে মোক্ষ নাই। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "There is no remission without shedding of blood. No salvation except through death." রক্তপাত ভিন্ন পরিত্রাণ নাই। বলিদান ভিন্ন উদ্ধার নাই। জগতের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি, যেখানে মরণ নাই, সেখানে জীবন নাই। সম্পূর্ণরূপে পাপে মৃত হইলে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধি হইলে, তবে মনুষ্য প্রকৃত পুণ্যবান ও ধার্ম্মিক হয়—One must be exclusively dead to sin before he desires to enter into life eternal—সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপরতায় মৃত (মুক্ত) না হইলে স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত উন্নতিসাধনার্থ কেহই নবজীবন পাইতে পারে না। এইজন্যই য়িহুদী-দিগের মন্দিরে বলিদানের সৃষ্টি; এই উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের কোর্ব্বাণীপ্রথার উৎপত্তি; এবং এই জন্যই হিন্দুর দেবীমন্দিরে বলি হয় এবং গ্রহাচার্য্যগণ কর্তৃক "ফাঁড়া কাটা"-স্থলে পশু পক্ষীর বলির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই, সম্পূর্ণরূপে মরিতে শিক্ষা করিতে হইবে, তবে সেই মরণ হইতে জীবনের উৎপাদন সম্ভব। প্রাণের মমতা, স্বার্থের লোভ, সংসারে অনিত্যসুখের মোহ প্রভৃতি না ছাড়িলে পুণ্য নাই, শান্তি নাই, জীবন নাই, ইহা ধ্রুবসত্য। ম্যাট্‌সিনি, শিবজি, গুরু নানক, মার্টিন লুথর, শ্রীচৈতন্য, গুরু গোবিন্দ, লাফায়েৎ, প্রভৃতি অসংখ্য ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মবীর মরিতে শিখিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহাদের পুণ্যময় নামে শুষ্কতরু সজীব হয়, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হয় এবং সুষুপ্তগণ জাগ্রত হইয়া উঠে। তাঁহাদের পবিত্র নামের এক একটা অক্ষর, মন্ত্রের সমতুল্য ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ।

মহাভারতের দধীচিঋষি নিজে আত্মবলিদান দিয়া মৃত্যুর উপকারিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। অসুরগণ (অর্থাৎ অনার্য্যগণ) যখন দেবতাগণকে (আর্য্যগণকে) প্রাচীনযুগে নির্যাতন করিত, যখন তাহাদের অন্যায় অত্যাচারে প্রজার সুখশান্তি, ধর্ম্মের যাজন, ন্যায়ের গৌরব এবং তপস্বীদিগের উপাসনা ভঙ্গ হইয়া যাইত, তখন ভগবান্ কহিয়াছিলেন "হে আর্য্যগণ! তোমরা দধীচি-

মুনির পৃষ্ঠদেশস্থ অস্থিতে বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ কর, ঐ যুদ্ধে অনার্য্যগণ পরাজিত হইয়া নিশ্চয়ই পদানত হইবে।" আর্য্যেরা দধীচিকে কহিলেন "হে মহানুভব! আপনার মেরুদণ্ডের অস্থির দ্বারা অস্ত্র নির্ম্মিত না হইলে অসুরের দমন হইবে না, ইহা ব্রহ্মবাক্য।" এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-মুখে ঋষিবর দধীচি বলিলেন "এমন সৌভাগ্য আমার কি হবে! আমার এই জরাজীর্ণ অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধদেহের অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া যদি অসুরের দমন, অত্যাচারের নাশ, ধর্ম্মের রক্ষা এবং পৃথিবীর নির্ভয়ত্ব হয়, তাহা হইলে আমার দেহধারণ এবং জীবনযাপন ধন্য! আহা, আমার মরণ কি সুখকর!" এই বলিয়া সেই জীবিত ঋষি হাসিতে হাসিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অস্থি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিলেন। ঋষির মৃত্যু হইল। কিন্তু সেই মৃত্যু ভারতে নব-জীবন সঞ্চার করিয়া দিয়াছে।

এইরূপে যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, যে বিষয় লইয়াই চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে মৃত্যুই নূতন জীবন ও নবীন সামর্থ্যের মহামন্ত্র ও মহামূল। সম্পূর্ণ-রূপে পাপে মৃত (মুক্ত) হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার পরে বৈরাগ্য, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, বিলাসবর্জ্জন, কত কষ্ট, কত সহিষ্ণুতা, কত ত্যাগস্বীকার করিলে তবে মানবেরা ধর্ম্মপথে (মোক্ষের পথে) অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। এবম্প্র-কারে সকল বিষয়েই মরণের প্রয়োজন। স্বার্থপরতার নাম পতন, স্বার্থবর্জ্জ-নের নাম উত্থান। প্রাচীন ভারত মরিতে জানিত, মরিতে শিখিয়াছিল; হাসিতে হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে পারিত বলিয়াই ভারত এখনও বিনষ্ট হয় নাই, এখনও পৃথিবীর মানচিত্র হইতে সে নাম বিলুপ্ত হয় নাই। আইস, আমরা নিষ্কামধর্ম্ম পালন করিয়া মরিতে শিখি।

অজয় সর্দ্দার।

(বঙ্গের অসাধারণ দস্যুবীর।)

অজয় সর্দ্দার বঙ্গদেশের একজন অত্যদ্ভুত মানুষ। ইহার জীবিতকালে, সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুরে ইহার সমতুল্য ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়া আমরা পাঠ বা শ্রবণ করি নাই। ইহার অসংখ্য মহা-দোষ ছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু এই অসাধারণ মানুষ একেবারেই গুণবর্জ্জিত

ছিল না। পৃথিবীর কোন পদার্থ এবং কোন জীব, একেবারে গুণহীণ বা অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না; গুণহীনের আদৌ সৃষ্টি হয় না, ইহাই প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম। দোষ-গুণের বিচার করিতে হইলে, নিরপেক্ষভাবে কহা যায়, অজয় সর্দ্দার বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির এক অপূর্ব্ব পুরুষ; দুঃখের বিষয়, অনেকে হয়তঃ ইহার নাম আদৌ শ্রবণ করেন নাই। ইহার সমসাময়িক লোক এখনও বোধ হয় দুই একজন জীবিত আছেন। অজয়ের সমসাময়িক সমাজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গিয়াছে; এখন নূতন সমাজ, নূতন মানুষ, নূতন প্রকৃতি ও নবীন প্রবৃত্তি দ্বারা বঙ্গদেশ পরিচালিত হইতেছে। অজয়ের সময়ে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ছিল না, সুতরাং তৎসাময়িক অসাধারণ মানুষদিগের নামও অনেকে পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই। বলা বাহুল্য, এক সময়ে এই অসাধারণ অজয়ের প্রতাপে একঘাটে বাঘে ও ছাগে নির্ব্বিবাদে ও নির্ভয়ে জলপান করিত; জমিদারেরা সশঙ্কিত হইয়া সেলামদ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিত; পুলিশ ও হাকিমেরা ঘোরতর ভয়ে ও উদ্বেগে শশব্যস্ত থাকিত এবং ধনবান্ আড়ৎদার ও মহাজনেরা করযোড়ে তাহার নিকট অভয় প্রার্থনা করিত। সুদূর ও দুর্গম পথগামী পথিকের সঙ্গে টাকা বা স্বর্ণ রৌপ্যাদি থাকিলে, "ত্রাহি মধুসূদন" "ত্রাহি মধুসূদন" স্মরণ করিয়া তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে পথাতিক্রম করিত। সদ্গোপজাতীয় অজয় সর্দ্দারের নামে ও হুঙ্কারে একদিকে যেমন গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত, অপরদিকে তেমনি অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারের লৌহদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরাশায়ী হইত। পাঠকেরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই অত্যদ্ভুত লোকটা কে? ইহার নিবাস কোথায় এবং কি কারণে এই ব্যক্তি অত্যদ্ভুত বলিয়া গণ্য? এই কথাগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া অজয় সর্দ্দারের ক্ষমতা, প্রতাপ, প্রভুত্ব, সাহস, বীরত্ব এবং দোষ ও গুণ বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু অজয়ের অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রসঙ্গান্তরভাবে অনেক কথার অবতারণা ও আলোচনা করিতে হইবে, তজ্জন্য পাঠকের সহিষ্ণুতাগুণের উপর নির্ভর করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এস্থলে প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই মায়ামুগ্ধ অনিত্য ও অসার সংসার ধামে, ক্ষণভঙ্গুর জীবনধারী মানবজাতি কেবল দুইটি কারণে প্রখ্যাতি লাভ করে; প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আর তৃতীয় পন্থা নাই। অত্যন্ত সৎগুণে (অর্থাৎ দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যা, পরোপকার, দেশহিতৈষিতা, বদান্যতা প্রভৃতি পুণ্য-

অন্য কর্ম্মে) মানুষেরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়, আবার অতুলনীয় অপরাধ বা দুষ্টতার জন্যও মনেবেরা প্রখ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। ইতিহাস ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা মহানুভব, সুযোগ্য বা মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাও অত্যদ্ভুত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সম্রাট নিরো, হেরড, জগাই মাধাই, রাজা কংস, জরাসন্ধ, রাবণ, ডাকাইত রবার্ট রডিয়র, লেডি ম্যাকবেথ, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি শেষ পন্থার দৃষ্টান্ত। মহানুভব শ্রেণীর নরনারীর যে সকল বরণীয় গুণ থাকে, অজয় সর্দারের তাহা একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু গুণের বীজ, সাধন অভাবে কখন বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া সুফল ধারণ করে নাই। বরং বিকৃতাবস্থায় ও ভ্রষ্টদিকে সূচিত হইয়াছিল, এইজন্য সে ব্যক্তি দস্যু, তস্কর, ইত্যাদি অপ-উপাধিতে খ্যাত। সে কথা পরে বলিব।

সম্প্রতি লর্ড কর্জ্জন কর্তৃক বঙ্গের যে অনাবশ্যক অঙ্গচ্ছেদ এবং তদানুষঙ্গিক ব্যাপার সমূহ লইয়া বঙ্গদেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিশ বা পয়ত্রিশ বর্ষাধিককাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এইরূপ একটা অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে এত আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। কারণ, তখনকার অঙ্গচ্ছেদ হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বাকুড়া এই কয়েকটা জেলা লইয়াই সংঘটিত হইয়াছিল। এক জেলার নানাস্থান অন্য জেলায় সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এতদুপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলার সুপ্রসিদ্ধ বুদ্‌বুদ্ মহকুমা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বুদ্‌বুদ্ সবডিবিজনের সর্ব্বশেষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ। বীরভূম জেলান্তর্গত রাইপুর-সুপুর নামক সুপরিচিত গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদার বংশে প্রতাপবাবুর জন্ম। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট-জেনেরল মিষ্টর এস্, পি, সিংহ; সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক (ডাক্তার) মেজর এন্, সিংহ; এম্ ডি; আই, এম্, এস্; কলিকাতা পুলিশের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর ব্রহ্মপ্রসাদ বাবু; সিউড়ির সরকারী উকিল বাবু রমাপ্রসন্ন, এম্, এ, বি, এল; ময়ূরভঞ্জ-মহারাজার সহকারী দেওয়ান ও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, বি, এ; কলিকাতার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স কলেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় লোক, রাইপুর-সুপুরের বাবুদের বাটীর লোক। প্রতাপবাবু বহু দিনের পুরাতন ডেপুটী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বিনয়ী, সদাচারী, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন; এজন্য

লোকে বলিত "এমন লোকের ডেপুটিগিরি করা সাজে না।" কিন্তু প্রতাপবাবু এমন নিরীহ ভদ্রলোক হইয়াও মানকর, গুস্করা, বুদ্‌বুদ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দস্যু ও ডাকাইতগণকে বিশেষরূপে দমন করিয়া গিয়াছেন। তখন এতদঞ্চলে অজয় সর্দ্দারের কনিষ্ঠ সহোদর অভয় সর্দ্দারের "রাজত্ব" ছিল, অর্থাৎ এখানে সেই ব্যক্তিই ডাকাইত ও দস্যুদলের সর্দ্দার ছিল। প্রতাপবাবু অভয়কে দমন করিতে পারেন নাই; কিন্তু অভয়ের অনেক প্রবল শিষ্য ও প্রশিষ্যকে দমন করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে বর্দ্ধমান জেলার আর একটা মহকুমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ, প্রশস্ত ও পুরাতন মহকুমার নাম জাহানাবাদ। সে সময়ে এই মহকুমা দস্যুতা, রাহাজানী ও ডাকাইতির সর্ব্বপ্রধান আড্ডা ছিল। একটা স্থানে একটু গুড় ফেলিয়া দিলে যতগুলা পিপীলিকা একত্রিত হয়, জাহানাবাদ অঞ্চলে তখন এতগুলা দস্যু, ডাকাইত, লাঠিয়াল, রাহাজান, তস্কর প্রভৃতি বাস করিত। অরণ্যবিচারক মৃগপালের ন্যায় দস্যুরা দলে দলে বিচরণ করিত। ভয়ে লোকেরা রীতিমত শ্বাস প্রশ্বাসের সময় পাইত না। সে সময়ে রাঢ় অঞ্চলে, অর্থাৎ হাবড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় যত দস্যু ছিল, সমস্ত বঙ্গদেশে তাহা ছিল না। অজয় সদ্গোপ ইহাদের প্রধান পুরুষ। জাহানাবাদ মহকুমাকে উঠাইয়া দিলে দস্যু ও দস্যুতার সংখ্যা আরও অধিক হইবে, এই চিন্তায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট জাহানাবাদ সব্‌ডিবিজান উঠাইয়া না দিয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত করিয়া দিলেন। বেহার প্রদেশের গয়া জেলার অধীনে একটা বিস্তৃত মহকুমা ছিল এবং এখনও আছে, তাহারও নাম জাহানাবাদ; এক শাসনকর্ত্তার অধীনে দুইটা মহকুমার এক নাম থাকায়, নানা প্রকারের গোলযোগ উপস্থিত হয় বলিয়া, হুগলী জেলার জাহানাবাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম দেওয়া হইল, নূতন নামটী "আরাম বাগ"। যাহা হউক, জাহানাবাদ (আরাম বাগ) শাসনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সে সময়কার ভাল ভাল ডেপুটী ও সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে তথায় পাঠাইতে লাগিলেন। অনরেবল্ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, নবাব আবদুল লতিফ খাঁ, বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এবং দয়ানিধি সিং, কমীরুদ্দীন মিয়া, সেখ বকাউল্লা * প্রভৃতি

* কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী ফজ্‌লল্ করিমের ইনি পিতা।—লেখক।

বিখ্যাত পুলিশ ইনেস্পক্টরগণ জাহানাবাদ অঞ্চলে এই জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে দস্যুতার দমন হইয়াছিল; কিন্তু জাহানাবাদের অপবাদ কখনই ঘুচে নাই, এবং এখনও সেই অপবাদ অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে। জাহানাবাদ অঞ্চলে তখন অনেক স্থান ভয়ঙ্কর ছিল; শেষ রাত্রে (অর্থাৎ ৩টা হইতে প্রভাত ৪৷৷৹ টা পর্য্যন্ত) এবং মধ্যাহ্নকালে ও সায়াহ্নে (গোধূলি সময়ে) দস্যুরা পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত এবং হত্যাও করিত। বাহকস্কন্ধস্থিত পাল্কীকেও আক্রমণ করিতে ভীত হইত না; "যাত্রী"র দলকে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। তখন পুরীধামে যাইবার পথে রেল ছিল না; সেই পুরাতন গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড দিয়া দলে দলে তীর্থযাত্রীরা গমনাগমন করিত, সুবিধা হইলে তাহাদিগকেও দস্যুরা হৃত-সর্ব্বস্ব করিয়া দিত। তদ্ভিন্ন রাত্রিকালের ডাকাইতির ত কথাই নাই। এই সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার কর্ত্তা ছিল—অজয় সর্দ্দার। অনেক সময়ে অজয় নিজে দস্যুতা করিতে যাইত না, কিন্তু অজয়ের শিষ্য ও প্রশিষ্য না থাকিলে বড় বড় ডাকাইতি বা রাহাজানী হইত না। অজয়ের অংশ অজয় প্রাপ্ত হইত। সে সময়ে অনেক জমিদার বড় বড় ডাকাইতি ও দস্যুকে পালন করিত; কেহ কেহ অতি অল্প মূল্যে বহুমূল্যের ডাকাইতি মাল খরিদ করিয়া লইত। তখনকার অথবা তৎপূর্ব্বকালের অনেক লোক এইরূপ ব্যবসায়ে তালুকদার, জমিদার অথবা ধনবান গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে। জাহানাবাদ অঞ্চলে এখনও অনেক ভয়ঙ্কর মাঠ এবং ভয়ঙ্কর স্থান আছে। কিন্তু দস্যু ও দস্যুতার সংখ্যা এমন কম। প্রায় পাঁচ ক্রোশ ছয় ক্রোশ ব্যাপী স্থান সমূহ লইয়া এক একটী থানা এবং তাহার অধীনে চারি শত পাঁচ শত গ্রাম থাকিত। স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর পথের নিকটে বা পার্শ্বে ছোট ছোট ফাঁড়ি বসান ছিল; ফাঁড়িতে ফাঁড়িদার, দুই একটা বরকন্দাজ ও কখন কখন গ্রামের চৌকীদার হাজির থাকিত। ফাঁড়িদারেরা অনেক সময়ে উপস্থিত থাকিত না; ফাঁড়িগুলাও বন্ধ থাকিত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বা ডেপুটী সাহেবের আগমন সমাচার ঘোষিত হইলে ফাঁড়িদারেরা সভয়ে ফাঁড়ি খুলিয়া রাখিত, নতুবা এই সকল মূর্খ ও সামান্য বেতনভোগী লোকেরা কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিত না। ফাঁড়িদারদের সহিত দস্যু ও ডাকাইতদিগের সদ্ভাব ছিল, অনেক স্থানে ফাঁড়িদারেরাই দস্যুতা করিত। অন্য কেহ দস্যুতা করিলে ফাঁড়িদারেরা অংশ পাইত, সুতরাং রক্ষকগণ ভক্ষকরূপে বিরাজ করিত। আবার অনেক পুলিশ দারোগাও, ফাঁড়িদার বা দস্যুদলপতিগণের নিকট হইতে

টাকার ভাগ পাইত। ফাঁড়ি ঘরের কাছে প্রায় লোকালয় থাকিত না; অনেক দূরে গ্রাম দেখা যাইত। সে সময়ে রাঢ় অঞ্চলে যে সকল প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল, তাহাদের নামের তালিকা দিতে গেলে একটা বিপুলাকার "খাতা" পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নিম্নে কয়েকটা বিখ্যাত লাঠিয়াল, রাহাজান, দস্যু ও ডাকাইতের নাম দিলাম। তদ্যথা—পলাশন গ্রামবাসী ঈশ্বর বাগ্দী, বৈনান নিবাসী অতো (অতুল ?) দুলে, জনাই-বক্সা অঞ্চলের মন্তলা ফকির ও কমলসেথ, বিজড়ে গ্রামের সনাতন সদ্গোপ, ডুবলগাছির মধু হাড়ি, চা গ্রাম বা চাঁইগাঁয়ের বীরে (বীরেশ্বর ?) সর্দ্দার, কর্জ্জনা অঞ্চলের স্বরূপ ঝুরী (গোয়ালা), দিগ্‌ড়ে গ্রামের জনার্দ্দন ডোম, বোঁয়াই গ্রামের কানাই বাউরী, মনসারাম ও রতনরাম, তিরোল গ্রামের সাইতে চক্রবর্ত্তী, ওড়্‌গাঁয়ের ডাঙ্গার দিগম্বর চক্রবর্ত্তী, ঘুঘুডাঙ্গা খালের কৈলাস চাষা, তারকেশ্বর অঞ্চলের জগাই বাগ্দী, বাঁকুড়ার বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলের সীতারাম মুচী, কোতলপুর, গোঘাট ও সোণামুখী অঞ্চলের উমেশ, পাঁচু এবং যদু সর্দ্দার, হাওড়ার অধীনে গড়ভবানীপুরের মাঠের বিখ্যাত বিনোদ রুহিৎ, মেদনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলের কেশব দুলে, বর্দ্ধমানের পরাণ বাগ্দী প্রভৃতি কত লোকের নাম লিখিব ? রাঢ় অঞ্চলের বড় বড় দস্যুরা যে সকল স্থলে "আড্ডা" "ঝোপ" ও "ঘাত" রাখিত, তাহার সংখ্যাও কম নহে। সংক্ষেপে কয়েকটা স্থানের নামোল্লেখ করিলাম। কর্জ্জনার মাঠ, ভাগবৎখাঁয়ের দীঘী, গুগুনদীঘী, বুজুরদীঘী, উচালনের দীঘী, মায়াপুরের দীঘী, জাম্‌না, দামোদরের সদরঘাট, সুপুরের মাঠ, গর্দ্দানমারা দীঘী, ঘুঘুডাঙ্গার খাল, কোতলপুর যাইবার পথে সোণামুখীর মাঠ, গোঘাটের রাস্তা, সুরপুরের চটান, রৈয়ৎপুরের মাঠ, হরিণ-খালীর নালা, সৌদারীর মাঠ, দামোদর নদের থড়েবন, জুব্‌লের মাঠ, ইত্যাদি।

রাঢ় অঞ্চলের দস্যু ও ডাকাইতদিগের একটা আশ্চর্য্য নিয়ম ছিল। তাহারা কখন চুরি বা প্রবঞ্চনা করিত না। চুরি বা সিঁদ দেওয়া প্রথাকে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিত। কাহাকে ঠকাইয়া তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত না। বলপূর্ব্বক ডাকাইতি বা রাহাজানী করিয়া বাহাদুরী দেখাইত; কাপুরুষ তস্কর বা সিঁদচোরের বৃত্তি অবলম্বন করিত না। অজয়সর্দ্দারের দলের লোকদিগেরও তাহাই অকাট্য নিয়ম ছিল। অজয়ের জীবনঘটিত কাহিনী সমূহ বর্ণনা করিতে গেলে একমাসের লেখনীপরিচালনে তাহা সমাপ্ত হয় না। যে ঘটনায় অজয় সর্দ্দার গ্রেপ্তার হইয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, সেই

অদ্ভুত কাহিনীমাত্র এস্থলে বিবৃত করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই অত্যদ্ভুত ঘটনা—এই মহাভয়োৎপাদক ঘটনা—দস্যুদিগের ইতিহাসে প্রায় বিরল। এই ঘটনাসম্বন্ধে পুলিশ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যতৎপরতা, দারোগার দুষ্টতা, ঠগীর বিচার, অজয়ের প্রাণদণ্ড এবং ভ্রাতা অভয়সর্দ্দারের পরিণাম ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিতেছি।

এইবারে আমি অজয়সর্দ্দারের সেই বিখ্যাত মোকর্দ্দমাঘটিত ব্যাপারসমূহ উল্লেখ করিয়া পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই মোকর্দ্দমার বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক পাঠকের দেহ রোমাঞ্চিত হইতে পারে। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না; অজয়ের জীবনে এরূপ ঘটনা একটিমাত্র ঘটিয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে সেই বিখ্যাত মোকর্দ্দমা ও সেই লোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিব।

দ্বারকেশ্বর নামক নদতটে জাহানাবাদ উপনগর অবস্থিত। দ্বারকেশ্বর পার হইয়া গেলে বালীদেওয়ানগঞ্জ নামে এক গণ্ডগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার তিন ক্রোশ অন্তরে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "গড়মান্দারণ" গ্রাম। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে গড়মান্দারণ পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের চাকুরী করিবার সময়, গড়মান্দারণের মোগল-পাঠান-যুদ্ধ-ঘটনা হইতে দুর্গেশনন্দিনীর মূল বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গড়মান্দারণ এক্ষণে ভগ্নাবশেষে পরিণত, ইহারই সামান্য দূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, তথায় হীরারাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। হীরারামের প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে পর, হীরারাম কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে থাকেন। মাসিক দ্বাদশমুদ্রা বেতনের একটা সামান্য চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া হীরারাম শ্যামবাজারে বাস করিতে লাগিলেন। তিলিজাতীয় একজন ধনবান আড়ৎদার ও মহাজনের গদিতে হীরারামের চাকুরী ছিল; বেতন ব্যতীত অন্যোপায়েও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন। তখন ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না; পল্লীগ্রাম হইতে চিঠিপত্র আসিতে সুদীর্ঘ বিলম্ব হইত। এখন অনেক স্থানে রেলওয়ে লাইন দৃষ্ট হইয়া থাকে; তখন মূল ইষ্টইণ্ডিয়া রেললাইন ব্যতীত রাঢ় অঞ্চলে আর কোন রেল বা ট্রামের বান্দাবস্ত ছিল না। যাহা হউক, প্রায় দেড়বর্ষকাল পরে, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি পত্র পাঠে জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের

বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ ; পিতা লিখিতেছেন,—"প্রিয় হীরারাম, তোমার সহধর্ম্মিণী বিগতা হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তোমার পুনরায় বিবাহ করিবার বয়স এখনও যায় নাই। তুমি যুবাপুরুষ, বিশেষতঃ পুত্রকন্যা নাই, বংশরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন আমি এবং তোমার মাতা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, অতএব তোমার পুনরায় বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক। পৈত্রিক বাস্তুভিটায় সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিবার জন্যও একজন বংশধর থাকা প্রয়োজন। যাহা হউক, আগামী ১৭ই আষাঢ় তারিখে শুভলগ্নে তোমার বিবাহ হইবে, তুমি অন্ততঃ ১১ই আষাঢ় দিবসের পূর্ব্বে বাটীতে নিশ্চয় পৌঁছিবে। বিবাহের সমুদয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, দিন পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না ; যত টাকা আনিতে পার, আনিও।"

যথাসময়ে হীরারামের পিতার পত্র হীরারামের হস্তগত হইয়াছিল। পত্র পাইবার দুই তিনি দিন পরে হীরারাম তিনশত কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করিয়া জন্মভূমি-অভিমুখে রওনা হইলেন। বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের নিকট দোকানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক প্রত্যূষে স্বগ্রামাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধমান নগর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে দামোদর নদ ; তথাকার সদরঘাটে নদ পার হইয়া, জামুনা নামক গ্রামে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামলাভপূর্ব্বক পুরাতন গ্রাণ্ডট্রঙ্করোড নামক বিখ্যাত রাস্তা অবলম্বন করিয়া হীরারাম চলিতে লাগিলেন। কোতলপুরনামক স্থানের একটা লোক বর্দ্ধমানষ্টেশনে হীরারামের সহিত রাত্রি-যাপন করিয়াছিল ; সেই ব্যক্তি হীরারামের সঙ্গী ছিল ; সে ব্যক্তির কোতলপুর-গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রায় দুই বা তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সেই ব্যক্তি একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়া কোতলপুর-অভিমুখে চলিয়া গেল, সুতরাং হীরারাম একাকী হইল, আর কেহ সঙ্গী রহিল না। হীরারামের তখন ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের লোক, দেহে অমিত বল ছিল। তখনকার পাড়াগাঁয়ের লোকেরা প্রায় সকলেই বলশালী ও সুস্থদেহ থাকিত।

বর্দ্ধমান হইতে হীরারামের গ্রাম প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এক দিবসে এই পথ অতিক্রম করা কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ স্নান-আহার, আহ্নিক-পূজা প্রভৃতির সময় চাই, এই জন্য হীরারাম ভাবিলেন, সূর্য্যাস্তের সময় কোন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে ক্ষীণতেজ

হইয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেলেন; গোধূলি আসিয়া দেখা দিল; পথও ভয়ানক এবং দুর্গম; বিশেষতঃ পথের ধারে গ্রাম নাই, পথিকেরাও তখন গমনাগমন বন্ধ করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসিত ও পথক্লান্ত হীরারাম, এমন সময়ে, গ্রাণ্ড্-ট্রঙ্ক-রোড্ পথের ধারে এক ফাঁড়িঘরে উপনীত হইলেন। ক্ষুদ্র ফাঁড়িঘরের পার্শ্বে প্রকাণ্ড দীঘি, চারিদিকেই বিরাট মাঠ, কেবল দুই শত বা তিন শত হস্ত দূরে একখানি অতি সামান্য দোকান অবস্থিত। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কী, চাউল-দাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছিল। এই স্থান জাহানাবাদ মহকুমার অধীন।

দোকানে গিয়া ব্রাহ্মণযুবক ঐ বুড়ী স্ত্রীলোককে এবং তাহার একটী অতি অল্পবয়স্কা দৌহিত্রীকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিল না। যাহা হউক, তথায় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক কিছু "জলখাবার" খাইয়া হীরারাম ফাঁড়িঘরে উপনীত হইল। বুড়ী কহিয়া দিয়াছিল, আমার দোকানে রাত্রিযাপনের স্থান নাই, তুমি ফাঁড়িঘরে গিয়া ফাঁড়িদার-মহাশয়কে অনুরোধ করিলে তিনি তোমাকে একটু স্থান দিতে পারেন। ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। ফাঁড়িঘরে গিয়া হীরারাম ভাবিল, আমি এখন নিরাপদ; কারণ ফাঁড়িঘরকে একপ্রকার ছোটখাট থানা বলা যাইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ তখনও জানিতে পারে নাই যে, নরাধম ফাঁড়িদারেরাই দস্যুদিগের প্রধান বন্ধু ও সহায় আর ঐ বুড়ীটা চোরের সর্দ্দারনী। যাহা হউক, মুসলমান ফাঁড়িদারকে সেলাম করিয়া ব্রাহ্মণ যাহা কহিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"আমার নিবাস গড়মান্দারণ পরগণা, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ পিতামাতার পত্র প্রাপ্ত হইয়া দেশে যাইতেছি, কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছিলাম, বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া পদব্রজে আসিতেছি। রাত্রিকালে কৃপা করিয়া ফাঁড়িঘরে আমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় দিলে, আমি কল্য প্রাতে গ্রামাভিমুখে রওনা হইয়া যাইব। আমার সঙ্গে নগদ একশত টাকা ও তদ্ভিন্ন দুইশত টাকার নোট আছে। নোটগুলা নম্বরারী নহে, দশ টাকার নোট। তা-ছাড়া বাঘমুখো একজোড়া সোণার বালা, রূপার একছড়া চন্দ্রহার এবং হাতের একটা সুবর্ণনির্ম্মিত "অনন্ত" আছে। এই অনন্তনামক অলঙ্কারের সংযোগস্থলে একটা সোণার চাকৃতী আছে, সেই চাকৃতীর উপরে আমাদের দেশীয় একটা স্বর্ণকার কলিকাতা শ্যামবাজারের ছোট কালীমূর্ত্তি খোদিত করিয়া দিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমুদয় টাকা, নোট, ও অলঙ্কার রাখিয়া দিউন এবং আমাকে একটা রসিদ দিয়া বাধিত করুন। রাত্রি

প্রভাত হইলে আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া রসিদ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক নোট, টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া গৃহে চলিয়া যাইব। রাত্রিকালে নিজের কাছে টাকাকড়ি রাখা উচিত বিবেচনা করি না।” ভণ্ড ফাঁড়িদার কহিল, “ঠাকুর গো! এরূপে কাহারও টাকা, নোট বা গহনা আমরা রাখি না; রাখিবার হুকুমও নাই, তবে তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক, ভদ্রলোক এবং দূরদেশবাসী পথিক, সুতরাং অগত্যা তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব, এবং রাত্রিকালে এখানে শুইতে দিব।” এই কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ হীরারাম ফাঁড়িদারকে শত শত ধন্যবাদ দানপূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব তাহার হস্তে অর্পণ করিল। বলা বাহুল্য ঐ রাত্রে ফাঁড়িঘরে সেই অপূর্ব্বদস্যুদলপতি—সেই দিগ্বিজয়ী দস্যুবীর—অজয়সর্দ্দার স্বয়ং উপস্থিত ছিল। কি একটা গোপনীয় বিষয়ের মন্ত্রণার জন্য অজয়সর্দ্দার এই ঘটনার দুই দিবস পূর্ব্ব হইতে ফাঁড়িদারের কাছে ফাঁড়িঘরে অবস্থান করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে অজয়সর্দ্দার-প্রভৃতির সহিত হীরারাম চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। দস্যু ও ডাকাইতেরা অপরিচিত বিদেশীকে প্রকৃত নাম বা বাসস্থান প্রায়ই বলে না, সুতরাং এক একটা কৃত্রিমনামে চাটুর্য্যের নিকট ইহারা পরিচিত হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত বাসস্থানের পরিচয় হীরারাম প্রাপ্ত হইল না।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেলে, ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া ফাঁড়িদার কহিল “আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমার শয়নের স্থান দেখাইয়া দিতেছি।” এইখানে বলিয়া রাখা উচিত, ফাঁড়িথানার দুই পার্শ্বে দুইটা কামরা ছিল, তদ্ব্যতীত আর এক দিকে আর একটা নাতিক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ ঘর প্রায়ই খালি থাকিত। এই ঘরে গিয়া ফাঁড়িদার একটা চৌকিদারকে একখানা পুরাতন মাদুর এবং ছিন্ন কাগজ ও ছিন্ন কাপড়ে প্রস্তুত একটা ছোট বালিস আনিতে কহিল। তাহা আনীত হইলে, ফাঁড়িদার বলিল, “বামুণঠাকুর তুমি এই ঘরে নিরাপদে শুইয়া থাক।” এই কথা কহিয়া ফাঁড়িদার চলিয়া গেলে, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় ঐ মাদুর এবং ঐ উপাধানে দেহ ও মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। ফাঁড়িদারের মুখে অজয়সর্দ্দার, বামুণের সমুদায় কথা অবশ্য শুনিয়াছিল। রাত্রিকালে চাটুর্য্যাকে হত্যা করাই স্থির হইল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদর স্বগ্রাম হইতে আসিয়া ফাঁড়িতে অবস্থান করিতেছিল। দুই এক দিন মধ্যে তাহার গ্রামে প্রত্যাগমন করিবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ফিরিয়া

যাইতে পারে নাই। ফাঁড়িখানার পার্শ্বে যে দোকান ছিল, তাহারই অতি নিকটে কয়েকটা দুগ্ধবতী গাভীর জন্য একটা ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল, তাহারই এক-দিকে ফাঁড়িদারের বাউর্চ্চীরা "খানা" প্রস্তুত করিত। অজয়সর্দ্দার আগমন করায় একজন সংগোপজাতীয় লোক রশুয়ের কার্য্য করিতেছিল। রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা দিবসে অনেক বিলম্বে ভোজন করে, রাত্রিকালেও অনেক বিলম্বে ভাত খাইয়া থাকে। ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদর, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সন্ধ্যা-কালের একটু পরেই আহারক্রিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। যে কুঠারীতে হীরা-রাম চট্টোপাধ্যায় শয়ন করিল, তাহারই বহির্দ্দেশে, দ্বারের সম্মুখে এবং মাটির বারান্দায় ফাঁড়িদারের ভাই শয়ন করিয়া রহিল। উভয়েরই উপাধান, কতক-গুলা ছিন্ন কাগজ ও কাপড়-পরিপূর্ণ থলিবিশেষ; উভয়েরই বিছানা পুরাতন মাদুর। মাঠে ঘর বলিয়া ভোরের সময় শীতল বায়ু বহিতে থাকে, তজ্জন্য শৈত্যানুভব হয়, এই কারণে ফাঁড়িদারের ভাই এক খানা উড়ানি (চাদর) দ্বারা দেহাবৃত করিয়া শুইয়া রহিল। হীরারামের সঙ্গে চাদর বা উড়ানি ছিল, সেও চাদর জড়াইয়া শয়ন করিল। ফাঁড়িদার এবং তাহার লোকেরা প্রায় সকলে উভয়ের শয়নের স্থান ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় সকলে সেই গোয়াল ঘরে আহার করিতে গেল, এবং নানাপ্রকার রহস্যময় গল্প ও কাহিনী কহিতে কহিতে ও শুনিতে শুনিতে আহারে বিলম্ব করিতে লাগিল। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত, ফাঁড়িদারের নিরপরাধী কনিষ্ঠ সহোদর, উহাদের লোমহর্ষণ ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই শুনে নাই; তাহাকে এ সকল কথা কেহ শুনায় নাই, সুতরাং এই ঘটনার সে কিছুই জানিত না।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ভয়ানক গ্রীষ্ম, বায়ু প্রায় নাই। ক্ষুদ্র ঘরের ভিতর অসংখ্য মশা; গরমের ত কথাই নাই; হীরারামের পক্ষে সে ঘরে শয়ন করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ফাঁড়িদারের সহোদর ঐ কুঠুরীর দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দায় শুইয়াছিল; তাহাকে সম্বোধন করিয়া হীরারাম কহিল—"ভায়া! আমার কুঠুরীতে যে প্রকার গ্রীষ্ম এবং মশকের উপদ্রব, তাহাতে ইহার ভিতরে শয়ন করা অত্যন্ত কষ্টকর, অতএব তুমি এই ঘরে শয়ন কর, আর আমি তোমার স্থানে শুইয়া থাকি।" ফাঁড়িদারের ভাই বলিল "ঠাকুর গো! তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? আপনি ব্রাহ্মণ, আর আমি মুসলমান; আমি ঘরের ভিতর শুইব, আর আপনি ঘরের বাহিরে শুই-

বেন, ইহা কি কখন হইতে পারে ?" যাহা হউক,অনেক অনুরোধ, তর্ক ও বিতর্কের পরে ফাঁড়িদারের ভাই ঘরের ভিতর শুইতে গেল, আর হীরারাম চট্টোপাধ্যায় বহির্দ্দেশে তাহার স্থানে শুইয়া রহিল।

এদিকে রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় চট্টোপাধ্যায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন ঘরের ভিতর মুসলমান গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুই একটা লোকের পদ শব্দ শ্রবণ করিয়া, হীরারাম নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিল, কেবল চক্ষু দুইটী অল্প মাত্র খুলিয়া-রাখিয়া নীরবে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অল্পকাল পরে, অজয় সর্দ্দার একটা শাণিত "খাঁড়া" (পাঁটাকাটা অস্ত্র বিশেষ) হাতে লইয়া, ফাঁড়িদারের সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ ভ্রমে ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করিল। ঘরের ভিতর রক্তের নদী বহিতে লাগিল। এদিকে হীরারাম নিঃশব্দে শয়ন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। হত্যাক্রিয়া সমাধা হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বিছানাসমেত মৃতদেহকে দীঘির মধ্যে লইয়া "গাঁজ" মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিল। পাছে মড়া জলোপরি ভাসিয়া উঠে, এজন্য এক খানা বড় পাথরে একটা বড় রশি (দড়া) বাঁধিয়া মৃতদেহকে জলের ভিতর ডুবাইয়া দেওয়া হইল। ফাঁড়িখানা বন্ধ করিয়া, দীঘির মধ্যে অজয় সর্দ্দার ও ফাঁড়িদার প্রভৃতি চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় সেস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে এবং প্রবলবেগে মাঠের উপর দিয়া অন্ধকারে দৌড়িতে লাগিল। নিকটে কোথাও গ্রাম নাই, সুতরাং কোথায় দৌড়িতেছে, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই। প্রায় তিন মাইল পথ দৌড়িয়া গিয়া হীরারাম অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল ; নিকটে কয়েকটা বড় বড় আম্রগাছ ছিল ; একটা গাছের উপর আরোহণ করিয়া উড়ানি দ্বারা নিজের পা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখিয়া শাখায় বসিয়া রহিল। এদিকে অজয়, ফাঁড়িদার ও অন্যান্য লোক দীঘী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তামাকু সেবন পূর্ব্বক নিদ্রায় নিযুক্ত রহিল। ভাই ঘুমাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে আর জাগাইবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া ফাঁড়িদারের ভ্রাতার বিষয়ে কেহ কিছু অনুসন্ধান করিল না। কুঠুরীর ভিতরকার রক্ত ইত্যাদি প্রভাতে পরিষ্কার করা হইবে, এইরূপ পরামর্শ স্থির রহিল।

রজনী শেষ হইলে, কাক-কোকিল-প্রভৃতি বিহঙ্গগণ কাকলি-লহরী দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আলোক সঞ্চারিত হইবার প্রথমাবস্থায় হীরারাম দেখিল, অদূরে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রাস্তার উপর দিয়া ছয় খানি

বলদ-শকট যাইতেছে, গাড়োয়ানেরা হৃদয়ানন্দে গীত গাহিতেছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জাহানাবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিল। তথায় তত্রত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর জাহানাবাদের ডেপুটী ছিলেন। ইনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গার সুবিখ্যাত ঘোষাল বাবুদের বংশ সম্ভূত। ইনি যেমন পরিশ্রম-পরায়ণ, তেজস্বী, সাহসী, বীর এবং দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকারী ছিলেন, তেমনি ঘোরতর দুর্দ্দান্ত শাসক বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাঁর প্রতাপে ও ভয়ে সাপে-নেউলে একত্রে নির্ব্বিবাদে বিচরণ করিত। এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়—

"জমিদারের মুখুটী। ঘোষালের ডেপুটী॥"

অর্থাৎ জমিদারের মধ্যে যেমন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটির মধ্যে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। যাহা হউক, হীরারামের প্রমুখাৎ লোমহর্ষণ ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঘোষাল মহাশয় ক্রোধে, ঘৃণায়, প্রতিহিংসাপরায়ণতায় অগ্নিশর্ম্মাতুল্য হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের যথাবিধি আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, অপরাহ্নে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর, দারোগা ও দ্বাদশজন কনেষ্টবল এবং প্রায় অর্দ্ধশত চৌকিদারকে ডাকাইয়া ঐ ঘটনার সমুদয় কথা জানাইলেন এবং রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তাঁহারা সেই দীঘির অভিমুখে রওনা হইবেন, এইরূপ আদেশ জারি করিলেন। বলা বাহুল্য, রাত্রি প্রায় সার্দ্ধনয়ঘটিকার সময় ডেপুটীবাবু, সব্‌ডেপুটিবাবু এবং ঐ সমস্ত লোক ফাঁড়িঘরের অভিমুখে রওনা হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার একটু পূর্ব্বে তাঁহারা দীঘির ধারে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে দীঘির ঘাটে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ফাঁড়িদার, বরকন্দাজগণ, চৌকিদার দোকনদারিণী প্রভৃতি সমুদয়কে গ্রেপ্তার করিলেন, কিন্তু অজয়সর্দ্দার ইতিপূর্ব্বেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে আর গ্রেপ্তার হইল না। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের লাঠির প্রবল আঘাতে ফাঁড়ির একটা বৃদ্ধবরকন্দাজ ও সেই বুড়ি দোকানদারিণী সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। পুলিশের মারাত্মক "শ্যামচাঁদের" আঘাতে ফাঁড়িদারের মুখেও সমুদয় কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দীঘির ভিতর অনুসন্ধান করিয়া মৃতদেহও পাওয়া গেল। ডেপুটীবাবু, মোকর্দ্দমার তদারক করিয়া জানিলেন, ইতিমধ্যে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী থানায় দারোগার নিকটে "অনন্ত" নামক সোণার অলঙ্কার এবং রূপার "চন্দ্রহার গহনা, ফাঁড়ি-

দারের ভৃত্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে; উহা দারোগার অংশের জিনিস। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই অলঙ্কারগুলি হীরারামের সঙ্গে ছিল; সোণার অনন্তে কালীদেবীর মূর্ত্তিও খোদা ছিল। থানার দারোগা, ফাঁড়ির ফাঁড়িদার, বরকন্দাজ, বুড়ী দোকানদারণী, চৌকিদার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আবদ্ধ রহিল, কিন্তু অজয়সর্দ্দারের সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ পুলিশইনেস্পেক্টর সেথ বকাউল্লা, অজয়সর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অনেকপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন, কিন্তু অজয় গ্রেপ্তার হইল না। অবশেষে ঠগী ডিপার্টমেণ্টের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ পুলিশইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সমাদ্দার মহাশয় ব্রহ্মচারী সাজিয়া অজয়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন। এই সময়ে অজয়সর্দ্দার হুগলীজেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরধাম হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিল। ভবানী বাবু তারকেশ্বরের মাঠে এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ (সামিয়ানা) টাঙ্গাইয়া সর্ব্বসাধারণ মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, "আমার সহিত শ্রীশ্রীমাতা জগদম্বার নিত্য সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মাতা কালী প্রতিদিন আমাকে দর্শন দেন। সম্প্রতি তাঁহার আদেশ হইয়াছে যে, তাঁহার প্রিয় বর-পুত্রস্বরূপ সমুদয় দস্যু, ডাকাইত, রাহাজান, তস্কর ইত্যাদিকে এক দিবস চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করাইতে হইবে, এবং ঐ দিবস উহারা যে বর প্রার্থনা করিবে, দেবী তাহা মঞ্জুর করিবেন। ইত্যাদি।" পাঠকমহাশয়েরা বোধ হয় জানেন, ডাকাইত, দস্যু, রাহাজান প্রভৃতি কালীদেবীর প্রধান ভক্ত, সুতরাং এই জনরব শ্রবণ করিয়া দলে দলে দস্যুগণ ঐ মাঠে উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারীকে সাক্ষাৎ "কালীপুত্র" ভাবিয়া সকলে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। অজয়সর্দ্দার তখনও গ্রাম হইতে বাহিরে আইসে নাই; মনে মনে ভাবিল "কালীমাতা যদি আমাকে এই বিপজ্জনক মোকর্দ্দমা হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি তথায় যাইতে পারি।" যাহা হউক, অজয়সর্দ্দারও ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইল। কৌশলে ভবানীপ্রসাদ জানিতে পারিলেন, ইহারই নাম অজয়সর্দ্দার। অতি শীঘ্র এবং অতি গোপনে সদর অফিশে লোক প্রেরিত হইল, প্রায় একশত কনষ্টেবল আসিয়া অজয়কে এবং বারজন প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিল। ঠগীবিভাগসংযুক্ত আইনানুসারে ঐ দ্বাদশজন দস্যুর এবং দিগ্বিজয়ী দস্যুবীর অজয়সর্দ্দারের ও ফাঁড়িদারের ফাঁসি হইয়া গেল। দারোগা প্রভৃতি যাবজ্জীবন জন্য দ্বীপান্তরিত

হইল। যাহার নামে বাঘে-ছাগে একত্রে জলপান করিত, যাহার ভয়ে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর হইতে সামান্য পথিক পর্য্যন্ত সমুদয় লোকে সশঙ্কিত থাকিত, যে ব্যক্তি আদেশ করিলে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়েও এক হাজার লাঠিয়াল একত্র করিতে পারিত, সেই অজয়সর্দ্দার ইহজগতে আর নাই; পাপিষ্ঠের পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে। পরাক্রমী দস্যুবীর অজয়সর্দ্দারের কয়েকটা গুণও ছিল। এই ব্যক্তি সদ্গোপজাতীয় লোক ছিল বলিয়া কখনও সদ্গোপের বাটীতে ডাকাইতি করে নাই, এবং সদ্গোপ পথিককে আক্রমণ করে নাই; অপর দস্যুদিগকেও সে এই কার্য্যে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিল। অজয়সর্দ্দার কয়েক বার কয়েকটা ভগ্নশিবমন্দিরের সংস্কারজন্য টাকা দান করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অনেক গ্রামের গুরুমহাশয়গণ পাঠশালার জন্য অজয়সর্দ্দারের নিকট রীতিমত বৃত্তি পাইতেন, এ কথা অকাট্য সত্য। কয়েকজন ব্রাহ্মণাধ্যাপককে অজয় অনেক টাকা দিয়া বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিল। একদা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া যথাতথা অর্থভিক্ষা করিতেন, অজয় তাঁহাকে ১৫টি টাকা দিতে গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ কহিলেন "ডাকাইতের পাপের ধনের অংশ আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।" কিন্তু কয়েকমাস পরে ঐ ব্রাহ্মণকে মিথ্যাকথা কহিতে, জালদলিল প্রস্তুত করিতে এবং পরস্ত্রী গমন করিতে দেখিয়া অজয়সর্দ্দার তাহার গলায় পা দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। অজয়ের বাটীতে ভিখারিগণ ভিক্ষা পাইত। এত টাকা---রাশি রাশি টাকা— হস্তগত হইত বটে, কিন্তু অজয়সর্দ্দার কখন "বাবুগিরি" করে নাই। তাহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল, সে সুরাপান করিত না, তামাকু ব্যতীত কখনও কোন নেশার দ্রব্য ব্যবহার করে নাই। ব্যভিচারদোষ তাহাতে বিন্দুমাত্র ছিল না, সে সাধ্বী স্ত্রীলোকগণকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত। অজয়ের দেহ সবল, বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, মাথার কেশ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত এবং মুখ ও চোখ ভদ্রলোকের মত ছিল।

আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী।

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত কায়রো নগরের আল্ অজ্হর্ নামধেয় সুপরিচিত বিরাট বিদ্যামন্দির পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। এই অত্যদ্ভুত বিদ্যামন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ, আমি কতিপয় বর্ষ কাল পূর্ব্বে কলিকাতার "ভারতী" পত্রিকায় এবং বোম্বাইয়ের "টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া" সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা আমার "প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আরও নব নব বিষয় সংযুক্ত হইয়া বিপুলাকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আল্ অজ্হর্ নানা কারণে বিদ্বজ্জনগণ সমাজে প্রকৃষ্ট প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত তুলনায় ইহা অপকৃষ্ট। বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা মহাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির। ইংলণ্ডের শিক্ষা-প্রণালী আমেরিকা হইতে শতাধিক নিম্নতর স্তরে অবস্থিত; অধিক কি, যে জর্ম্মনি দেশের শিক্ষা-প্রণালীর কথা লইয়া জর্ম্মণ-সন্তানগণ পুরাকাল হইতে গর্ব্বান্ধ হইয়া থাকেন, যাঁহারা সংস্কৃত, আরব্য, প্রাকৃত প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষাসমূহের উপরেও অসাধারণ অধিকার অর্জ্জন করিয়া "অজিত পণ্ডিত" উপাধি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না, তথাকার শিক্ষাপ্রথাও আমেরিকা হইতে নিকৃষ্টতর। ইংলণ্ডের বিদ্যা শিক্ষা-প্রণালী জর্ম্মনী হইতে নিম্নতর। নিরপেক্ষভাবে কহিতে হইলে, আমেরিকা দেশই বর্ত্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রথায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, রসায়ন, চিকিৎসা, পূর্ত্তকার্য্য, ভাস্কর্য্য, সংগীতবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, অর্থব্যবহার, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি যে কোন গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে, আমেরিকা মহাদেশের লোকেরা অমিত অধ্যবসায়, অসাধারণ শ্রমপটুতা, অত্যদ্ভুত উদ্যম, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষিতা এবং সদা প্রশংসনীয় স্বয়ম্ভূসমুত্থানশক্তিগুণে মানবজ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়েই অসামান্য অধিকার অর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, পর্টুগাল, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, রুসিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও যশস্বী

মানবসমাজে যতটা জ্ঞানরত্ন বিদ্যমান আছে, তাহার সমুদয় একত্র করিলে যে জ্ঞানসমষ্টি দেখা যায়, অধুনাতন আমেরিকা মহাদেশে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানরাশিকে বিদ্যমান দেখিতে পাই। অতি অল্পকাল মধ্যে এমন অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বিদ্যোন্নতি এবং ধনাগম-প্রথা, পৃথিবীর আর কোন দেশে বা আর কোন জাতিতে কখন হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকা নানা বিষয়ে ও নানা কারণে আদর্শ মহাদেশ। মুসলমানেরা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বকাল হইতে শিক্ষা ও দীক্ষার সম্যক্‌প্রকারে আলোচনা করিয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্য পৃথিবীর বহু জনপদে বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, শিল্পাগার, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়াও মুসলমান সন্তানেরা শিক্ষা-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া মুসলমানেরা যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, আমেরিকার লোকেরা অতি অল্পকাল মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান অপেক্ষা আমেরিকার লোকেরা সকল বিষয়েই শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর। মুসলমানের শিক্ষাপ্রণালীতে হৃদয় বা মস্তিষ্ক নাই (neither heart not brain); আমেরিকার শিক্ষা-প্রথায় হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই দুইটিই বিদ্যমান আছে। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী স্বাস্থ্যসুখভোগী সুঠামদেহী যুবকের যৌবন; মুসলমানের শিক্ষা-প্রণালী শয্যাশায়ী, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, মহারুগ্ন বালকের জীর্ণ শীর্ণ কদাকার দেহমাত্র। সুতরাং আমরা মুসলমানের শিক্ষা-প্রণালীকে কখনই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব (Theology) শিক্ষা দিবার জন্য, সমগ্র আমেরিকায় ৬৮৭টা স্কুল এবং ৫৯টা কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিদ্যা মন্দিরে কেবল তদ্দেশীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়; অবান্তর ভাবে অন্য দেশীয় ধর্ম্মের আলোচনাও হইয়া থাকে। দেশ রক্ষার জন্য সমর বিদ্যার সাধনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সুতরাং আমেরিকায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য ৩১টা কলেজ আছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সঙ্গীত বিদ্যা শিখাইবার জন্য ১২৪টা বিদ্যা মন্দির; শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-কলেজ প্রায় দুই শত; পাক প্রণালী শিখাইবার জন্য এক শতাধিক উচ্চ শ্রেণীর স্কুল; ফুল, ফল, তরু, লতা, উদ্যান প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য চতুর্দ্দশটী কলেজ; বক্তৃতা শিক্ষা দিবার জন্য ৬৭টা কলেজ এবং কেবল রাজনীতি শিখাই-

বায় জন্য অর্দ্ধ শতাধিক বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন কত প্রকারের কত যে কলেজ ও স্কুল আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও দীক্ষা-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কৃষিঘটিত সর্ব্ব বিষয়েই এখন মার্কিন অদ্বিতীয়। ইউরোপের ফরাসী দেশ কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম পারদর্শী দেশ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ফরাসী, বিলাত, বেলজিয়ম, হলন্দ প্রভৃতি দেশ আমেরিকা হইতে এ বিষয়ে নিকৃষ্ট। মার্কিন রাজ্যের কৃষি কলেজ দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স রাজ্যের পয়তাল্লিশটী প্রদেশে ৪৫টী বিরাট বিশ্বম্ভর কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। যেরূপ কলেজ, সেইরূপ কলেজ-ভবন, সেইরূপ কলেজ-প্রাঙ্গণ, সেইরূপ পুস্তকালয় এবং তদনুরূপ ধন সম্বল। এক একটা কলেজে এক বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। জেলায় জেলায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে কত যে কৃষি-বিদ্যালয় আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূষা প্রভৃতি কৃষি কলেজগুলিকে যদি আমেরিকার কৃষি-কলেজের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে পাঠক বুঝিবেন, পূষা কলেজ খদ্যোত, আমেরিকার কলেজ মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ; পূষা কলেজ কলাগাছের ভেলা, আর আমেরিকার কলেজ বিশাল বারিধির বিরাট জাহাজ!!

কৃষিঘটিত জ্ঞানবিস্তারে মার্কিণ দেশ অদ্বিতীয় ; কৃষিঘটিত প্রাত্যহিক সমাচার বিতরণে মার্কিণ অদ্বিতীয় অপেক্ষাও অদ্বিতীয়। আমেরিকা রাজ্যের সংবাদ-বিতরণব্যবস্থা দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। রাজ্যের ৮ কোটি লোকের ভিতর এমন একটী লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি সরকারী সংবাদে কৃষির অবস্থা, শস্যের অবস্থা, বৃষ্টিবায়ুর অবস্থা, আমদানী-রপ্তানির অবস্থা, সঞ্চিত শস্য বা শস্যভাণ্ডারের অবস্থা জানিতে না পারেন। কৃষকদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা প্রত্যহ ১২ ঘণ্টায় ২৪ বার কৃষিঘটিত বিবরণ-পত্র হাতে পাইয়া থাকেন ; এই সকল বিবরণ-পত্রিকায় কেবল মার্কিণ রাজ্যের শস্যবৃষ্ট্যাদিঘটিত অবস্থা বিবৃত হয়, এমন নহে, সমগ্র জগতের অবস্থা পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়া থাকে। তারযোগে প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর সমুদয় দেশ হইতে প্রয়োজনীয় ঘটনা সমূহ আমেরিকায় প্রেরিত হয় এবং এতাদৃশ সমাচারপ্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও বণিকসভা কর্ত্তৃক বিশেষ বন্দোবস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বন্দোবস্তের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ভারতবর্ষীয় পুরাণশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ-

রূপে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, অতি প্রাচীনকালে হিন্দুসন্তানগণ আমেরিকা মহাদেশে গমনাগমন করিতেন ; সুদূর আমেরিকা তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত বা অপরিচিত ছিল না। পরিব্রাজককেশরী কলম্বশ কিংবা নাবিককুলগৌরব কাপ্তেন আমেরিগো যখন আমেরিকায় সর্ব্ব প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন এই দেশে অসভ্য, অশিক্ষিত, বর্ব্বর, দুর্দ্দান্ত ও নরঘাতী রাক্ষসসমতুল্য মানবদেহধারী জীবপুঞ্জের বসতি ছিল। এখন সেই আমেরিকা বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, সাহস, ঐশ্বর্য্য, স্বাধীনতা, প্রভুত্ব প্রভৃতিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর "দিগ্বিজয়ী বরপুত্র" বলিয়া পরিগণিত। এই অসাধারণ উন্নতি অধিক কালের নহে ; অল্পকাল মধ্যে আমেরিকার এই অত্যদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বা যে জাতি অথবা যে দেশের ভাগ্যে ভগবানের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ থাকে, তাহার উন্নতি একদিনেই (স্বল্প কালেই) সাধিত হয়। উন্নতি, উন্নতিরই অনুগামী। আর যাহার অদৃষ্টে অগ্নি লাগে, তাহা ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিলেও এক অহোরাত্র মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়, কারণ অধঃপতন অধঃপতনের অনুগামী। ধর্ম্ম ভিন্ন স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। এই মহা প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্ম্ম আমেরিকার অধিবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতেই আমেরিকার শ্রীবৃদ্ধি ও সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকেরা ধর্ম্মের ভাণ করিলেও প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং বৃটিশজাতির উন্নতি সদা সর্ব্বদা নলিনীদলগত জলবৎ তরল এবং স্ত্রীলোকের যৌবনের ন্যায় চঞ্চল। আফ্রিকার আল্ অজহর নামধেয় জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানজাতির মহাগৌরব ও মহাসৌরভের অতীব উৎকৃষ্ট নিদর্শন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মুসলমানের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালীর মধ্যে কুসংস্কার-কালিমা এবং অনুদারতার আবর্জ্জনা এত অধিক যে, উন্নত ও উদার মানবসমাজে তাহা কখনই আদর্শ শিক্ষাপ্রথা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

নিউ ইয়র্ক নগর হইতে প্রায় সার্দ্ধেক শত ক্রোশ অন্তরে ইথিকা নগরী মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ করণেল বিশ্ববিদ্যালয় (Cornell University) দর্শন করিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। আমেরিকাবাসীদিগের ধন-বল ও বিদ্যোৎসাহিতার ইহা অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই বিরাট ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যামন্দিরের ইতিবৃত্ত শ্রবণ বা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রায় চল্লিস বর্ষকাল পূর্ব্বে এজরা করণেল নামে আমেরিকায় এক কৃষক ছিল। একদা এই ব্যক্তি অতিরিক্ত হলচালনায় ক্লান্তিবোধ করিয়া শান্তি লাভের জন্য এক বৃক্ষতলে উপবেশন-

পূর্ব্বক মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, "কৃষিবিদ্যাশিক্ষার জন্য এক মহা আদর্শ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। আমাদের পল্লীতে এরূপ বিদ্যালয় নাই; অন্যান্য বিদ্যাগারসমূহ অধিক দূরে অবস্থিত, সুতরাং এই পল্লীতেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।" ইহার দুই সপ্তাহকাল পরে একদিন এই দরিদ্র কৃষক বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, কেবল কৃষি-শিক্ষার জন্য আদর্শ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যথেষ্ট হইবে না, পরন্তু এমন একটি মহা আদর্শ-বিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক, যাহাতে মানবাবিষ্কৃত সমুদয় বিদ্যার আদর্শ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, কৃষক এজরা করণালের মনোবাঞ্ছা তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই দরিদ্র ও একদা অপরিচিত কৃষকের যত্নে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, অকৃত্রিম দেশহিতৈষিতায়, পরকল্যাণকামনায় এবং সাধু ব্যবহারে ইথিকানগরীস্থ কর্ণেল বিশ্ববিদ্যামন্দিরের প্রকাণ্ড চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া সগৌরবে নগরীর শোভাবর্দ্ধন, আমেরিকার বিদ্যোৎসাহিতা গুণের প্রশংসা কীর্ত্তন এবং এজরা করণেল সাহেবের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই বিরাট বিশ্ববিদ্যামন্দির বিংশ অংশে বিভক্ত; এক একটা অংশ এক একটা বিপুলাকার অট্টালিকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সম্পত্তির মূল্য সার্দ্ধ চারি কোটি টাকা। বার্ষিক আয় চল্লিশ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা। তিন লক্ষ ত্রিশ সহস্র পুস্তক এই বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে; পৃথিবীর অতি পুরাকালের অনেক দুর্ল্ভ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া এখানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে; কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানে সবিশেষ যত্ন করা হয়, তজ্জন্য অতীব উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা আছে।

অনন্তর আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠ করুন। কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যামন্দিরের নাম "লিলাণ্ড ষ্টাণ্ডার্ড ইউনিভারসিটি," ইহার সম্পত্তির মূল্য দশ কোটি রৌপ্য মুদ্রা। দুঃখের বিষয়, অতি অল্প দিন গত হইল, প্রবল ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্যামন্দির হইতে একাল পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ সহস্র বিখ্যাত পণ্ডিত নিঃসৃত হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা স্থানে নানা বিষয়িণী বিদ্যার শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিদ্বানের সংখ্যার সীমা নাই। ইউরোপের প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শত সমরকুশল সেনাপতি এবং প্রায় এক সহস্রাধিক অতুলনীয় বীরবর এই বিশ্ববিদ্যামন্দিরে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলম্বিয়া, ইয়েল ও হার্ওয়ার্ড নগরত্রয়ের বিশ্ব-

বিদ্যালয় যেমন ধনবান্, তেমনি বিদ্যাবিভবে গৌরবান্বিত। আমেরিকার বিদ্যা-মন্দিরসমূহের ধনের সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল নিউইয়র্ক নগরের বালকবালিকাদিগের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে; আবশ্যক হইলে অধিক টাকা ব্যয় করিতে প্রজাপুঞ্জ বা তথাকার রাজা অসমর্থ বা সঙ্কুচিত হন না। আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে পাই-বেন, ইহাদের অধিকাংশ তথাকার ধনবান্ ও বিদ্যোৎসাহী লোকদিগের প্রদত্ত অর্থে বা সম্পত্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে; রাজা বা রাজকীয় কোষের সহিত সম্পর্ক থাকে না। আমাদের হতভাগ্য বঙ্গদেশের ধনবান্ জমিদারগণ অথবা অন্য প্রকারের ঐশ্বর্য্যশালী "বড় লোক"গণ আমে-রিকা দেশের বিদ্যোন্নতির এই অসাধারণ অবস্থা আলোচনা করিয়া তদ্দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের চরিত্র, স্বভাব, দেশহিতৈষিতা, বিদ্যোৎসাহ, ধনের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি অনুকরণ করিলে বাঙ্গালা দেশ এত দিনে "সোণার বাংলা" হইয়া যাইত।

বর্ত্তমান বৎসরে ইথিকা নগরীর করণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ষোড়শ জন আসিয়াবাসী বিদ্যার্থী নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহার মধ্যে সাত জন ভারতবর্ষবাসী। এই ছয় জনের মধ্যে একজন কৃষিবিদ্যার্থী, ইহাদের চারি জন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারী এবং একজন কলিকাতার কৃষি-বিজ্ঞান সভার সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্র। অবশিষ্ট একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবা, তাঁহার নাম প্রভাকর সদাশিব শ্রোত্রী। এই অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাশালী ছাত্র, একটি বন্ধুর নিকট হইতে কেবল চারি শত টাকা মাত্র দান প্রাপ্ত হইয়া, ভগবানের উপরে ভরসা করিয়া, আমেরিকা গমন করেন; তদ্দেশে উপনীত হইয়া দেখেন, তাঁহার নিকটে আর এক দিনের আহার্য্য দ্রব্যের মূল্যও নাই। এই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক মহারাষ্ট্র যুবা অসামান্য অধ্যবসায়, অমিত পরিশ্রম-পরায়ণতা এবং সাধু স্বভাবগুণে একাল পর্য্যন্ত নিজের সমুদয় প্রকার খরচ যোগাইয়া আসিতেছেন। ধন্য প্রভাকর!

আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-প্রণালীর সহায়তায় ছাত্রেরা আত্ম-নির্ভর, সদাচারী, ঈশ্বরভক্ত, পরোপকারী, বিনয়ী এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া থাকে। ভারতের বিশেষতঃ হতভাগ্য বঙ্গদেশের ইংরাজি স্কুলের ছাত্রগণ যেমন দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্দ্দান্ত, কদাচারী, অবিনয়ী ও গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার

হয়, আমেরিকার ছাত্রগণ সেরূপ হয় না। বঙ্গদেশের মেডিকেল কলেজের ছাত্র প্রায়ই নাস্তিক হইয়া উঠে, ইহারা যেমন কুস্বভাব-সম্পন্ন, তেমনি অসদাচারী। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন ভয়ানক দুষ্ট, ইহাদের আদৌ চরিত্রবল নাই। ইহাদের দেহে হৃদয় বা মস্তকে মস্তিষ্কের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর গুণে তথাকার মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর এ দেশের লক্ষীছাড়া যুবারা পিতামাতাকে মানে না, ভগবানে বিশ্বাস করে না, গুরু বা ব্রাহ্মণের সম্মান করে না, দেশ বা সমাজ অথবা জাতির সহিত বিচ্ছিন্ন হয় এবং অতি অল্প বয়স হইতেই মিথ্যা কথা, সুরাপান, গাঁজা, সিদ্ধির ব্যবহার, চা ও কাফির শ্রাদ্ধ, পরনিন্দা, কুস্বভাব, অসচ্চরিত্রতা, ধর্ম্মহীনতা, অবিনয়, অভদ্রতা প্রভৃতি চূড়ান্তরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে। মার্কিন দেশের যে কোন স্কুল বা কলেজে যে কোন প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করা যাউক, অধ্যাপকেরা সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যার্থীদিগের সুনীতিপরায়ণতা ও স্বভাব-চরিত্র এবং আচার ব্যবহারের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। অল্পমাত্র লেখা পড়া শিখিয়া যে সকল ছাত্র তদ্দেশে টাইপ রাইটীং অথবা সর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা করে, তাহাদিগেরও স্বভাব ও চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় এবং যাহাতে তাহারা সমাজের অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র ত্রুটি করা হয় না। বঙ্গদেশে যে সকল অন্তঃসারশূন্য যুবক, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয় হইতে তাড়িত অথবা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অবশেষে সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটীং শিখিতে যায়, তাহাদের শতকরা ৯৯ জনকে আমরা আমাদের সমাজের কলঙ্ক বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ এই যে, এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বভাব সম্বন্ধে আদৌ অনুসন্ধান করা হয় না। কেবল এই প্রকার স্কুলে যে চরিত্রের অনুসন্ধান করা হয় না, তাহা নহে, বস্তুতঃ কোথাও হয় না। এদেশে স্কুলের ভিতরে কিম্বা স্কুলের বাহিরে, ঘরে কিম্বা গৃহ সীমার বহির্দ্দেশে, গৃহস্থ নরনারীর দ্বারা অথবা শিক্ষকবর্গ দ্বারা, অথবা অন্য কাহারও দ্বারা স্বদেশীয় ছাত্রদের চরিত্রের উৎকর্ষ বিধান হয় না।

আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর একটা চমৎকার বিশেষত্ব এই যে, এখানে শিক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সহৃদয়তা প্রদর্শিত হয়, অন্য কোন দেশে তাহা হয় না। আমেরিকায় প্রকৃত কার্য্যকারী জ্ঞানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি; কণ্ঠস্থ বিদ্যা বা গ্রন্থগত জ্ঞানের জন্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না।

শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে পিতা পুত্রের ঘনিষ্ঠ স্নেহময় সম্বন্ধ থাকে ; শিক্ষকেরা ছাত্রগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চপদস্থ ভাবিয়া বিদ্যার্থীবৃন্দকে কখন উপেক্ষা করেন না। ছাত্রেরা শিক্ষকগণকে যেন সমপাঠী বলিয়া জ্ঞান করে। দেশহিতৈষীতা, আত্ম-নির্ভরতা, ভগবদ্ভক্তি, পরিশ্রমপরায়ণতা, স্বার্থত্যাগ, কার্য্যকারী বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, বিনয় প্রভৃতি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সর্ব্ব প্রধান নীতি। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত আছে। বিদেশী ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষিত আচার্য্য, অধ্যাপক ও উপাধ্যায়গণ যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড দেশে তাহা দেখা যায় না ; বঙ্গদেশে ইহা স্বপ্নের অতীত ; এখানে স্কুল কলেজেও 'নেটীব' 'নিগার' উপাধির অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে নামক এক বাঙ্গালী ছাত্র আমেরিকার 'করণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে' এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া, কৃষি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক "কশ্মপলিটান ক্লব" নামক সভার সহকারী সভাপতির পদে বরিত হইয়াছেন। মেদিনীপুর ও কলিকাতা হইতে এই সভার জন্য কিছু টাকা সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—"আমেরিকার শিক্ষা প্রণালীর সহিত তুলনায় ভারতের ইংরাজি শিক্ষা প্রণালী অতীব নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে বিদ্যার্থীরা প্রকৃত মানুষ হইয়া আইসে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার হইয়া নিঃসৃত হয়। বঙ্গের ইংরাজি স্কুল ও কলেজের বাবু যুবকেরা আরও অসার, আরও কদাচারী।"

আমেরিকার অধিবাসীরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তথাকার পণ্ডিতেরা ও জনসাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যসমূহ অবশ্য পরিচালিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাঁরা বিদেশীয় ছাত্রদিগের ধর্ম্মে বা ধর্ম্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন না। আমেরিকার ধর্ম্ম-কলেজসমূহে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মের আলোচনা করা হয় ; ছাত্রেরা স্বধর্ম্ম ভিন্ন পরকীয় ধর্ম্মসমূহেও জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডের পণ্ডিত ও ইংলণ্ডের লোকদিগের ন্যায় আমেরিকা দেশ কুসংস্কার সম্পন্ন ও অনুদার নহেন। শিকাগো নগরের "পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজন" ইহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আমেরিকার নানা স্থানে বিশেষতঃ সানফ্রান্সিসকো নগরে

বেদান্ত-সভা-স্থাপন ও বেদান্ত চর্চ্চা এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ দান ইহার অন্যতম বিশিষ্ট প্রমাণ। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার আর একটা চমৎকার প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ড যতটা বিলাসী এবং যতটা ঘোরতর সাংসারিক ও স্বার্থপর, আমেরিকা ততটা নহে। ইংলণ্ডের নীতি এইরূপ—"সঙ্গে যদি টাকা থাকে, তবে ইংলণ্ডে বাস কর এবং সুখে বিচরণ কর, নতুবা মরিয়া যাও; তোমার মুখে কেহ এক বিন্দু জল দিবে না। যদি ভিক্ষা দ্বারা গৃহস্থকে বিরক্ত কর, জেলখানা আছে, আইন আছে, তোমাকে কারাগারে যাইতে হইবে। বাবু-গিরির দ্বারা যদি স্ত্রীলোক ও পুরুষের মোহ উৎপাদন করিতে পার, যদি খুব ধূমধামের পোষাক পরিয়া হরি ঘোষের গোয়ালের কর্ত্তার ন্যায় টাকা ছড়াইতে পার, তাহা হইলে ইংলণ্ডে তুমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে, নতুবা মরিয়া গেলেও কেহ তোমার দিকে চোক চাহিয়া দেখিবে না।" এইরূপ ইংল-ণ্ডের সমাজ! তদ্ভিন্ন সৌখিনতা, বাবুগিরি, ধূমধাম, জাঁকজমক, বিলাস, বৃথা নবাবী প্রভৃতিতে ইংলণ্ড এত ব্যতিব্যস্ত যে, প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্বে দৃষ্টিপাত করি-বার ইহার আদৌ অবকাশ নাই। ধর্ম্ম একটা ভাণ; বাইবেল একটা বাঁধা বুলি। স্বার্থে আঘাত পড়িলেই ধর্ম্ম আর ধর্ম্মশাস্ত্র কিম্বা ধর্ম্মনীতি একেবারে উল্টাইয়া যায়। ইংলণ্ডের পাদ্রী অপেক্ষা আমেরিকার পাদ্রী শ্রেষ্ঠতর; তবে ভারতবর্ষে আসিয়া মার্কিন মুলুকের অনেকগুলা পাদ্রী যে অমানুষত্ব দেখায়, তাহা কেবল ভারতবাসী বিলাতী পাদ্রীর সংসর্গ দোষে জন্মে, অথবা ইতর বংশের লোককে পাদ্রী করিয়া যিশু নাম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করা হয়। নিয়ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা, মদ্য ও মাংস সেবায় প্রবৃত্তি, ব্যভিচারে অনুরাগ, স্ত্রীলোকের মনস্তুষ্টির জন্য যত্ন, পশু হত্যা, শিকার, বিবিধ প্রকার তমগুণোৎ-পাদক ক্রীড়া ও আহার, নিজের তামসিক বৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার জন্য পরিশ্রম স্বীকার প্রভৃতিতে ইংলণ্ড সদা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিদ্যার্থীবৃন্দ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রায় অদ্ভুত ধরণের হইয়া থাকে; বিলাত-প্রত্যাগত অনেক বঙ্গীয় যুবক ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এই অকালকুষ্মাণ্ডগণের বর্ণনা না করাই ভাল। আমেরিকায় তাহা নহে, আমেরিকায় দয়া ধর্ম্ম বদান্যতা প্রভৃতি আছে। নিকটে পয়সা না থাকিলে ভারতবর্ষীয় ছাত্র বুদ্ধি, বিনয় এবং চরিত্রবলে আমেরিকায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, বিলাসী বিলাতে তাহা হয় না, এখানে স্বার্থপরতা ঘোরতররূপে প্রবল। জাপানেও নানা কারণে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

কিন্তু আমেরিকায় আমাদের পূর্ণ সুবিধার যথেষ্ট উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে; আমেরিকা এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-বিদ্যামন্দির ও কর্ম্মক্ষেত্র। আমার বিবেচনায় ইংলণ্ডে না যাইয়া আমাদের দেশের বিদেশগমনেচ্ছু যুবকদিগের পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ আমেরিকায় গমন করা শত গুণে শ্রেয়ঃ।

আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর আর একটা বিশেষতত্ত্ব এই যে, সে দেশের ছোট ছোট বালক বালিকারা পুস্তক পাঠ করিয়া যত কিছু শিক্ষা না করে, পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে মুখে মুখে তাহার অধিক শিক্ষা করিয়া থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক থাকেন, ইনি অবজেক্ট্ লেশন মাষ্টার আখ্যায় অভিহিত হয়েন। এই মাষ্টার কোন বিশেষ শ্রেণীতে (ক্লাশে) উপবেশন করিয়া রীতিমত শিক্ষা দেন না, কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অধ্যাপন করেন না অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপক নহেন। বিদ্যালয় খোলা হইলে, ছোট ছোট বালক বালিকারা যখন একত্রিত হয়, তখন ইনি তাহাদের সকলকে দাঁড় করাইয়া দিয়া নিজে মধ্যবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হয়েন এবং মুখে মুখে অনেক বিষয় শিক্ষা দেন। ইহাতে বালক বালিকারা অতি অল্প বয়স হইতে নানা স্থানের ও নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই অবজেক্ট্ লেশন মাষ্টারের শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নমুনা দিলাম। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, রুসিয়ার সম্রাটের উপাধি কি? ছাত্রেরা উত্তর দিল "জানি না।" মাষ্টার কহিলেন, রুসিয়ার সম্রাটের উপাধি "জার"। এইরূপে মুখে মুখে কত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, পাঠকদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য আমেরিকার এক স্কুলের রেজেষ্ট্রি বহি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "অব্জেক্ট্ লেশন মাষ্টার মহাশয়, গত সপ্তাহে প্রতিদিন অৰ্দ্ধ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া ছোট ছোট ছাত্র ও ছাত্রাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তুরস্কের সম্রাটের উপাধি সুলতান, পারস্যের নরপতির উপাধি সা, ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা গবর্ণর জেনেরল, চীনের ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানদিগের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত রোম নগরে থাকেন, তাঁহার উপাধি পোপ; ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ডাকঘরের সৃষ্টি হয়, ১৪৭৩ অব্দে সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রথম ব্যবহৃত হয়, নিউরেবর্গ সহরে ১৪৭৭ অব্দে সর্ব্বপ্রথম ঘড়ি তৈয়ার হয়, ১৪৯৩ অব্দে কোপেন্‌হেগেন্ সহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৫৪৫ অব্দে ছুঁচ চলিতে আরম্ভ হয়, ১৫৫৯ অব্দে ফ্রান্সে চারি-চাকার গাড়ি ব্যবহৃত হয়, ইংলণ্ডে ১৫৮৮ অব্দে সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্রের সৃষ্টি

হয়, দুরবীক্ষণ ব্যবহারের বর্ষ ১৫৯০, সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তণের বর্ষ ১৬৫২, সর্ব্বপ্রথম ব্যোমযান (বেলুন) উড়িবার বর্ষ ১৭৮৩, লোহার কলম (ষ্টীলপেন) প্রচলিত হইবার প্রথম বৎসর ১৮৩০, লৌহদ্বারা নির্ম্মিত বাষ্পীয় তরণী চালাইবার প্রথম বর্ষ ১৮২৮, ইংলণ্ডে ৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম কাচের জানালা নির্ম্মিত হয়, ১৮২৯ অব্দে প্রথম দেশালাই চলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে বালক বালিকারা মুখে মুখে অনেক কথা শিক্ষা করিয়া তাহা মনে রাখে। অব্জেক্ট্ লেশন মাষ্টারের সময় অতীত হইলে ছাত্র ও ছাত্রীরা আপনাপন ক্লাশে (শ্রেণীতে) প্রবেশ করিয়া তদনন্তর পুস্তকাদি পাঠ করিতে থাকে। আমার বিবেচনায়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্কুলে এইরূপ অব্জেক্ট্ লেশন্ দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। কিন্তু বহুদর্শী, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুযোগ্য লোক না হইলে কাহাকেও অব্জেক্ট্ লেশন মাষ্টার পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে নানা কারণে বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রণালী সুন্দর নহে। শিক্ষার প্রণালীও সুন্দর নহে এবং শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহার পরিমাণও প্রচুর নহে। তদ্ভিন্ন ইহাও কহা যাইতে পারে যে, শিক্ষার ফলও সুন্দর নহে। ইংরাজি শিক্ষা করিয়া বর্ত্তমান কালে যে সকল যুবক, কলেজ বা স্কুল হইতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার, শারীরিক বা মানসিক তেজ একেবারেই অসার; ধর্ম্মভাব অণুপ্রমাণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই একজন যে ধর্ম্মভীরু অথবা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাগরে এক বিন্দু বারির ন্যায় নগণ্য। অধিকাংশ ছাত্রই একেবারে অপদার্থ। উদ্ভাবনী শক্তি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কত লোক বাস করে এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়, নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে পাঠকেরা তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

দেশের নাম	লোক সংখ্যা	প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার জন্য গড়ে খরচ
অষ্ট্রিয়া	২৬৭১২০০০	৶০
বেলজিয়ম	৭০৭৪৯১০	১২ পাই
বলগেরিয়া	৩৭৪২৮৩	১॥৶০

চিলি	৩১১০০০০	৫॥০
ডেনমার্ক	২৪৫০০০০	২৸৶০
ফ্রান্স	৩৮৯০২০০০	৩৸/০
জর্ম্মণী	৬০৬০৫০০০	৫।৶০
ইটালী	৩২৪৭৫০০০	১/০
মেক্সিকো	১৩৫৪৫০০০	১।৶০
নরওয়ে	২৩১২০০০	২৸০
পর্টুগাল	৫০১৬২৬৭	৯৸৵০
সার্ভিয়া	২৫০০০০০	১।০
স্পেন	১৮৬০৮০০০	১।৶০
সুইডেন	৫২৯৫০০০	৫॥০
সুইজারলণ্ড	৩৩১৩০০০	৯॥৶০
জাপান	৪৪২৬০০০০	১৸০

পর্টুগাল দেশের লোক সংখ্যা বঙ্গ দেশের লোক সংখ্যার দশমাংশ, কিন্তু ঐ দেশের প্রত্যেক লোকের শিক্ষায় গড়ে প্রায় ১০ টাকা খচর হয়। ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ড দেশেও তাহাই হইয়া থাকে। হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক লোকের শিক্ষার জন্য গড়ে খরচ ৫ (পাঁচ) পয়সা মাত্র !!

ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র—গায়ত্রী।

পুষ্পোদ্যানের সার যেমন প্রসূন এবং প্রসূনের সার যেমন তাহার সুরভি; হিন্দুর সার তেমনই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের সার তাঁহার গায়ত্রী। বস্তুতঃ জল বিনা মীন, আলোক বিনা দিন এবং চৈনিক বিনা চীন যেমন সামর্থ্যসংরক্ষণে সমর্থ হয় না, গায়ত্রিহীন ব্রাহ্মণ তেমনি কোন সামাজিক গৌরব বা সৌরভ সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে না। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জানেনা, অথবা গায়ত্রীর গৌরব রক্ষা করে না, ব্রাহ্মণ বলিয়া গৌরব করিবার তাহার কিছুই নাই। কারণ, গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র, গায়ত্রী দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তির পত্তন হয়। গায়ত্রীর অপর নাম প্রণব, ইহা ওঁ এই স্বরিতের নামান্তরমাত্র।

ওঁ মিতিব্রহ্ম সর্ব্বেঃহৈস্মৈ দেবাবলি মাহরন্তি।
মধ্যে থামনাগাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥

যিনি ওঁকারের প্রতিপাদ্য, তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতা তাঁহারই সেবা ও উপাসনা করেন।

অথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বাস্মা ল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এই দুঃখময় সংসার হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ওঁকার রূপ প্রণব বা গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জন্মে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষা হয়, সুতরাং গায়ত্রীকে জ্ঞাত হওয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের কয়জন গায়ত্রীর অর্থ বুঝেন এবং বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য পথে চলিয়া থাকেন? বাজারের ব্যবসায়ী বেদিয়াগণের মুখস্থ করা সাপের মন্ত্রের ন্যায় অনেক ব্রাহ্মণ শুদ্ধাকারে বা অশুদ্ধাকারে গায়ত্রী আবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু কয়জন প্রকৃত অর্থ বুঝে? কয়জন গায়ত্রী-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া "ব্রাহ্মণ" উপাধির গৌরব বা সৌরভ রক্ষা করিয়া থাকে? শাস্ত্র বলেন, গায়ত্রি-জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও অধমতর। যে ব্রাহ্মণ নিত্য গায়ত্রী জপ করে না, সে ব্রাহ্মণ নহে, জঘন্য শূদ্র সমতুল্য। অনেক ব্রাহ্মণের ব্যবহার এবং গায়ত্রী জ্ঞান দর্শন করিলে, মুসলমানদিগের পাঠশালাকে স্মরণ হয়। মুসলমান বালকদিগের পাঠশালার নাম মক্তব্। মক্তবে বসিয়া, পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া, মুসলমান-বালকেরা কোরাণ পাঠ করে। ভাদ্র মাসের তরঙ্গ ভরা ভাগীরথীর জলের মত শরীরকে হেলাইয়া দোলাইয়া যবন বালকগণ কোরাণ পড়ে বটে, কিন্তু কয়জন বালক কোরাণ বুঝে বা বুঝিতে পারে? চল্লিশ সহস্র যবন বালকের মধ্যে একজনও প্রকৃতরূপে কোরাণের কর্থ বুঝে কিনা সন্দেহ। ব্যবসায়ী বেদিয়া জাতি সাপের মন্ত্র আবৃত্তি করে, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ জানেনা; মুসলমান বালকের কোরণ শিক্ষাও ঠিক তদ্বৎ। কেবল মুসলমান কেন, ব্রাহ্মণের দশাও কি ঠিক তাহাই নহে? আমরা প্রতিদিন দুইবেলা অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণকে চলিতে, বসিতে, দৌড়িতে, হাসিতে, কাঁদিতে ও কথোপ-কথন করিতে দেখিতে পাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে বা পড়িয়াছে? কয়জন ব্রাহ্মণ বেদ বুঝিতে পারে? মুসলমান বালক, কোরাণ বুঝুক আর নাই বুঝুক, খ্রীষ্টান বালক বাইবেল বুঝুক আর নাই বুঝুক, কোরাণ বা বাইবেল তাহারা পড়িয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান বেদ পড়ে না, বেদ

বুঝে না এবং বেদ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই রাখে না। শাস্ত্রকর্ত্তারা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ বেদ না জানে, সে অব্রাহ্মণ। প্রকৃত কথায় বলিতে হইলে, এবম্প্রকার অব্রাহ্মণের সংখ্যাই আজিকাল অধিক এবং তাহারাই সর্ব্বত্র বিরাজমান। ব্যবস্থাকর্ত্তা ঋষি মহোদয়গণ লিখিয়াছেন, সমস্ত বেদ পড়িতে অক্ষম হইলে অন্ততঃ বেদের কিয়দংশও পাঠ করা এবং বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী, বেদের একটী ঋক অর্থাৎ শ্লোক; অন্ততঃ ইহাও যদি শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে এবং বুঝিতে পারে, তাহা হইলেও বেদজ্ঞান-হীনতার অপবাদ ও মহাপাপ হইতে ব্রাহ্মণ সন্তান মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহাই বা কয়জন ব্রাহ্মণে জানে? কয়জন ব্রাহ্মণ প্রকৃতরূপে গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে ও বুঝিতে পারে? উচ্চারণ বা বুঝা দূরে থাকুক, অনেক ব্রাহ্মণ আদৌ গায়ত্রী জানে না, অথবা অংশত মাত্র জানে। বেদ পড়া দূরে থাকুক, গায়ত্রীর অর্থ বুঝে না, এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অগণ্য। এইজন্য আমি এক্ষণে গায়ত্রী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অদীক্ষিত ব্যক্তি অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য। দীক্ষাহীন হিন্দুর হস্তের অন্ন ও জল অপবিত্র। ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্রবিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত; অন্য জাতির দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। কিন্তু পরমহংস, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সিদ্ধ-পুরুষেরা ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে বা ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণাপেক্ষা অধিকতর পূজ্য ও অধিকতর শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহাঁরাও দীক্ষা দানের উপযুক্ত অধিকারী। ব্রাহ্মণেরাও ইহাঁদের শিষ্য হইতে পারেন। যদি ইহাঁরা ব্রহ্মকুলোদ্ভব হয়েন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত না হইলেও ক্ষতি নাই।

ব্রাহ্মণের গুরু যে কোন মন্ত্রই প্রদান করুন, ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্রের নাম গায়ত্রী। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর মন্ত্র আর নাই। ইহাপেক্ষা অধিকতর সুফল-দায়ক মন্ত্র, ব্রাহ্মণের পক্ষে আর নাই। গায়ত্রী শিখিলে ও বুঝিলে বেদ পাঠের ফললাভ হয়, এইজন্য বেদের অপর নাম গায়ত্রী এবং গায়ত্রীর অপর নাম বেদ।

প্রত্যেক সুব্রাহ্মণ, শাস্ত্রমতে আচার্য্য বা উপদেশক ; যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জানে না, তাহাকে গায়ত্রী শিখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া সুব্রাহ্মণের অতীব কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। উপবীত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ-বালককে বিশুদ্ধরূপে গায়ত্রীর উচ্চারণ শিখাইয়া দেওয়া তাহার অভিভাবকের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কাজ। উপবীত না হইলে সেই বালক কোন প্রকার ক্রিয়ার অধিকারী হয় না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে উপবীত হইবার পূর্ব্বেও গায়ত্রী মুখস্থ করিয়া লইবার অধিকার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তানের আছে।

ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র গায়ত্রী। যদি আর কোন মন্ত্র না লইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কেবল গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তাহাই জপে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দিবারাত্রের মধ্যে অন্ততঃ অষ্টাদশবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক সুব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই শাস্ত্রবিধি। প্রাতঃ-কালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনবার, স্নানের পর তিনবার, মধ্যাহ্ন-ভোজন কালে তিনবার, সায়াহ্নে তিনবার, রাত্রিতে ভোজন কালে তিনবার এবং রাত্রিতে শয়নকালে তিনবার, এই আঠার বার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। যদি কেহ সম্পূর্ণ গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে কেবল মনে মনে ওঁ ইহাই উচ্চারণ করিলে যথেষ্ট হয়। সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের পরে এবং রাত্রিকালে সূর্য্যদেব অদৃশ্য থাকেন, এইজন্য এই দুই সময়ে সমস্ত গায়ত্রী উচ্চা-রণ না করিয়া মাত্র ওঁ উচ্চারণ করিতে হয়। সূর্য্য দৃশ্যমান থাকিলে সমুদয় গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে পারেন।

দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ হইলেও শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তি হইতে পারেন। কিন্তু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়ে সুব্রাহ্মণ হইলে আরও ভাল হয়। যদি শিষ্যের সৌভাগ্যক্রমে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই সুপণ্ডিত ও সুব্রাহ্মণ হয়েন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অন্য জাতির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিলে গুরু পরিত্যাগের পাপ জন্মে না। দীক্ষাগুরু যেমন আছেন তিনি তেমনই থাকিবেন, কিন্তু শিষ্যের সুবিধা ও প্রবৃত্তি অনুসারে অন্য জাতীয় সুপ-ণ্ডিত, সদাচারী ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় অপরাধ হয় না। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে গৃহীগুরু প্রশস্ত ; অগৃহীর পক্ষে পরমহংস বা সন্ন্যাসী প্রশস্ত। গৃহীগণ ইচ্ছা করিলে পরমহংস বা সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা লইতে পারেন। কিন্তু অগৃহীগণ কোন মতেই গৃহীগুরুর শিষ্য হইতে পারেন না। গুরু ভিন্ন, পরমহংস ও সন্ন্যাসীর নিকট কেহই প্রণম্য নহেন।

শাস্ত্রকর্ত্তা মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ;—

"মধুলব্ধা যথা ভৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানং লব্ধা তথা শিষ্যা গুর্ব্বাৎ গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ, মধুমক্ষিকা মধু পাইবার জন্য যেমন এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করে, তেমনি জ্ঞান লাভ করিবার কারণ শিষ্য গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকটে গমন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র। গায়ত্রীর প্রধান নাম প্রণব। ওঁ ইহাই প্রণব। অ উ ম এই তিন অক্ষরে প্রণব অর্থাৎ ওঁ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ওঁ এই প্রণবের নাম ব্রহ্ম, বেদ, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র, বীজ, বীজমন্ত্র, প্রণব, পরমাত্মা, প্রাণ, বিশ্ব, শক্তি, মাতা ইত্যাদি। সমস্ত বৈদিক গায়ত্রিটী এই—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ—
সবিতুবরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই মন্ত্রে সপ্তবার ওঁ সমাযুক্ত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ওঁ এই যুক্তাক্ষর অ উ ম এই তিন অক্ষর সমাযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অ অর্থে ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, উ অর্থে বিষ্ণু অর্থাৎ পালনকর্ত্তা এবং ম মানে মহাদেব (প্রলয়-কর্ত্তা)। ভগবানকে কেবল অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ন্যায়বান এবং পবিত্রতম বলিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না, তাঁহাকে আমাদের এবং সমগ্র চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, গ্রহ নক্ষত্রাদিময় সমুদয় বিশ্ব-সংসারের সৃজনকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ওঁ এই মন্ত্রে ভগবানের সৃজনশক্তি, পালনশক্তি ও সংহারশক্তি একত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা এবং শিবরূপে সংহারকর্ত্তা। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে পিতা, পালনকর্ত্তারূপে রাজা এবং সংহারকর্ত্তারূপে বিধাতা। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান কহিয়াছেন, "অক্ষরং (ওঁ) পরমং ব্রহ্ম"। মনু কহিয়াছেন, "একাক্ষরং (ওঁ) পরং ব্রহ্ম"। মনু আরও কহেন, অ উ ম এই তিনই ব্রহ্ম। "ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম"। (মনুসংহিতা ১১ অ ২৬৬ শ্লোক)।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নির তহদ্ভুর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥ মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়)।

গীতায় ভগবান্ পুনরপি বলিয়াছেন, "গিরামস্ম্যেকমক্ষরং"। "সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ (ওঁ)। গীতার নবম অধ্যায়ে আছে, "বেদাঞ্চ পবিত্রমোঙ্কার," অন্যত্রে ভগবান্ কহিয়াছেন, আমিই প্রণব (ওঁ)। গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে

ঈশ্বর কহিতেছেন, "ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী"। বেদের ব্রাহ্মণভাগে, বেদান্তে ও স্মৃতিতে এই প্রণব বা ওঁকার ওঁ তৎসৎ রূপে বিদ্যমান আছে। মনুসংহিতায় ভগবান্ স্থষ্টিকর্ত্তারূপে ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; "স্রষ্টা স পুরুষো লোকে ব্রহ্মা ইতি কীর্ত্যতে"। গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন, "আমি অ" (অর্থাৎ স্থষ্টিকর্ত্তা) "অক্ষরা নাম অকারোস্মি"। মনুসংহিতা ও পাণিনি এবং বহু শাস্ত্রে উ বিষ্ণুর নাম এবং ম মহাদেবের (শিবের) পরিচয়। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং করিয়াছেন, "আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত, অর্থাৎ আমিই জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর কারণ।" সুতরাং তিনিই জন্মদাতা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। ১। "অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।"

২। "আবভক্ত ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।

ভূত ভর্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥"

অর্থাৎ—ঈশ্বর পোষক, উৎপাদক ও ভক্ষক (নাশক)। সাত্বিক প্রকৃতির লোকেরা ভগবানকে স্থষ্টিকর্ত্তারূপে বিশ্বাস করিয়া কৃতজ্ঞ হয়েন, পালকরূপে বিশ্বাস করিয়া অনুগত ও ভক্ত হয়েন এবং নাশকরূপে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে মান্য ও ভয় করেন; ইহাতে কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য, ভক্তি ও ভয়ের শিক্ষা হয়, সুতরাং পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে, পাপ কর্ম্ম করিতে মনোমধ্যে ভয়ের উৎপাদন হয়। "The fear of God is the beginning of wisdom."—এই ওঁ মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই জ্ঞান নিহিত আছে। মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ Trinity, হিন্দুর অ উ ম (ওঁ) অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রকার ভেদমাত্র। সাধারণভাবে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা নিম্নলিখিতরূপে গায়ত্রী উচ্চারণ করেন;—

ওঁঃ ভূঃ ওঁঃ ভঁব ওঁ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণাম্

ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

পূর্ব্বে ওঁ মন্ত্রের অর্থ করা হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত গায়ত্রীর অর্থ করা যাইতেছে। পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি দৃষ্টিপথের অতীত। সেই কল্পনাতীত জ্যোতিষ্মান্ ভগবান্ দৃষ্টিপথে আসিলে মানব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সূর্য্য অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ কিছুই নাই; সূর্য্যমণ্ডলে ভগবানের অবর্ণনীয় সামর্থ্য এবং সৃজন পালন ও সংহারশক্তি এবং অভাবনীয় জ্যোতিঃ নিহিত আছে। সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষা আর কোথাও তাঁহার অধিকতর জ্যোতিঃ প্রকাশ নাই, এইজন্য সূর্য্যই

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সমস্ত গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য্যের স্তোত্রচ্ছলে ভগবানের উপাসনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের যত প্রকার উপাধি বা নাম আছে, তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দ এই নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। ইহা সৎ চিৎ এবং আনন্দ,এই তিন শব্দে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সৎ শব্দের অর্থ নিত্য, অর্থাৎ তিনি নিত্য বর্ত্তমান ; চিৎ শব্দের অর্থ প্রকাশ (জ্যোতিঃ) এবং আনন্দ শব্দের অনেক অর্থ। আনন্দ শব্দের অর্থ শান্তি, ধর্ম্ম, সুখ, প্রাণ, ইত্যাদি। শান্তি ভিন্ন সুখ হয় না, সুখ ভিন্ন প্রাণধারণ হয় না, এবং প্রাণ না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না ইত্যাদি। ঈশ্বরের অপর নাম জ্যোতিঃ বলিয়া তিনি অগ্নি, তেজ, চিৎ প্রভৃতি উপাধিতে খ্যাত। ঋক্ বেদের প্রথম শ্লোক এই ;—

"অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্ন ধাতমৃ॥"

এস্থলে ভগবান্‌কে অগ্নিরূপে যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ ও দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূতরত্নধারী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্লোকে বিভাবসু মধ্যস্থিত মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাই বুঝাইতেছে, কিন্তু আরও পরিষ্কার করিয়া কয়েকটী বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম ;—

গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতং গর্ভশ্চ রথাং॥
অদ্রৌ চিদস্মা অং তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃত সাধীঃ। ১
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামাধা এক এব সং প্রশ্নং ভুবনাং যং তানা॥ ২

অর্থাৎ—"যে অগ্নি (মহাতেজ) জলের মধ্যে, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্থের মধ্যে, জঙ্গমের মধ্যে, যজ্ঞগৃহে, পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তিনিই সকলের নিকট হব্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবৎসল রাজার ন্যায় হিতকারী, তিনি আমাদের উপদেশক, তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, বিধাতা, তিনি একেশ্বর, তিনিই সমস্ত ভুবনের জিজ্ঞাস্য এবং তিনিই এক হইয়াও অনেক দেবতার নামে উপাহিত। তিনি জীবাত্মা ও বল দিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকলে মান্য করে, তিনি অমৃতস্বরূপ,তিনি সকলের প্রভু, তিনি স্রষ্টা,তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার পূজা করিব?" এই শ্লোকে ভগবানের পিতা, বিধাতা, ঈশ্বর, স্রষ্টা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রভু প্রভৃতি নামের পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে। যাহারা বলে বেদের সময়ে ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরপূজা ছিল না, কেবল পদার্থপুঞ্জের স্তোত্র ছিল, তাহাদের ভ্রম এক্ষণে দূরীভূত হউক। যাহারা বলে বেদের সময়ে ভারতের আদিম

পুরুষেরা অসভ্য ছিল, তাহারা এই শ্লোকে "রাজা" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাইবে, ইহাতে বুঝা যায়, তখন সভ্যজাতির ন্যায় রাজ্যপালন ও শাসনপ্রথাও বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক, ভগবানের অপর নাম অগ্নি। ব্রাহ্মণেরও অপর নাম অগ্নি, অগ্নি তেজোময়; তেজোময় পদার্থপুঞ্জের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ সূর্য্য সমতুল্য জ্যোতিঃস্বরূপ। গায়ত্রী দ্বারা সূর্য্যের স্তব করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা করা হইয়াছে।

সূর্য্য না থাকিলে তেজের (অগ্নির) উৎপাদন হয় না; সূর্য্যের অপর নাম সবিতা; এই সবিতাই অগ্নির প্রসূতি, সুতরাং ব্রাহ্মণের মাতৃস্বরূপিণী। ওঁ দ্বারা ভগবান্কে পিতারূপে স্তব করা হয়; সমস্ত গায়ত্রী দ্বারা ভগবান্কে মাতৃরূপে ভজনা করা হইয়া থাকে। এক্ষণে সমুদয় গায়ত্রীর অর্থ শ্রবণ কর ও বুঝিতে চেষ্টা কর। ওঁ তৎসবিতু—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ শ্রীভগবানকে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা শ্রীভগবান্কে, অর্থাৎ সৃজনশক্তি পালনশক্তি এবং প্রলয়শক্তি-সমন্বিত শ্রীশ্রীভগবান্কে আমি (ওঁ কহিয়া) স্তুতি করি, সেই ভগবান সবিতা (সূর্য্য), সুতরাং "বরেণ্যম্" (শ্রেষ্ঠম্); "ভর্গদেব" অর্থে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ; অর্থাৎ আমি সেই সৃজন,পালন ও প্রলয় শক্তিশালী, মহা তেজোময় ভগবান্কে সূর্য্যনারায়ণরূপে স্তুতি করি;" এইজন্য সূর্য্যদেবতার অপর নাম ব্রহ্ম। "ধী" অর্থে বুদ্ধি, "মহী" অর্থে পৃথিবী, "ধিয়ো" অর্থে জ্ঞান এবং "প্রচোদয়াৎ" অর্থে প্রেরণ করা। অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের বুদ্ধি (কৌশল) স্বরূপ, তিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া প্রকৃত (ব্রহ্ম) জ্ঞান দান করুন। ভূঃ শব্দে পৃথিবীলোক এবং স্বঃ অর্থে স্বর্গলোক। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত আকাশের এবং সমস্ত স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি, তিনি আমাদিগকে জ্ঞানজ্যোতি প্রদান করিয়া আলোকিত করুন। সম্পূর্ণ বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে সপ্তবার ওঁ বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই, ওঁকার রূপ পরব্রহ্ম সপ্তভাবে প্রকাশ হইয়া বিশ্বমঙ্গলে বিস্তার হইয়াছেন। তদ্যথা—সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, সপ্ত ঋষি (সপ্তর্ষিমণ্ডল), তদ্ভিন্ন ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা সূর্য্য (এই সপ্ত), তদ্ভিন্ন দেহ, মন, আত্মা, হৃদয়, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, বিবেক (এই সপ্ত), তদ্ব্যতীত সত্ব, রজ, তম, পুরুষ, প্রকৃতি, সত্য, তপঃ এই সাতভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। এক্ষণে গায়ত্রীর নিষ্কাসিত অর্থ শ্রবণ কর।

বয়ং দীনজনাঃ তৎসবিতু সৃষ্টিকর্ত্তুঃ জ্যোতি স্বরূপঃ ব্রহ্মণেঃ বরেন্যং শ্রেষ্ঠঃ।

স্বয়ং সিদ্ধং ভর্গো বর্চ্চসং বেদোক্তং যৎজ্ঞানমস্তি।

তদেব তেজসং ধীমহি যো দেবো নোস্মাকম্।

ধিয়ঃ শুভ কর্ম্মানি প্রচোদয়াৎ প্রেরণং কুর্য্যাৎ।

অতঃপর সূর্য্যনারায়ণের তর্পণমন্ত্র শ্রবণ কর;—

ওঁ নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে বিষ্ণুত তেজসে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে ইদমর্ঘং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ওঁ জবাকুসুম সাঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকর।

নৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে, নিয়ত গায়ত্রী জপ করিতে বিশেষতঃ ত্রি-সন্ধ্যায় ইহা জপ করিতে ব্রাহ্মণগণ বাধ্য। বেদশাস্ত্রের "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীৎ" বাক্য নৃসিংহপুরাণে সমর্থিত হইতেছে।

জপেৎ গায়ত্রীং নিয়তং ত্রিসন্ধ্যাসু বিশেষতঃ।

অন্যাংশ্চ পগতান্ বিপ্রান্ পূজয়েদ বিরোধতঃ॥

ইহা ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম; গায়ত্রী জপ দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়, চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, এবং সর্ব্বপাপ ও অপরাধের ইহা নিত্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। শ্রীমৎভাগবতের সপ্তম স্কন্দের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে, ব্রাহ্মণগণকে দশবিধ সংস্কারগুলি গায়ত্রী মন্ত্র সহ সমাধা করিতে ঋষিরা ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহা না করিলে তিন দ্বিজ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। "সংস্কারাযত্রাবচ্ছিন্না। সদ্বিজোজগদয়ৎ" মহাকবি ভবভূতি বলেন "গুণাং পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ং"। অর্থাৎ গুণই শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ বা বয় শ্রেষ্ঠ নহে। সর্ব্ব শেষ কথা এই যে, ক্রিয়াহীণ, গায়ত্রী-হীন, ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন ও মূর্খ এবং নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল বলিয়াই গণ্য; ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য বা প্রণম্য হইতে পারে না।

অত্রিসংহিতার ৩৭৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।

নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥

যাহা হউক, পুত্র যেমন পিতার বৃদ্ধকালে সহায়, ভাই যেমন বিপদকালের সহায়, সখা যেমন সর্ব্বাবস্থায় সহায়, ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী তেমন ইহলোকের ও পরলোকের সহায়।

বেলুচি-মুলুক।

পণ্যযাত্রী, পথিক ও পরিব্রাজকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পেশাওয়ার অতিক্রম করিয়া আফগান-প্রদেশে গমন করে এবং তথা হইতে বেলুচিস্থানে পৌঁছিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ বা করাচি-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সোলেমান-পর্ব্বতের উপর দিয়া সেখানে যায়। আফগানিস্থানের পথে অভ্রভেদী হিন্দুকুশ-গিরি অতিক্রম করিতে হয়। যে দিক্ দিয়াই হউক, পথিককে ভীষণ হইতে ভীষণতর দুইটি "পার্ব্বত্য, সন্ধি"র (Mountain Pass) ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে। ইহাদের একটির নাম গুমআল্-পাস্ এবং অপরটি বিখ্যাত বোলান্-পাস্ (Pass)। আমি যখন বেলুচি-মুলুকে যাই, তখন সেদিকে রেল্-ওয়ে-লাইন্ ছিল না; এখন কিন্তু সিন্দ্-পিশিন রেলওয়ে বোলান্-পাস্ ভেদ করিয়া গুল্-এ-ইশতান্ ছাড়াইয়া চমন্ Chaman পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এখনও অনেক ক্রোশ-পরিমিত রেলপথ পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে, বেলুচিস্থানে যাতায়াত আরও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিবে। বোলান্-পাস্ যে কি ভয়ানক, স্বচক্ষে যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। সে ভীষণ পথে কেবল সাহসী মুসলমানেরাই গতায়াত করিতে পারে। গুমআল্-পাসের ভিতর দিয়া বহুসংখ্য পণ্যযাত্রী ভারতবর্ষের দিকে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আইসে। এই সন্ধি-পথের পার্শ্বে জোব্ উপত্যকা (Jhob Valley)। জোবাইগণ এই পথের প্রহরী ও রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু সুবিধা পাইলে, আরব্যের বেদ্দুইদিগের ন্যায়, ইহারা পথিক-বর্গকে নিহত বা হৃতসর্ব্বস্ব করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বোলান্-পাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ ক্রোশ, উচ্চতা (চড়াই) প্রায় ছয় হাজার ফিট্। এই পার্ব্বত্য-সন্ধির প্রায় সমুদয় অংশে "বোলান্" নামক নদ প্রবাহিত, সময়ে সময়ে ইহাতে ভয়ানক বন্যা হইয়া থাকে। সোলেমান-গিরিরাজের যে অংশ সিয়া-কো (কৃষ্ণ পর্ব্বত) নামে প্রখ্যাত, সেইখান হইতেই বোলান্-পাসের উৎপত্তি। এই পর্ব্বতমালা করাচির পশ্চিম-প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে কোঃ-এ-বাবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রধান পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ২৩ হাজার ফিট্।

বেলুচিস্থানের পুরাকালীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন—ইহার প্রাচীন নরপতি-বর্গের বিবরণ অতীতের তিমিরগর্ভে নিহিত।

পুরাকালে এই সকল প্রদেশ হিন্দুরাজার শাসনভুক্ত ছিল। আজিও আফগানিস্থানের পার্শ্বদেশে আফ্রিদি, কাফির, বারহুই প্রভৃতি জাতির মধ্যে হিন্দুত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বেলুচিস্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন শত ক্রোশ এবং বিস্তার দুইশত ক্রোশের কিছু কম।

বেলুচি-মুলুকে অনেক নদনদী আছে, সময়ে সময়ে সেগুলিতে ভয়ানক বন্যা হয়। পশ্চিমদিকে মরুভূমি সকল গ্রীষ্মকালে এরূপ উত্তপ্ত হয় যে, তাহা অতি-ক্রম করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পবনবেগোত্থিত বালুকায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পথিকের শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, কালগ্রাসেও অনেকে পতিত হইতে থাকে। এদেশে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, শীতও তেমনি হাড়ভাঙ্গা। এইজন্যই বোধ হয় এস্থান এরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ। ভারতবর্ষের সকল প্রকার শস্য ও শাক্-সবজি এখানে পাওয়া যায়। এখানকার গন্দাবা-নামক স্থানটি অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদেশে শার্দ্দূল ও হায়েনার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। এখানকার শুষ্কফল, পশম, বনাত ও কম্বল সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

সমগ্র বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। অধিবাসীরা দেখিতে সুন্দর, বলবান্, সাহসী এবং দীর্ঘাকার। এদেশে দুধ ভারি সস্তা; লঙ্কা, মরীচ, পলাণ্ডু ও লশুনের ব্যবহারটা খুবই বেশি; সুরাপানের প্রথা একেবারেই নাই। এখানের অধিকাংশ গৃহই মাটির। এদেশে কৃষ্ণকায় উষ্ট্রের চর্ম্মে এক প্রকার তাঁবু তৈয়ারি হইয়া থাকে, সেগুলি অনেক গৃহস্থের গৃহের কার্য্য করে। দ্রুতগামী একটি উষ্ট্র, এবং প্রচুর সুস্বাদু জল, খানকয়েক রোটি ও গোটাকত খেজুর দিয়া বেলুচিদিগকে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই পাঠাইতে পার। ইহারা সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল ও অতিথিপ্রিয়। অতিথিকে ইহারা যথেষ্ট খাতির যত্ন করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সঙ্গীতপ্রিয় এবং বালকদের তীর ধনু চালাইবার পটুতা প্রশংসনীয়। এদেশে এখনও ক্রীত-দাসের ব্যবসা প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা রূপবতী এবং তাহাদের পরি-চ্ছদও সভ্যজনোচিত। অলঙ্কারপ্রিয়তা এদেশে ততটা বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। তবে রমণীকুল ফুলের বড় পক্ষপাতিনী। পর্ব্বতের নিকট বন্ধুর-তার ভিতরে—মরুভূমির অগ্নিদীপ্ত রুদ্রতার মধ্যে একটি ফুল উপহার পাইলে, সেই ফুলটি লইয়া উপহারদাতার প্রতি ইহারা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটা-

ইয়া দেয়। এখানে তরবারির বড় আদর। এজন্য তরবারি-পরিচালনে পুরুষেরা যেমন দক্ষ, বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকেরাও তেমনি নিপুণ। লেখা-পড়ায় ইহাদের তেমন মনোযোগ দেখা যায় না। ইহারা বলিয়া থাকে, "একদিকে সমগ্র বোখারা বা বোগ্‌দাদের পাণ্ডিত্যে একাধিকার, আর একদিকে তরবারিবিদ্যায় আশানুরূপ দক্ষতা, উভয়ের মধ্যে শেষোক্তকেই আমরা অধিকতর শ্লাঘা ও সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করি।"

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুচিরাজ মোরাব খাঁর সহিত বৃটিশরাজের সর্ব্বপ্রথম কলহ উপস্থিত হয়। তারপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্র অনুসারে ইংরেজ-সরকার বেলুচিস্থানের অধীশ্বরকে প্রতিবৎসর ৫০ হাজার টাকা উপঢৌকন দিতে থাকেন। ১৮৭৬ অব্দের নূতন সন্ধিপত্রে ঐ ৫০ হাজারের পরিমাণ বাড়িয়া ১লক্ষ হইয়া উঠে, সেই ১ লক্ষ আবার ১৮৮২ অব্দে ১ লক্ষ ৩০ হাজারে পরিণত হয়। বেলুচিস্থান রুষভল্লুকের ভারতপ্রবেশের একটি প্রধান পথ। সুতরাং ইশলামীয় জলবাহীর (ভিস্তির) চর্ম্মনির্ম্মিত জলাধারের (মোশকের) ন্যায়, উপঢৌকনের পরিমাণটা ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে ১৮৯৩ অব্দ হইতে ১ লক্ষ ৫৫ হাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলুচি-মুলুকের নরপতির শিক্ষিত সেনা ১৩ শত, কিন্তু আবশ্যক হইলে একদিনেই তিনি ১২ হাজার সৈন্য সমবেত করিতে পারেন। এখানে দেশ-শুদ্ধই বীরপুরুষ। স্বধর্ম্ম বা স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার কথা উঠিলে প্রাণ দিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী দৌড়িয়া আইসে। বেলুচিস্থানের বাদ্‌শাহের বাষিক আয় পাঁচলক্ষ টাকার অধিক নহে। আমাদের দেশের একজন বড় জমিদারের অপেক্ষাও বেলুচি-মুলুকের খাঁসাহেবের আয় অল্প, কিন্তু তবুও পুরাকাল হইতে তিনি স্বাধীন। খেলাতনগরে নরপতি বাস করেন, ইহাই বেলুচিস্থানের রাজধানী। সহরের চারিধারে প্রাচীর; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খাঁসাহেবের প্রাসাদ। য়ুরোপীয় লেখকেরা অনেকে মনে করেন, এক সময়ে হিন্দুরাজগণ এই প্রাসাদে অবস্থান করিয়া ভারতপ্রান্ত শাসন ও রক্ষা করিতেন।

"The Palace is an imposing and antique structure, and probably the oldest building in Beluchistan, owing to its foundation by the Hindu kings who preceded the present Mahomedan dynasty"—*The Statesman's Year Book* for 1901. খেলাতনগরে প্রায় ৩ হাজার গৃহ আছে। বাড়ীগুলি অর্দ্ধদগ্ধ ইষ্টকে "গারা"র

গাঁথুনি দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার উপরে চূণকাম করাইবার প্রথাটা সর্ব্বত্র প্রচলিত। বাজারে সচরাচর সকল প্রকার ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং নানান্তর ফলের সরবরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের প্রস্রবণ হইতে সুন্দর, শীতল, সুনির্ম্মল সলিলস্রোত প্রবাহিত হইয়া সহরের সর্ব্বত্র অধিবাসী-দিগকে পানীয় জলের অভাব অনুভব করিতে দেয় না।

বেলুচিস্থানের কিয়দংশ এক্ষণে ইংরেজে গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত। রুষীয় সম্রাটের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করাই তাঁহাদের এরূপ অধিকার-স্থাপনের উদ্দেশ্য। খোদা দাদখাঁর নামে যখন নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত হয়, বেলুচি-মুলুকের কিয়দংশ সেই সময়েই ইংরেজের শাসনাধীনে আসিয়া পড়ে। বেলুচিস্থানের পার্শ্বস্থ কোয়েটা, সিবি, পিশিন্ এবং ছোট ছোট আরও দুই একটি গ্রাম ও নগর স্বাধীন-বেলুচিরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে বৃটিশ-বেলুচিস্থান নামে পরিচিত হইয়াছে। কোয়েটা-নগরীতে ইংরেজের সেনাগণ ও প্রধান কর্ম্মচারী অবস্থান করেন। বৃটিশ-বেলুচিস্থানে লুশবয়লা নামে প্রকাণ্ড এক মুসলমানী জমিদারী আছে। ইহার জমিদারের নাম জাম্-আলি-খাঁ বাহা-দুর। ইংরেজেরা 'সার' ও 'নাইট্' উপাধি দিয়া ইঁহাকে হস্তগত করিয়া রাখিয়া-ছেন। বৃটিশ-বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ।

ইংরাজিতে Gulliver's Travels নামে এক সুপরিচিত হাস্যরসোৎপাদক ভ্রমণবৃত্তান্তময় পুস্তক আছে। তাহাতে গলিভার সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি তালগাছের মত উচ্চ ব্রব্‌ডীংগনাংগ নামক অদ্ভুত মনুষ্য জাতি দেখিয়াছেন। কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, বেলুচীস্থানে খুব দীর্ঘকায় মনুষ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতের লণ্ডন নগরে এক ইংরাজ আসিয়া-ছিল, তাহার উচ্চতা ৮ ফিট। তাহাকে দেখিয়া অনেকে বলিয়াছিল, এরূপ মানুষ আসিয়া মহাদেশে নাই। পাঠকেরা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, সে দিন বেলুচিস্থান-প্রবাসী এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী কানপুর নগরে একজন বেলুচির পায়ের জুতা চাহিয়া পাঠাইলে পর, পায়ের মাপ দেখিয়া জুতা-ব্যব-সায়ী ইংরাজ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। বেলুচির নাম হাজি গোলাম হবিবুল্লা, নিবাস কেলাৎ উপনগর। অবশেষে ইহাকে স্বয়ং কানপুরে আসিতে হইয়াছিল। দেখা গেল, ইহার দেহের উচ্চতা ৮ ফিট ৭ ইঞ্চি; জুতার মাপ প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৬।।০ ইঞ্চি প্রস্থ। ঐ মাপে জুতা প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু হবিবুল্লার সূক্ষ্ম পদযুগলে তাহা ঠিক হইল না!! সুতরাং বড় বড় গরুর

চর্ম্ম আনিয়া পুনরায় জুতা তৈয়ার করিবার জন্য সাহেবেরা মুচিদিগকে হুকুম দিল। এবারে আয়তন বৃদ্ধি করায় জুতা পায়ে ঠিক বসিয়া গেল। হবিবুল্লার মত লোক বেলুচি মুলুকে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এখনও অনেক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একটা বৃহদাকার ছাগমাংস শ্রীমৎ হবিবুল্লা একাকী ভোজন করিতে সক্ষম। এমন স্বল্পভোজী পুরুষ বেলুচি মুলুকে অপ্রতুল নহে।

৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম—ইংরাজি ১৮৪৭ অব্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী। বাঙ্গালা ১২৫৩ সাল।

মৃত্যু—৬ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, ১৯০৭।

সমাধি স্থান—কলিকাতা, সার্কুলার রোড।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাই! যিনি ইউরোপীয় ও স্বদেশীয় সমাজে সমভাবে সমাদৃত হইতেন, যাঁহার সুমধুর সম্ভাষণে, সুধামধুর সদালাপে এবং চিত্ত-বিনোদক জ্ঞানগর্ভ উপদেশে, কি প্রবৃদ্ধ পুরুষ, কি অজাতশ্মশ্রু বালক, সকল শ্রেণীর লোকেই সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয় কালীচরণ আর নাই! তিনি ভবধামে নরলীলা সমাপন পূর্ব্বক নরোচিত মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি, সদাহাস্যময় বদন, বিস্ফারিত নয়ন, মৃদু মধুর বাণী, আর আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। সেই অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মী ও পাণ্ডিত্যশালী লেখক, সেই চিন্তাশীল দার্শনিক ও বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ্ প্রাজ্ঞ, সেই অশেষ গুণশালী অধ্যাপক এবং সেই কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর এত দিন আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে আমোদিত ও আলোকিত করিতেছিলেন; অকস্মাৎ তিনি স্বদেশবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃসময়ে এই দৃশ্যমান সংসারক্ষেত্র হইতে অদৃশ্যমান সংসার ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সাধু কালীচরণ মহামতি যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং যে স্বর্গ রাজ্যের অস্তিত্বে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এখন পুণ্যবলে সেই শান্তিময় স্বর্গলোকে তাঁহার চিরাভীপ্সিত যিশুর সম্মুখে অখণ্ডানন্দে ও সহাস্যবদনে কালীচরণ দণ্ডায়মান, আর আমরা এই দুঃখময় মায়াধামে তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া রোরুদ্যমান অবস্থায় অবস্থিত! সংসারের ইহাই যুগযুগান্তরব্যাপী বিধি,—এখানে কেহ আসে, কেহ যায়; কেহ

হাসে, কেহ কাঁদে; কেহ উঠে, কেহ পড়ে; কাহারও আগমনে আনন্দের মহারোল উঠে, কাহারও অন্তর্ধানে রোদনের কোলাহল ছুটে।

মৃত্যুর অধীন সকলেই; যে জন্মে সেই মরে, ইহা ধ্রুব সত্য। এই বিধির বৈপরীত্য সাধনে কেহই সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, অশোক, শঙ্করাচার্য্য, নেপোলিয়ন, জুলিয়স সিজর, সেক্ষপির, কালিদাস, আকবর, হেন্‌রী, প্রভৃতি এই দৃশ্যমান সংসার ধামে চিরদিনের জন্য কেহই অমর হইয়া আইসেন নাই, সুতরাং কালীচরণও শমনের এই সনাতন নিয়মটীকে লঙ্ঘন করিতে পারেন কি? কালীচরণের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত নহি, কারণ মৃত্যুর অধীন সকলেই; কিন্তু তাঁহার অভাবে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্যই আমরা দুঃখিত। মৃত্যুর অপর নাম "অভাব"। যাহার মরণে কোন ক্ষতি কিম্বা অভাব বোধ হয় না, তাঁহার মৃত্যুরও কেহ সম্বাদ লয় না। এই নশ্বর মর্ত্ত্যধামে প্রতিদিন কত অসংখ্যাসংখ্য নরনারীর মৃত্যু হইতেছে; প্রতিদিন হিন্দুর শ্মশানে ও সমাধি-ক্ষেত্রে, মুসলমানের গোরস্থানে এবং খ্রীষ্টানের কবর-প্রাঙ্গণে কত প্রাণীর মৃত দেহ প্রদগ্ধ বা প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, কে কাহার সমাচার লয়? কে কাহার অভাবে অসুখী হয়? যাহার মরণে সমাজ, জাতি বা দেশ, অভাব বা অলাভ অনুভব করে, তাহার মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ব্যথাজনক। কালী-চরণের মৃত্যুতে আমরা অভাব ও ক্ষতি বোধ করিতেছি, সুতরাং এ হেন পুরুষ অবশ্য বরণীয়। গণনীয় ও বরণীয় না হইলে, কাহারও মরণে অভাব অনুভূত হয় কি? বাস্তবিক কালীচরণের মৃত্যুর পরে আর একটী কালীচরণ পাইব না, ইহা নিশ্চয়। কালী বাবুর জীবিতাবস্থাতেও তাহার সমতুল্য পুরুষ এদেশে ছিল না এবং এখনও নাই, সুতরাং তাঁহার বিরহ নিতান্তই ব্যথাজনক।

আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ বঙ্গাকাশের উজ্জ্বল তারকাগুলি উত্তরোত্তর নির্ব্বা-পিত হইয়া যাইতেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অগণ্য অসাধারণ পুরুষ বঙ্গ-ভূমে গত একশত বর্ষ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু একে একে তাঁহাদের সকলেই চলিয়া গিয়াছেন; দুই চারি জন ব্যতীত বঙ্গদেশে এখন আর প্রকৃত মহাপুরুষ কোথায়? বিগত পঞ্চত্রিংশ বর্ষ কাল মধ্যে বাঙ্গালায় যত সংখ্যক বড় লোক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে—আর কোন সমাজে—এত অল্প কাল মধ্যে এতগুলি বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই দুরদৃষ্ট; বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা অতীব অশুভ লক্ষণ। না জানি কি গ্রহদোষে—

কি মহাপরাধে—এই মহা ক্ষতির সৃজন হইয়াছে। কালীচরণের মৃত্যুতে সেই জন্যই আমরা অধিকতর ব্যথিত এবং অতীব আতঙ্কিত। বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সকল মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সমতুল্য লোক আর পাইতেছি না; যে স্থান শূন্য হইয়া যাইতেছে, সেই স্থান আর পূরণ হইতে দেখিতেছি না; পূরণ হইবার আশাও অল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং বড় লোকের মরণে আমাদের বিষম আশঙ্কা জন্মে। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রকৃত বড়লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বড়ই ব্যথিত।

বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে একটা বিশেষত্ব—একটা অসাধারণত্ব—ছিল, সেই বিশেষত্ব ও অসাধারণত্বটুকু বাঙ্গালী জীবনে সাধারণতঃ প্রায় দেখা যায় না। পৃথিবীর দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানযুগে কোথাও প্রায় সম্পূর্ণ আদর্শ মনুষ্য আদৌ দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র এবং অতি পরাধীন দেশে সম্পূর্ণ আদর্শমনুষ্য আজি কালিকার দিনে প্রায়ই জন্মগ্রহণ করেন না। বঙ্গদেশের গৌরব ও সৌরভের প্রশংসা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলা যায়, এখনকার দিনে বাঙ্গালী জাতিতে সম্পূর্ণ আদর্শ মানব জন্মুন আর না জন্মুন, এদেশে এমন কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ আদর্শ মানবের দৃষ্টান্ত হইতে সক্ষম না হইলেও, আদর্শের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাবু কালীচরণ এই শ্রেণীর লোক, সুতরাং ইঁনি বাঙ্গালার সৌরভ এবং বাঙ্গালীর গৌরব। কথাটীকে বুঝাইবার জন্য অবান্তরভাবে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ স্ফুরণ না হইলে মানুষকে "সম্পূর্ণ আদর্শ মানব" বলিতে পারা যায় না। মনে কর, যাহার একটী পদ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অপর পদটী খঞ্জ, অসুস্থ এবং বিকল, অথবা যাহার দেহের বাম অঙ্গগুলি পূর্ণ এবং দক্ষিণাঙ্গগুলি অপূর্ণ, সে ব্যক্তিকে কেহ কি পূর্ণাবয়বসম্পন্ন মানুষ বলিতে পারে? যে বিদ্বান ব্যক্তি কেবল দুই একটী বিদ্যায় অভ্যস্ত বা পারদর্শী, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ক বিদ্যাগুলিতে একেবারে অজ্ঞ, সে ব্যক্তি কখন "পূর্ণ পণ্ডিত" বলিয়া বা আদর্শ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এইরূপে, যাঁহার দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ স্ফুরণ বা বিকাশ প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই "আদর্শ পুরুষ" এই মহাগৌরব-ব্যঞ্জক উপাধিতে সম্বোধিত হইবার যোগ্য। কালীচরণ "সম্পূর্ণ আদর্শ" ছিলেন না, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু

আদর্শের দিকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। বাবু কালীচরণকে আমরা তাঁহার তরুণাবস্থা হইতে দেখিয়া আসিতেছিলাম; তিনি কদাকার পুরুষ ছিলেন না, তাঁহার সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাকে সুন্দর সুঠাম পুরুষ বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর একদিকে যেমন প্রাবৃটের নবনীরদের ন্যায় গুরুগম্ভীর, অপরদিকে তেমনি সুকোমল বালকের ন্যায় শ্রুতিমধুর ছিল। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সভা ও সভাস্থ সকলকে কম্পিত বা প্রতিধ্বনিত করিতে পারিতেন এবং মৃদুমধুর বাণী দ্বারা নাস্তিক ও পাষাণ হৃদয়বান লোককেও প্রেমমুগ্ধ করিতে পারিতেন। তাঁহার দেহে অসাধারণ বল ছিল। যুবাকালে তিনি একজন পাল্‌হোয়ান বা বীর বলিয়া গণ্য হইতেন। সমস্ত জীবনে তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয়, নবগোপাল মিত্রের প্রবর্ত্তিত সে কালের "হিন্দুমেলা"য় একবার বাঙ্গালী বাবুদিগের শারীরিক সামর্থ্যের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। সিটি কলেজের বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম, এ, মহাশয়ের মাতুল ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র (শর্ম্মা) এম-ডি, এবং কলিকাতার সুবিখ্যাত কায়স্থ পাল্‌হোয়ান বাবু অম্বু গুহ মহাশয় প্রভৃতি ইহার পরীক্ষক ছিলেন। এই পরীক্ষায় কালীচরণ বাবু সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রবীণ বয়সেও কালীচরণ শক্তিহীন হয়েন নাই। সমস্ত জীবন তিনি সমভাবে অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহের সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অসাধারণরূপে দৈহিক বলশালী হইয়াও কখনও উগ্র প্রকৃতিক হয়েন নাই, কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন নাই, কাহারও মর্য্যাদার হানি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এত বড় বীর হইয়াও তিনি সমস্ত জীবন সাধুর ন্যায় কোমল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মানব জীবনের এই অসাধারণত্বটুকু অতি অল্প লোক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের সংশ্রবে থাকিতেন; নানা প্রকৃতির ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংসর্গে তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইত; অথচ তিনি অহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন না। এত বড় সম্মান ও সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিলাসী বা অসংযত পুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন নাই। তিনি চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। শত

সহস্র প্রকার প্রশংসার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তিনি বিমল চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। এখনকার দিনে এরূপ সমাজে এমন চরিত্রবান পুরুষ খুজিয়া পাওয়া দুর্লভ। কালীচরণের জীবনের এই একটী অসাধারণত্ব।

মহাত্মা কালীচরণ তরুণ বয়স হইতে ইউরোপীয় সংশ্রবে দিন যাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কিন্তু পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনে একদিনের জন্যও সাহেব সাজেন নাই। বাবু কালীচরণ, সমস্ত জীবনে হ্যাট্ স্পর্শ করেন নাই। তিনি ধূতী, চাদর, পির্‌হান অথবা চোগা, চাপকান, পায়জামা এবং টোপি ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল। দেশীয় জিনিষ পাইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে বিলাতী জিনিষ তিনি আদৌ ব্যবহার করিতেন না। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টানের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি বিদেশীয় ভাবাপন্ন ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ভারত মাতার সেবক বলিয়া গৌরব করিতেন এবং সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার বাসাবাটীতে আমি অনেক বার গমনাগমন করিয়াছিলাম, অনেকবার ব্রাহ্মণ পাচক, হিন্দু দ্বারবান, বাঙ্গালী দাসী এবং হিন্দু চাকর দেখিয়াছি। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি টেবিল ব্যবহার করিতেন না। অনেক সময়ে ভূমির উপরে কাষ্ঠাসনে বসিয়া পিতলের থালায় অথবা কলাপাতে তিনি ভাত খাইতেছেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি কখন বিলাত গমন করেন নাই, অথচ একজন ইংলণ্ডজাত ইংরাজ যে পরিমাণে সামাজিক আদব্ কায়দা জানে, কালীবাবু (আবশ্যক হইলে) তদপেক্ষাও অধিকতর আদব্ কায়দায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিতেন। তিনি বিলাত যান নাই সত্য, কিন্তু ইউরোপ না গিয়াও তিনি যে পরিমাণে ইংরাজি জানিতেন, বিলাতের অসংখ্য লোকের মধ্যেও এরূপ ইংরাজি অতি অল্প লোকেই শিখিয়াছে। ইংরাজি ভাষায় তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইংলণ্ড না গিয়াও বাঙ্গালী যে অসাধারণ ইংরাজী পণ্ডিত হইতে পারে, কালীচরণের জীবন তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গালী সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোকের একটা প্রধান দোষ আছে। তাঁহারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে শিক্ষা করেন না—"দু'কূল রাখিতে জানেন না।" তাঁহারা প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিলে রাজাকে চটাইয়া দেন;

স্বদেশীয় পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংরাজকে রাগাইয়া তুলেন। কালীচরণ সম্পূর্ণ ভাবে বঙ্গমাতার সুসন্তান হইয়া, সম্পূর্ণভাবে "স্বদেশী হইয়া" এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা সাধারণকে—ইংরাজ ও ভারতবাসীকে সমভাবে প্রিয় রাখিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার জীবনে অসরলতা, কপটতা বা দুষ্টস্বার্থাভিলাষ ছিল না। কালীচরণের জীবনের এই মহত্ত্বটুকু, এই অসাধারণত্ব ও বিশেষত্বটুকু বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক গুণ ছিল, একে একে কতকগুলি প্রধান গুণের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণী সভা সমূহের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাবু প্যারীচরণ সরকার ও বাবু কালীচরণের নাম এজন্য এদেশে চিরকাল সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইতে থাকিবে। ইঁহাদের পূর্ব্বে এদেশে সুরাপান নিবারণ-সম্বন্ধে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যখন সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন করেন, বাবু কালীচরণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এতদুপলক্ষে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত যোগ দিয়া মহাত্মা কালীচরণ বঙ্গদেশের অনেক নগরে "সদাচারিণী সভা" (Purity Society) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কালীচরণ পল্লীগ্রামের পাঠশালার সংস্কার কার্য্যে সাহায্য করিতেন। পাদ্রী মাকডোনালড্ সাহেবের এবং এই লেখকের সহযোগীতায় কালীচরণ এদেশে সর্ব্বপ্রথমে উদ্যান, প্রান্তর, রাজবর্ত্ম প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্যভাবে সর্ব্ব-সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ ও সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। কলিকাতার বিডন গার্ডেনে সর্ব্ব প্রথমে এই প্রথার সৃষ্টি হয়। কলিকাতা মহানগরীর অনেক "খ্রীষ্টীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের" তিনি স্থাপনকর্ত্তা ছিলেন। অনেক দরিদ্র শিশুকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। অনেক বিদ্যালয়ে তাঁহার রীতিমত দান ছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ডফ্‌কলেজের উন্নতির তিনি অন্যতম হেতু; প্রভিন্‌সিয়াল কন্‌ফারেন্সের তিনি প্রথম প্রস্তাবক; মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক অবৈধ ৯ আইন উঠাইয়া দিবার তিনি অন্যতম সহায়; এতদ্দেশীয় ছাত্রের বিলাত বা বিদেশ গমনের তিনি উৎসাহদাতা এবং ১৮৭৪ সালের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ নিবারণের তিনি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। যখন সাহিত্য পরিষদ বা সাহিত্য-সভা ছিল না,

সেই অতি পুরাতন কালে কালীচরণ বাবু বঙ্গসাহিত্য সভার সভাপতি থাকিয়া নানা প্রকারে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল, তিনি সুন্দররূপে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে, পড়িতে, কথা কহিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কালীচরণের জীবিতাবস্থায় এদেশে এমন কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠান হয় নাই, যাহাতে তাঁহার সম্পর্ক ছিল না। বহু সভা, সমিতি, কমিটি প্রভৃতির তিনি সম্পাদক বা সভ্য ছিলেন। তিনি গোপনে বা প্রকাশ্যে নানা ভাবে এদেশের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। যেমন হিন্দুসমাজ, তেমনি খ্রীষ্টীয়সমাজ, তেমনি ইউরোপীয় সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহানুভূতি ছিল। কন্‌গ্রেসের তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন; ইহার প্রতিষ্ঠা কালে ইনি ইহার প্রাণ স্বরূপ গণ্য হইতেন। ১৯০৭ অব্দের কলিকাতা কন্‌গ্রেসে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বলাবস্থাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিরাট সভাস্থলে তিনি দুর্ব্বলতা বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি কংগ্রেশ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। দেশের প্রতি তাঁহার এই প্রকার অনুরাগ নিতান্ত অনুকরণীয়।

কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটে ইয়ংমেন্‌স্ খ্রীষ্টান আসোসিয়েশন নামে যে সুবৃহৎ অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। এই অট্টালিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ এবং কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। ইহার অন্তর্ভুক্ত সভায় বহু সংখ্যক বালক বালিকা অবস্থান করিয়া আহার ও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বহু ছাত্র এই সভার হোষ্টেল ও বোর্ডিংয়ে বাস করে। আসোসিয়েশনের হলে সকল শ্রেণীর লোকের প্রকাশ্য সভা হয়, এবং মাসিক বহু অর্থ ব্যয়ে এই অট্টালিকার ও অট্টালিকার অন্তর্গত কার্য্যাবলী সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন এই সুরম্য ও সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়, তখন এতদুপলক্ষে একটী টাকাও সাহায্য পাইবার আশা ছিল না। সাধু কালীচরণের অসাধারণ অধ্যবসায়, অমিত যত্ন, অস্থিমাংস-ভেদী পরিশ্রম, সাধুতা এবং উৎসাহে ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া এই অট্টালিকা ও সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জলের ন্যায় টাকা ব্যয় করিয়া তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কালীচরণ তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতেও তিনি

এখানে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে আসিতেন। একদা সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় নরনারীগণ, এই হলে, কালীচরণ বাবুকে প্রশংসা সূচক অভিনন্দন পত্র এবং তিন সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। সার গুরুদাস এই সভার সভাপতির আসন অধিকার করিয়া কহিয়াছিলেন, "আমার প্রিয়তম বন্ধু বিমল চরিত্রবান ও সুপণ্ডিত কালীচরণের যোগ্যতা, সাধুতা এবং স্বদেশহিতৈষণার জন্য তাঁহাকে তিন সহস্র মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত হইল। এই মুদ্রা তাঁহার ইউরোপীয় ও দেশীয় বান্ধবগণ গোপনে দান করিয়াছেন। অনেক হিন্দু ভদ্রলোক এই চাঁদার সাহায্যদাতা আছেন।" ঐ দিবস ঐ বাটীতে (ওভারটুন হলে) কালী বাবুর সুবৃহৎ তৈল চিত্র স্থাপিত করা হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ চিত্র তথায় অবস্থিত আছে। সভাস্থলে কালী বাবু কহিয়াছিলেন, "আমার জীবনে যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, আমার জীবনে যদি কেহ কিছু ভাল দেখিতে পান, তাহা হইলে বুঝিবেন, ইহা মহামতি যিশুর আদর্শেই হইয়াছে। আমি মহাপুরুষ খ্রীষ্টকে অনুকরণ করিতে সদাসর্ব্বদা অভিলাষী।" কালী বাবু কহিতেন, একটা আদর্শ না থাকিলে মানুষের জীবন পবিত্র, সুন্দর ও উন্নত হয় না।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, এবারে কালীচরণের জীবনের একটা আশ্চর্য্য অসাধারণত্ব দেখাইব। কালী বাবুর বুদ্ধি চতুরস্র ছিল; যে দিক দিয়াই তাঁহাকে দেখ, তাঁহাকে বিজয়ী পুরুষ বলিয়াই বোধ হইবে। জেনেরল আসেম্বিলী, ফ্রিচর্চ্চ প্রভৃতি কলেজে কালীচরণ অধ্যাপক ছিলেন; সাহেবেরা কহিতেন "এমন সুযোগ্য, এমন অশেষ গুণশালী, এমন চরিত্রবান, অসাধারণ অধ্যাপক আমরা আর দেখি নাই।" কালীচরণ হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন; জজেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং আইনাভিজ্ঞতা দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কালীচরণ গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন; বড় বড় পাদ্রীরা অবাক্ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন, তাহাতে এমন সুযোগ্যতা নিরীক্ষিত হইত যে, অনেকে তাঁহাকে Statesman বলিয়া সম্বোধন করিত। বাবু কালীচরণ Concordat এবং Christian Messenger প্রভৃতি পত্র সম্পাদন করিতেন। এই সকল পত্রে তাঁহার অসাধারণ রচনা-পারিপাট্য, ভাষাভিজ্ঞতা, আশ্চর্য্য চিন্তাশীলতা দেখিয়া কলিকাতার "ইংলিশম্যান" একদা লিখিয়াছিলেন—

"Kali Charan writes better English than many English literati.

অর্থাৎ অনেক ইউরোপীয় সাহিত্য-জীবী অপেক্ষা কালীচরণ উৎকৃষ্টতর ইংরাজী লেখক। বাঙ্গালী-বিদ্বেষী "ইংলিশম্যান" সমাচার পত্রের মুখে এই প্রশংসা বড়ই গৌরবজনক। কালীচরণের সাধুতা, নম্রতা ও সাত্ত্বিক ব্যবহার দেখিয়া ইউরোপীয় পাদ্রীরা তাঁহাকে Pious Christian কহিতেন। গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁহাকে ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া জানিতেন। বড় লাট এবং ছোট লাট হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই কালীচরণের চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত বাবুর পক্ষে বিশেষতঃ দেশীয় খ্রীষ্টানের পক্ষে, এই গৌরব অবশ্য অসাধারণ। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সার্ এন্‌ড্রু ফ্রেজার সাহেব কালী বাবুর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহেবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কালীচরণ "দেশীয় খ্রীষ্টান" বিশেষতঃ "গবর্ণমেণ্টানুগ্রহবিরোধী" না হইলে এতদিনে হাইকোর্টের জজ হইতেন, ইহা নিশ্চয়। জজের উচ্চ পদ পাইবারও তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। বাস্তবিক এমন কোন প্রয়োজনীয় বিদ্যা ছিল না, যাহাতে কালীচরণের অধিকার ছিল না। দর্শনশাস্ত্রে (Philosophy) তিনি পাকা ওস্তাদ। ইউরোপীয় ফিলসফিতে তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে ছিল না। যুবাকালে বাবু কালীচরণ এমন সুন্দর সুকণ্ঠ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন যে, গীত গাহিয়া অনেককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিতেন। উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ্ক বিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার অধিকার ছিল। এণ্ট্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তিনি যে কি বিষয় জানিতেন না, তাহা জানি না। তাঁহার মৃত্যুর পরে একজন প্রগাঢ় ইউরোপীয় পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, "There was no subject upon which Baboo Kali Charan could not lecture." অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নাই, যাহা লইয়া বাবু কালীচরণ উপদেশ দিতে না পারেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বল দেখি, এমন চৌরস বাঙ্গালী আর কভু কি দেখিয়াছ?

কালীচরণ একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাস্তবিক যৌবনবয়সে কালীচরণের বক্তৃতা যে ব্যক্তি না শুনিয়াছে, কালীচরণের বাগ্মীতা সম্বন্ধে তাহার কিছুই জ্ঞান হয় নাই। এমন অসাধারণ বাগ্মী এদেশে কয়

জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে? রুসিয়ার প্রসিদ্ধ সম্রাট পিটর দি গ্রেট্ বলিতেন, "It is a good sign when good deeds are honored." অর্থাৎ মহতের মহৎ কীর্ত্তির সম্মান করা শুভ লক্ষণের বিষয় বলিতে হইবে। পিটরের পরে যিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "It is an excellent virtue to honour and follow a great man." অর্থাৎ বড় লোককে সম্মান করা ও তাঁহার অনুসরণ করা পরম ধর্ম্ম। আমি বিবেচনা করি, স্বর্গগত কালীচরণকে সম্মান করা এবং তাঁহার জীবনের অনুকরণ করা পরম গুণ বলিয়া গণ্য হইবে।

মহাত্মা কালীচরণ হুগলী জেলার অন্তর্গত থন্নিয়ান গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ-সম্ভূত লোক ছিলেন। ইঁহার পিতা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর নগরে বাস করিতেন, সেইখানেই কালীচরণের জন্ম হয়। এই জন্য সমস্ত জীবনে কালীবাবু জব্বলপুরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও সহাধ্যায়ী মিষ্টর এইচ, বসু মহাশয় যখন জব্বলপুরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ছিলেন,তখন সেই সুপ্রিয় খ্রীষ্টীয় বন্ধুর গৃহে গিয়া কালীবাবু অবস্থান করিতেন; ঊনবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কালীবাবু ইংরাজীতে এম, এ, ও আইনে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন। জেনেরল আসেম্বিলী, ফ্রিচর্চ্চ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। রিপন কলেজ ও সিটি কলেজেরও তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তদনন্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশীয় ছোটলাট সাহেবের কৌন্সিলের সভ্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে বড় লাটের কৌন্সিলের সদস্য হওয়ার আশা ছিল। কালীবাবু কলিকাতা মিউনিসিপালীটীর কমিশনর ছিলেন এবং বহুবিধ দেশহিতকর ও কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিন অনুরুদ্ধ হইয়াও কখনও গবর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। পৈত্রিক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। এমন স্বনামধন্য পুরুষ বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল। বাস্তবিক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে এমন গুণবান "দেশীয় খ্রীষ্টান" অদ্য পর্য্যন্ত কেহ আবির্ভূত হয় নাই। তিন দেশীয় সমাজের অন্যতম নেতা (Leader) ছিলেন। হায়! এহেন পুরুষ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন!!

কালীচরণের হিন্দু জ্ঞাতিবর্গ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল, মহাশয়, দ্বারবঙ্গের অধীন সমস্তিপুরে ওকালতী করিতেছেন। পার্ব্বতী বাবু আনুষ্ঠানিক হিন্দু; ইনি হুগলীর সবজজ, বাবু শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয়ের বৈবাহিক এবং কলিকাতার সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাবু দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। পার্ব্বতী বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর বাবু ভবাণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে সুপরিচিত। কলিকাতার "সন্ধ্যা" নাম্নী দৈনিক পত্রিকার ইনি প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক। উপাধ্যায় মহাশয় তরুণ বয়সে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমি যে স্থানে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সেই স্থান কলিকাতা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। যে দেশপ্রসিদ্ধ ধনবান ও ধার্ম্মিক পুরুষের রাজপ্রাসাদে উপবেশন করিয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি, সেই প্রসাদস্বামীর জনৈক কর্ম্মচারীর হস্তে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর ছবি ছিল, তিনি আমাকে ঐ মনোমোহিনী ছবি দেখাইয়া কহিয়াছিলেন "দেখুন, কেশব বাবুর মূর্ত্তি কি সুন্দর!" ব্রহ্মানন্দের ঐ প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে আমার স্মরণ হইল, একদা কলিকাতা রাজধানীর টাউন হলের বিরাট সভায় কেশব কহিয়াছিলেন, "It is easy to distinguish a greatman but it is very difficult to comprehend him" অর্থাৎ দশজনের মধ্য হইতে একজন বড় লোককে চিনিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু তাঁহাকে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি বলি, কালীচরণকে বড় লোক বলিয়া অনেকে বিশ্বাস ও সম্মান করিতে পারেন, কিন্তু এহেন অশেষ গুণশালী পুরুষকে ভাল করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য এখনও অনেকের হয় নাই।

বৃদ্ধাবস্থায় কালীচরণ নানা প্রকার পারিবারিক শোকে দিন যাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যু তাঁহার পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান তাঁহার আত্মায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা ও কামনা।

পরিশিষ্ট।

এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে অবগত হইলাম, ইংরাজি ১৮৬৩ অব্দে কালীচরণ বাবু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষা (বাপ্তিস্মা) হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি একজন মুসলমান খ্রীষ্টান যুবকের সহিত বর্দ্ধমান নগরে

গমন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; বক্তৃতার সময়ে কালী বাবু শ্মশান হইতে সংগৃহীত নরমস্তক হাতে লইয়া শ্রোতাদিগকে কহিতেন, "ইহাই মানবের পরিণাম; অতএব পাপহারী, মুক্তিদাতা, এবং পরকালের সহায় স্বরূপ প্রভু যিশুর শরণাগত হও" ইত্যাদি। কালী বাবুর লিখিত অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বিলাতের টাইম্‌স নামক জগদ্বিখ্যাত সম্বাদপত্রে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পাদ্রী বলেন, কালী বাবু ফ্রিচর্চ্চ মিশনের লোক না হইয়া যদি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন (এবং বোধ হয় নেটিব বাঙ্গালী না হইলে) এতদিনে কোন স্থানের লর্ড বিশপ হইতে পারিতেন, ইহা নিশ্চয়। শুনা যায়, একাধিক বার তাঁহার নাম বিশপ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, কিন্তু উপরিউক্ত বাধা বশতঃ তিনি বিশপ হইতে পারেন নাই। কালী বাবু যখন বঙ্গদেশের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখন কলেজ ষ্ট্রীটের বিরাট সভায় তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দিবার সময়ে বিখ্যাত পাদ্রী ম্যাকৃডোনালড্ মহাশয় কহিয়াছিলেন "এই মহাপুরুষ, ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা।" জজ গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন, "আমার বন্ধু কালী বাবু কেবল খ্রীষ্টানের বন্ধু বা নেতা নহেন, ইনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, খ্রীষ্টান, ইউরোপীয়, আমেরিকান এবং ভারতবাসী, সকলেরই বান্ধব এবং সকলেরই মধ্যে অন্যতম নেতা। ইনি গবর্ণমেণ্টের ও প্রজা সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" শুনা যায়, ছোট লাট সার এনড্রু ফ্রেজার বাহাদুরের পিতা রেভারেণ্ড ডাক্তার ফ্রেজারের সহিত কালী বাবু কিছু দিবস মধ্যপ্রদেশে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কালীবাবু কন্যাশোকে স্ত্রী বিয়োগে ও দৈহিক রোগে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ভুবনবিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডফ্ সাহেবের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন, বাবু কালীচরণ, লক্ষ্ণৌ মিশনের বাবু রামচন্দ্র বসু, মাহানাদ মিশনের বাবু জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জব্বলপুরের ভূতপূর্ব্ব আসিসটান্ট কমিশনর বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু এবং কলিকাতা রামবাগান পল্লীর দত্ত বংশ সর্ব্বাগ্রগণ্য।

কালীচরণ বাবুর পিতার নাম ৺হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি এণ্ট্রান্স হইতে এম,এ, পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা হরচন্দ্র মহাকুলীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার

৬২টি বিবাহ ছিল, তন্মধ্যে তৃতীয়া স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র কালীচরণ॥ কালীচরণ বাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গ দেশের নানাস্থানে সভা হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি ক্ষেত্রে বঙ্গের ছোট লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহের ফলাফল।

(প্রাচীন দৈবজ্ঞদিগের গণনা)

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় জন্ম ও মৃত্যু অপেক্ষা, বিবাহক্রিয়া গুরুতর প্রয়োজনীয় ঘটনা। কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন না হইলে, সর্ব্বপ্রকার সুখ ও দুঃখের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় না হইলে, জন্মজন্মান্তরীণ অদৃষ্ট সংস্কার বশতঃ মনুষ্যকে পুনঃ পুনঃ সংসার-ক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়, সুতরাং মানবজন্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই; "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রু্বং জন্ম মৃতস্য চ" অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য—জন্ম মরণের কারণ—সুতরাং মৃত্যুতে বিশেষত্ব কিছুই দেখি না; ইহা স্বাভাবিক ঘটনা এবং প্রত্যেক জীবনই এই ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন; কিন্তু বিবাহ তাহা নহে, ইহা তোমার ও আমার বাসনাসম্ভূত ক্রিয়াবিশেষ। বিবাহ আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও সঙ্কল্পের নিমিত্তমাত্র ক্রিয়াস্বরূপ পরিগণিত হইলেও ইহা একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিরাট ব্যাপার—ইহা আমাদের সামাজিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং জাতিগত মহোৎসব। এই জন্য অনেক কাঠ খড় পোড়াইয়া বিবাহ হয়—এইজন্য অনেক তর্ক বিতর্ক, বাগবিতণ্ডা, অনুসন্ধান অনুনয়, ভাল মন্দের বিচার প্রভৃতি না হইলে বিবাহের বন্দোবস্ত শেষ হয় না। বিবাহ বিভ্রাটে মহা অনিষ্ট, মহা গোলযোগ, মহা উপদ্রব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা; এইজন্য প্রাচীন কালের লোকেরা অতি সাবধানে বিবাহ সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। প্রস্তাবিত বিবাহটি ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা গ্রহাচার্য্য, দৈবজ্ঞ গ্রহবিপ্র, জ্যোতিষী পণ্ডিত, ভবিষ্যত্তত্ত্বজ্ঞ, সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকট গমন করিয়া বিশেষ অনুনয় ও অনুরোধের সহিত, বিবাহের সুফল বা কুফলসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। সে কালের দৈবজ্ঞগণ এই রূপ প্রশ্নসম্বন্ধে যে সকল অতীব কৌতুকাবহ গণনা দ্বারা ফলাফলের মীমাংসা করিতেন, তাহার কতকটা পৃথিবীর সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে এখনও প্রচলিত আছে; খ্রীষ্টীয়, ইসলামীয়,

হিন্দু, হিব্রু, পার্শিক, জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে এই সকল কৌতুকাবহ গণনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা করি। বিবাহের কথা উঠিলে, প্রবাসীর আমোদপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ এই কৌতুকাবহ তালিকা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

১ম। বর্গগণনা—পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর এবং পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর যদি এক বর্গ ভুক্ত হয়, তাহা হইলে (দৈবজ্ঞেরা বলিতেন) বিবাহ শুভ-ফলদায়ক। দৃষ্টান্ত—পাত্রের নাম বলরাম, পাত্রীর নাম মানকুমারী, পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর ব এবং পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর ম—এতদুভয়ই প বর্গের অন্তর্গত,সুতরাং সেকালের দৈবজ্ঞদিগের মতে এইরূপ বিবাহ শুভকর।

২য়। যুক্তগণনা—পাত্র ও পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর যদি এক হয়, অথবা কেবল হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্বের প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে সেই বিবাহ নিতান্ত অশুভকর। দৃষ্টান্ত—পাত্রের নাম উমাকান্ত এবং পাত্রীর নাম ঊষাময়ী ; এই-রূপ বিবাহ অশুভফলপ্রদ। পাত্রের নাম ঈশ্বরদাস এবং পাত্রীর নাম ইচ্ছাময়ী, এরূপ সম্মিলন (দৈবজ্ঞদিগের মতে) অকল্যাণকর।

৩য়। গ্রহসংজ্ঞা গণনা—বরের নাম চন্দ্র এবং কন্যার নাম নক্ষত্র ব্যঞ্জক হইলে বিবাহ খুব ভাল।

৪র্থ। পাদপব্রততী গণনা—পুরুষ এবং স্ত্রী এতদুভয়েরই নাম যদি বৃক্ষ বা লতাব্যঞ্জক হয়, তাহা হইলে বিবাহ একেবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৫ম। গরলামৃত গণনা—পুরুষ ও স্ত্রীর যদি পরস্পর বিরোধী নাম হয়, (মনে কর বরের নাম অমৃত এবং কন্যার নাম গরলময়ী বা কালকুটী) তাহা হইলে এরূপ বিবাহ দ্বারা উভয়েরই সত্বর মৃত্যু হইয়া থাকে! সাপ ওঁ নেউল নামে বিবাহ হয় না।

৬ষ্ঠ। অহি গণনা—পাত্রীর নাম যাহাই হউক, পাত্রের নাম সর্পের পরি-চায়ক হইলে, গ্রীষ্ম বা বসন্ত ঋতুতে বিবাহ দিবে না। অন্য ঋতুতে বিবাহ হইলে ক্ষতি নাই। বিবাহের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মনসা পূজা করা আব-শ্যক।

৭ম। স্ত্রীর নাম পুরুষের মত এবং পুরুষের নাম স্ত্রীর মত থাকিলে বিবাহে বর কন্যা উভয়েই দরিদ্র হয়।

৮ম। যে পাত্রের রাশি "সিংহ" তাহার বুধবারে বিবাহ হইলে, বিবাহ ভয়ানক রোগ, শোক, চিন্তা ভয় ও বিপদের কারণ হয়।

৯ম। য়িহুদীদিগের মতে পাত্রের নামে পূর্ব্বদিকের পরিচয় এবং পাত্রীর নামে পশ্চিমদিকের পরিচয় পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে, এরূপ বিবাহের প্রস্তাব একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

১০ম। প্রাচীন রোমান কাথলিক দিগের দৈবজ্ঞ সাধুদিগের মতে শুক্রবারে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ।

১১শ। হিন্দুদিগের মতে দিবায় বিবাহ হইলে, গৃহদাহ, গৃহপালিত পশুর অকালমৃত্যু, মাতাপিতার সত্বর বিয়োগ, পাত্রীর সত্বর বৈধব্য, সঞ্চিত অর্থ নাশ, গুরুর অভিশাপ, জ্ঞাতিবিবাদ, দরিদ্রতা, রোগ, বিলাপ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। মরক্কোর মুসলমানদিগের দিনে বিবাহ হয় না।

১২শ। পুরুষের নাম ভৃঙ্গব্যঞ্জক এবং পাত্রীর নাম পুষ্পব্যঞ্জক অথবা মধু কিম্বা মিষ্টতাব্যঞ্জক হইলে পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজপুতনায় ইহাকে "গুলভোওঁরা" গণনা বলে।

১৩শ। পাত্র ও পাত্রীর নাম সরস্বতী বা লক্ষ্মীব নাম হইলে উভয়ে অত্যন্ত সুখী হয়। মান্দ্রাজে ইহাকে "অন্চি—ভেল্লু" গণনা বলে।

১৪শ। পারসীকদিগের দৈবজ্ঞবৃন্দের মতে পাত্রের নামে স্থল এবং পাত্রীর নামে জল বুঝাইলে বিবাহ খুব ভাল ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে।

১৫শ। কোচিন দেশে সোমবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত যতগুলি বার আছে, ইহার মধ্যে পাত্র বা পাত্রীর কাহারও নামে রবি, সোম, মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবারব্যঞ্জক শব্দ থাকিলে বিবাহ খুব আনন্দদায়ক হয়। ইহাকে সে দেশে দ্বীপ-চালী গণনা বলে।

১৬শ। ঋতু গণনা।—কানাড় (কর্ণাট) দেশে পাত্র পাত্রীর উভয়ের নাম ঋতুব্যঞ্জক হইলে বিবাহ অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়। দৃষ্টান্ত—পাত্রের নাম বসন্ত-কুমার, পাত্রীর নাম হেমন্তকুমারী।

১৭শ। আরবের প্রাচীন কোরিশ বংশের দৈবজ্ঞেরা গলার মালার যোড় বিযোড় দেখিয়া বিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিতেন; টঙ্ক, মুর্শিদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মুলতান প্রভৃতি স্থানে এখনও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাকে আরবী ভাষায় "আশ্‌তক্ খরা" বলে। দৈবজ্ঞেরা গলার মালা হাতে লইয়া, প্রশ্নকর্ত্তাকে তাহা স্পর্শ করিতে বলেন; মালার যে "দানা"টি স্পর্শ করা হয়, তাহা হইতে মালার শেষ দানা পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যদি যুগ্ম সংখ্যা (যোড়) পাওয়া গেল, তাহা হইলেই বিবাহ ভাল, নতুবা বিবাহ মন্দ। মুর্শিদা-

বাদের নবাববংশে "আশতকৃথরা" দ্বারা এখনও প্রতিদিন নানাপ্রকার শুভাশুভ ঘটনার গণনা হইয়া থাকে।

১৮শ। "ফেল ফায়েল"গণনা।—ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশস্থ পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের মুসলমান দৈবজ্ঞেরা কোরাণ দেখিয়া একপ্রকার শুভাশুভ ফল নির্ণয় করেন, ইহারই নাম ফেল-ফায়েল গণনা। আরব্য ভাষায় ফেল্ শব্দে কর্ত্তা (subject) এবং ফায়েল শব্দে ক্রিয়া (predicate) বুঝায়। আমার বিবেচনায় প্রাচীন য়িহুদীদিগের নিকট হইতে খ্রীষ্টানেরা এবং খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে মুসলমানেরা এইরূপ গণনার অনুকরণ করিয়াছেন। দৈবজ্ঞেরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে

"বিশ্ মিল্লা আর্ রহমা নির্ রহিম্।
লাইল্লা হোইল্লা মহম্মদ রসুলেল্লা।
আল্ হাম্‌দো লিল্লা হু রব্ উল্ আলমীণ॥"

এই কথাগুলি সভক্তি উচ্চারণ করিয়া, চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক, কোরাণ খুলিয়া থাকেন। কোরাণের যে শব্দ বা যে অক্ষর তাঁহার সর্ব্বপ্রথম চক্ষুগোচর হয়, তাহা যদি কল্যাণব্যঞ্জক হয়, তাহা হইলেই বিবাহ শুভদায়ক, নতুবা নহে। মনে কর, কোরাণ খুলিয়াই দৈবজ্ঞ পড়িলেন—

"লা হোল্ বেল্-আ কুবত্তে ইল্লা বিল্ লা হীল্, অলি উল আজীম্॥"

তাহা হইলে বিবাহ অশুভফলদায়ক হইল, কারণ "লা হোল্ বেল্-আ" শব্দ ঘৃণা, বিরক্তি, নিরানন্দ ও বিস্ময়ব্যঞ্জক শব্দ।

কিন্তু যদি দৈবজ্ঞ মহাশয় পড়েন—

"অজ্ তগ্ ফের উল্লা রব মিন্ কুল্লে জম্বীহী, য়োয়া অতুবে ইলাহী।"

তাহা হইলে বিবাহ শুভফলপ্রদায়ক, কারণ এই আয়েতের প্রথম শব্দ এবং সম্পূর্ণ আয়েতের অর্থ আশা ও আনন্দদায়ক। প্রাচীন রোমানকাথলিক পাদ্রীগণ বাইবেল লইয়াও এইরূপ গণনা করিতেন। তাঁহারা প্রথমে Our Father which art in heaven নামক সুপ্রসিদ্ধ Lord's Prayer উচ্চারণ করিয়া বাইবেল খুলিতেন। মনে কর, তাঁহারা পড়িলেন—

"In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of his people." Isiah xxviii 5.

তাহা হইলে বিবাহে ভাল ফল হইবারই কথা। যদি তাঁহারা পড়িলেন—

"For I know this, that many grievous wolves shall enter in among you, not sparing the flock." Acts xx 29

তাহা হইলে, প্রস্তাবিত বিবাহকে কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করা গেল না।

১৯শ। বুর জাতিরা অত্যন্ত বীর্য্যশালী এবং খুব স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব হইলে প্রাচীন কুসংস্কারকে অনেকে সহজে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় না। বুর জাতির অনেকে এখনও গাছের পাতার রং, ফুলের গন্ধ, আকাশের নক্ষত্র, বোতলের রং, গির্জ্জায় প্রথম আগন্তুকের নামের অর্থ এবং জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রভৃতি দেখিয়া বিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকে।

২০। মাদ্রাজের পরেয়া জাতির বিবাহের প্রস্তাব হইলে, রাত্রিতে জলপূর্ণ পাত্রে যব ভিজাইয়া রাখে। প্রভাতে তাহাতে পূর্ণাকারে অঙ্কুর দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং প্রস্তাবিত বিবাহকে সুফলদায়ক বলিয়া বিশ্বাস করে।

পুরাতন গ্রীক জাতির মধ্যে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস বিবাহের পক্ষে অতীব শুভকাল বলিয়া গণ্য ছিল। রোমক জাতির মধ্যে মে মাস উত্তম কাল বলিয়া গণ্য হইত। ইংরাজ জাতি দ্বারা মে মাসকে বিবাহের পক্ষে অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক ইংরাজের বিশ্বাস, মে মাসে বিবাহ হইলে সন্তান বাঁচে না।

From the marriages in May
All the bairns die and decay.

রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানেরা লেণ্ট্ উৎসব সময়ে বিবাহ করে না।

Marry in Lent, you will repent.

সাহেবেরা ইহাও বলেন, সোম, মঙ্গল ও বুধবার বিবাহের পক্ষে খুব ভাল।

Monday for wealth. Tuesday for health
Wednesday the best day of all ; Thursday for crosses,
Friday for losses. Saturday no luck at all.

হিন্দু প্রবাদে ও শাস্ত্রে জন্ম মাস এবং চৈত্র ও পৌষ মাস বিবাহ জন্য নিষিদ্ধ।

"ন জন্ম মাসে ন চ চৈত্র পৌষে।" বিবাহ জন্য অন্যত্র লিখিত আছে—

আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে
বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষেচ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।

পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী
অন্যেষ্বেব বিবাহিতা সুতবতী নারী সমৃদ্ধাভবেৎ॥
গুরুশুক্রবুধেন্দুনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ।
সূর্য্যার্কিভূমিপুত্রাণাং দিনেষু কুলটা ভবেৎ॥

অনেক জাতির মধ্যে বসন্তকাল বিবাহের পক্ষে অতীব সুসময় বলিয়া গণ্য। বসন্তকালে নরনারীগণ নবীনা প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভায় বিমোহিতা হয় এবং এই সুখময় ঋতুতে তাঁহারা আদি রসে আনন্দিত হয়েন। মহা কবি কালিদাস "ঋতু-সংহার" কাব্যে বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় লিখিতেছেন—

প্রায়েণ রাগচলিতানি মনাংসি পুংসাং। সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্যঃ।

আর অধিক প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক নাই। আরও প্রমাণ তুলিলে প্রবন্ধ আরও কৌতুকাবহ হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকতর কৌতুকাবহ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। গণনায় ভালমন্দ যাহাই হউক, আসল কথা এই যে, সভ্য জাতির ও শিক্ষিত সমাজের "বিবাহ"ক্রিয়াটা এতই গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে, খুব সাবধানতার সহিত ভালমন্দের বিশেষ বিচার না করিয়া বিবাহসমুদ্রে লম্ফ দেওয়া বড়ই বাতুলতার কর্ম্ম। পিতা, মাতা বা অভিভাবকেরা অন্যায় বিবাহের প্রশ্রয় দিলে, সকল শাস্ত্রমতে, মানবসমাজ ও পরমেশ্বরের নিকট ঘোরতর অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়েন।

রোঁয়া ছেঁড়া পণ্ডিত।

ক অক্ষর জ্ঞান নাই বেদের করে ব্যাখ্যা।
বিদ্যার ত 'বি' নাই, পণ্ডিত হলো আখ্যা॥
দেখে শুনে অবাক হই, কালের কি গতি!
রোঁয়া ছেঁড়া পণ্ডিতের শুন তবে রীতি॥

পাঠক মহাশয়! আপনারা বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের কাহিনী শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পিতামহের গল্প শুনিয়াছেন কি? রোঁয়া ছেঁড়া পণ্ডিত মহাশয়, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের বাবার বাবা; বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুরুষের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। নিদাঘের হাড় ভাঙ্গা গ্রীষ্মে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে এবং সযত্নে এই কাহিনী পাঠ করুন; ইহা পাঠ

করিলে ফেল্‌ওয়ালা ছেলে পাশ হয়; বি-এ ছাত্র এম এ, ছাত্র হয়, নির্ব্বোধ বালক সুবোধ হয় এবং মূর্খ যুবার অধস্তন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত পণ্ডিত হইয়া যায়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গোরাচাঁদপুর নামক গ্রামে প্রায় সপ্তদশ শত চর্ম্মকার বাস করিত। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখ, চারিদিকেই চামার আর চামার!! এই মুচিদিগের যে ব্যক্তি গুরু, তাহার নাম হলধর। গ্রামে যখন হলধরের পদার্পণ হইত, তখন মুচিসমাজে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া যাইত। গুরুদেব প্রতি বৎসর একবার মাত্র শিষ্যদিগের গ্রামে আসিতেন, এবং দুই বা তিন সপ্তাহের অধিককাল তথায় যাপন করিতেন না। মুচিদিগের মনোমধ্যে বিশ্বাস এই যে, গুরু হলধর ঠাকুরের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাহারা বলে "আমাদের গুরুদেব মহাশয় চারি শাস্ত্রে পণ্ডিত, সমস্ত বেদটা তাহার কণ্ঠস্থ এবং দুনিয়ার সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত জ্ঞান হলধর পণ্ডিতের পেটের ভিতর গজ্ গজ্ করিতেছে; বিশেষতঃ এই অসাধারণ বিদ্বান পুরুষের মস্তিষ্কটা এত অধিক পরিমাণে বিদ্যাঘৃতে পরিপূর্ণ যে, সামান্য একটা দেশালাইয়ের আলোকের উত্তাপে তাহার মাথাটা দুই ফাঁক হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।" যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে, সেই মুচি-আরাধ্য হলধর ঠাকুর গোরাচাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শত শত চর্ম্মকার গুরুদেব সম্মুখে একত্র হইয়া তাহার চরণ বন্দনা ও জয় স্তুতি পূর্ব্বক, হাত পা ধোয়াইয়া, তাহাকে মাদুরের উপর বসিতে দিল। সমুদয় গ্রাম মধ্যে এক নবোৎসবের সৃষ্টি হইল।

মুচিরা চারিদিকে যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে "মাতা সরস্বতীর বরপুত্র আগমন করিয়াছেন, আমাদের বাটীতে গুরুদেব হলধর পণ্ডিত স্বয়ং শুভাগমন করিয়া গ্রামকে আলোকিত করিতেছেন। বিদ্যা ও ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন অসাধারণ পণ্ডিত ভূতলে অতুল।"

গ্রামে দুইটা সংস্কৃত টোল ছিল, একটা টোলের অধ্যাপকের নাম গগনচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ। গগন পণ্ডিত তাঁহার ছাত্রদিগকে কহিল, "চল, আমরা অদ্য এই দিগ্‌দিগন্ত-বিশ্রুত পণ্ডিতের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে উদ্যত হই।" ছাত্রেরা তাহাতে সম্মত হইলে সশিষ্য সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় মুচিপাড়ায় উপস্থিত হইলেন। মুচিগণ তাহাদের গুরুদেব সমীপে গিয়া কহিল "ঠাকুরগো! আমাদের গ্রামের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া তাঁহার

অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন জন্য আগমন করিয়াছেন। ইঁহার তুল্য অধ্যাপক এদেশে আর নাই। প্রভো! দেখিবেন এ ব্যক্তি যেন কিছুতেই আপনাকে পরাজয় করিতে না পারে, তাহলে আমাদের আর লোকের নিকট মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। ইহাকে যদি হারাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্ত দেশে আপনার অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবে।” হলধর কহিল, “বৎস! মাভৈঃ মাভৈঃ. ভয় নাই, ভয় নাই। যে যত বড় হউক, হলধরের উপর কেহই নহে।

হোক্ ছুনিয়া যত বড়, আকাশ তার উচু।
হলধরের হলে এসে, সবাই খায় কচু॥”

দেখিতে দেখিতে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহার ছাত্রবর্গকে লইয়া মুচির পণ্ডিতের নিকটে উপস্থিত হইল। যথাস্থানে উপবেশন করিয়া হলধরের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ পরিচয় পূর্ব্বক, পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরগো! আপনি কি সমুদয় চারিবেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন? তা' হ'লে ত আপনি একজন দেবানু-গৃহীত পুরুষ। হলধর কহিল “তাহাতে আর সন্দেহ কি? অগ্রে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ শাস্ত্রে পণ্ডিত বল দেখি? কোন্শাস্ত্রে তোমার প্রবল অধিকার লাভ হয়েছে বল দেখি? সিদ্ধান্তভূষণ কহিল, “মহাশয়! বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দিতে হয়, কাজেই কিছু কিছু কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইয়াছে; এতন্মধ্যে ন্যায় শাস্ত্রেই কিছু অধিক অধিকার রাখিয়া থাকি।” হলধর বলিল, “আচ্ছা! বল দেখি, ন্যায় শাস্ত্রের এই দুইটা সূত্রের অর্থ কি?

১। হল কচি গজ গড্বাশ্বশ্ব গুম্বুম্বনীয়ং।
২। হড্ হড্বাশ্ব গড্ গড্বাশ্ব ফিণ্ ফিনীহাঃ।

সূত্র শুনিয়াই সিদ্ধান্তভূষণের দেহপিঞ্জরের বুদ্ধি-পাখী উড়িয়া গেল। টোলের বৃদ্ধ পণ্ডিত অবাক হইয়া আকাশের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; এমন সময়ে এক ছাত্র হলধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ঠাকুরগো! অধ্যাপক মহাশয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত বটেন, কিন্তু তা বলিয়া আপনার সমতুল্য কি কেহ হইতে পারে? জরায় আর যুবায় কখনও কি তুল্য হয়?” সিদ্ধান্ত-ভূষণের পরাজয় দেখিয়া মুচিরা আনন্দে করতালি দিয়া চীৎকার করতঃ কহিতে লাগিল “এবারে হেরেছে! এবারে হেরেছে! পণ্ডিতের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে।”

সোণার পরীক্ষা আগুনে। তেলের পরীক্ষা বেগুণে॥

ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধান্তভূষণ ঝটিতি মুচিপাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। বালকদিগকে কহিল, "ব্যাটা কি ভণ্ড! এমন ঠক চূড়ামণি ত আর দেখি নাই।" যাহা হউক, অপরাহ্নে দ্বিতীয় টোলের অধ্যাপক শ্রীমৎ লঘুজীবন বেদান্তবাগীশ মহাশয় মুচিপাড়ায় উপস্থিত হইয়া মুচি আরাধ্য গুরুর নিকটে পরিচিত হইলেন। হলধর জানিতে পারিল, নবাগত পণ্ডিত বেদান্তশাস্ত্রের এবং ব্যাকরণের অধ্যাপক। লঘুজীবনকে সম্বোধন করিয়া মৃদুমধুর হাস্য সহকারে হলধর কহিল "ওহে বেদান্তবাগীশ! মুগ্ধবোধের দুইটা সূত্র উচ্চারণ করিতেছি, ইহার অর্থ বুঝাও দেখি?

১। কুড়ুতাং কুড়ুস্থ্য নিজ্বয্যাহেঃ। ২। প্লটক্ষ্যপ্ শ্বশুরা লয়োন্দ্বে।

হলধরোদ্ভাবিত মুগ্ধবোধের অপূর্ব্ব সূত্রদ্বয় শ্রবণ করিয়া বেদান্তবাগীশের বুদ্ধি-নারিকেল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল! কি উত্তর দেওয়া উচিত, কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে কহিল "ঠাকুরগো! চাঁদে আর বেঙে কি তুল্য হয়? আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা?" যাহা হউক, পণ্ডিত লঘু-জীবন মুচিপাড়ায় হারি মানিয়া চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "এই ভণ্ড ব্যাটাকে যম কি ভুলে গেছে?"

অতঃপর মুচিগণ গলায় সাত হাত কাপড় জড়াইয়া করযোড়ে দিগ্বিজয়ী হলধর সমীপে নিবেদন করিল "হুজুরগো! একটা খুব বড় কবি এসেছে, এই ব্যক্তি বিদ্যার অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। একবার এই লোকটার সঙ্গে একটু লড়াই করুন ত? যে যতবড় বিদ্যাক্ষেত্র লইয়া আসুক না কেন, ইহা নিশ্চয় যে, হুজুরের লাঙ্গল চলিতে আরম্ভ করিলে বিদ্যার জমি ধূলিময় হোয়ে যাবে। একবার আপনার বিদ্যার ষাঁড়ের ঘাড়ে বুদ্ধির লাঙ্গলটা বাঁধিয়া দিউন ত দেখি।"

এই সময়ে পম্পটরাজ নামক কবিবর আসিয়া দর্শন দিল। হলধর তাহার সম্মুখস্থিত ভূমির উপরে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল "ওহে! তুমি যদি প্রকৃত কবি হও, তাহা হইলে এই সংস্কৃত শ্লোকটার কি অর্থ হয় বল দেখি?"

হিড়িং মিড়ীং ঘিড়িং সাবাহে পুণ্ডরীকাক্ষং।
নরানাং নাপিতং ধূর্ত্তং বৈশাখে নর বানরং॥
কাঠায়াং কুড়ুস্বাং লিজ্বেং সানাড়ী প্রাণ ঘাতিকা।
মৃচ্যাও শুচ্যাও প্রকটনীয়াস্তমম্ সমূত্র বাহেঃ॥

কবিবর তাঁহার গায়ের উড়ানীখানি অতি সত্বরে তাহার গলায় জড়াইয়া

যোড়হাতে কহিল "ঠাকুরগো! আপনার জয় হৌক। বুঝিলাম, আপনি স্বয়ং মা ভগবতী! কেবল দুইখানি শ্রীচরণের অভাব মাত্র দেখিতেছি, এই একটু মাত্র প্রভেদ ভিন্ন আপনি সাক্ষাৎ মা কপিলা ভগবতী! আপনার বিপুল দেহ—সরোবরে যে অসংখ্য বিদ্যা মীণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঠাকুরগো! আপনার সঙ্গে আমরা কি যুঝিয়া উঠিতে পারি? এত বড় সাধ্য কার!" কথা শুনিয়া মুচিরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সর্দ্দার মুচী বলিল "অহো হো! আমাদের গ্রামে আজ সৌভাগ্য ক্রমে মা সরস্বতীর বরপুত্র এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেখ্‌ছ না গুরুদেবের পেট্‌টা যেন ভিস্তির মশক! না জানি ঐ বিপুলাকার পেটে কত সের, কত পসারি, কত মণ বিদ্যার তৈল ভরা আছে।" যাহা হউক, শ্রীমৎ পম্পটরাজ কবিবর হারি মানিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরগো! এই অপূর্ব্ব শ্লোক কোন্ গ্রন্থে পাঠ কোরেছেন?" হলধর কহিল "ইহা খট্টাঙ্গ পুরাণান্তর্গত মৎস্যযুদ্ধ পর্ব্বের তিন হাজার নয় শত সাড়ে ছত্রিশ অধ্যায়ের পঞ্চম টীকার তৃতীয় উপটীকাপাদের একাদশ অণুটীকা। ইহার বানানেওয়ালার নাম ঋষিরাজ খকৃখথায়ৎ কম্বলেশ্বর গিরিপতি উপাধ্যায়।" কবিবর বলিল "সাধু! সাধু! ধন্য! ধন্য! এত বড় কবি না হোলে কি এমন দেবদুর্লভ শ্লোক বানাতে পারে? আর আপনার মত বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাপণ্ডিত না হোলে কি এতাদৃশ বজ্রাদপি কঠোর শ্লোক কি কেহ ব্যাকরণশুদ্ধ কোরে আবৃত্তি কোর্ত্তে পারে? ধন্য! ধন্য! হুজুরের বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক! সত্য সত্যই আপনি ধান চাল খরচ কোরে লেখা পড়া শিখেছেন।"

অতঃপর বাঙ্গালা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের পালা উপস্থিত। এই পণ্ডিত ব্যতীত আর প্রায় সমুদয় শিক্ষিত লোক হলধরের কাছে হারি মেনে গেছে! মুচিরা কহিল "গুরুদেব। এখন কেবল একটামাত্র লোক বাকী আছে, এই লোকটাকে হারাতে পার্‌লেই আমাদের মুখোজ্জ্বল হয়; এই মানুষটা বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত; সাধু ভাষায় ইহার এত অধিকার আছে যে, লোকে ব'লে এই পণ্ডিতের বিদ্যার শৃঙ্খল প্রায় সাড়ে তিন মাইল পর্য্যন্ত লম্বা। এটা খুব বড় পণ্ডিত, এবারে এই লোকটাকে হারাতে হবে।" হলধর কহিল "মাভৈঃ মাভৈঃ। বৎস! মাভৈঃ মাভৈঃ!"

যত বড় হোক্ দুনিয়া, আকাশ তার উঁচু।
হলধরের হলে এলে, সবাই খায় কচু॥

এই সময়ে হেড্ পণ্ডিত আসিয়া দর্শন দিল। তাহাকে দেখিয়াই হলধর সজোরে ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া কহিল "বাপুহে! তুমি নাকি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ? শুনিতেছি সাধু ভাষায় তোমার নিতান্তই অধিকার; আচ্ছা, দুইটা বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি করি, অর্থ কর দেখি?"

১। রাবণ আমার ভগ্নী; সীতা মোর পিশে।
তোর্ কানের কলম কেড়ে নিব, ধান কাট্‌বি কিসে॥
হাঁড়ী কোণে মেঘ নেমেছে, উড়ে গেল গরু।
মামীর মাতা মেশো হলো, তার্ পেট্‌টা কেন সরু?

২। গজ লম্ফিত, অজ ভম্ভিত, ত্যজ ঝম্পিত, লজ লম্বিত।
খজ কম্পিত, রজরম্বিত, ভজ রঞ্জিত, হজ স্তম্ভিত।

হেড্ পণ্ডিত কহিল "ঠাকুর গো! আমার বাবার, তার বাবার, তস্য বাবার তস্য পিতামহস্য পিতার বাবার সাধ্য নাই যে, এহেন পণ্ডিতের কবিতার অর্থ করিয়া দেয়, আমি কোন্ ছার! হুজুরের সঙ্গে কি আমার তুলনা! গরু আর গাধা কি সমতুল্য হয়? বহুমূত্র রোগের সহিত কি আমাশয়ের তুলনা হয়? ধন্য আপনি, আপনার লেখা পড়া শিক্ষা সার্থক!!" হলধর কহিল "জিতা রহো; তোমার জয় হউক।" মুচিরা কহিল "হেড্ পণ্ডিত খুব ভাল লোক। ধন্য! ধন্য!" ইত্যবসরে শ্রীমৎ প্রধান পণ্ডিত হলধরকে সেলাম করিয়া চুপে চুপে বিদায় গ্রহণ করিল। গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দশ ক্রোশের মধ্যে যত শিক্ষিত লোক ছিল, তাহাদের কেহই মুচিপাড়ার রাস্তা দিয়া চলিতে সাহসী হইল না। দুই দিবস পরে, গ্রামের গোমস্তা ও তালুকদার গ্রামের সমুদয় পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোককে ডাকাইয়া কহিল "মুচি ব্যাটাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের আর এই গ্রামে বাস করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। এক বেটা ভণ্ড গুরু এসে যাবতীয় ব্রাহ্মণাধ্যাপকের মানহানি করিতেছে এবং ভদ্রলোকদিগকে যৎ-পরোনাস্তি অপমানিত করিতেছে; সর্ব্ব প্রথমে এই ভণ্ডপণ্ডিতের যথোচিত শাস্তি হওয়া আবশ্যক; এই নরাধমের সমুচিত দণ্ড না হ'লে আমাদের গ্রামের কলঙ্ক ঘোষিত হইবে।" এইরূপ অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর পরামর্শ স্থির হইল যে, ভণ্ডকে যথাযোগ্য দণ্ড দেওয়াই বিধেয়। গ্রামে সুবল দাস নামে এক ধূর্ত্ত নাপিত বাস করিত, সেও সভায় উপস্থিত ছিল। সুবল দাস, তালুকদারকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কর্ত্তা! যদি আমার প্রতি হুকুম হয়, তাহা হইলে ভণ্ড বেটাকে এমন জব্দ কোরে দিতে পারি যে, সমস্ত জীবনে

সে আর কখনও এই গ্রামে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে না। আমি চির-দিনের জন্য তাহাকে দাগী করিয়া দিতে পারি।" তাহার কথায় সকলে সম্মত হইল, কিন্তু তালুকদার বলিল "দেখিস্ যেন নরহত্যা না হয়, তা হ'লে আবার পুলিসের হাঙ্গামায় পোড়্‌তে হবে।" অবশেষে এই কথাই স্থির হওয়ায় সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

পর দিবস অপরাহ্ণে সুবলদাস এক খানি ধুতি পরিয়া এবং একখানি নামা-বলী দ্বারা দেহ আবরণ করিয়া, মুচিপাড়ায় গমন পূর্ব্বক ভণ্ড গুরুর সম্মুখে উপ-বেশন পূর্ব্বক কহিল "ঠাকুর গো! আপনার রাঙ্গা পায়ে লক্ষ লক্ষ প্রণাম, আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূর্ত্তি।" হলধর কহিল "বাছা! তোমার জয় হোক্। তোমাকে অতি ভাল লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। কি মনে করে আসা হয়েছে বল দেখি?" সুবল কহিল "গুরুদেব! কেবল মহাশয়ের শ্রীচরণ যুগল রূপ স্পর্শমণি স্পর্শ কোরে আমার চিত্তলোহকে ভক্তিস্বর্ণ করবার জন্যই এখানে এসেছি।" এবম্প্রকার কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া শ্রীমান সুবল দাস তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আস্তে আস্তে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক এক পা করিয়া সে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে, নামাবলী হাতে লইয়া, তাহার কোণে (খুঁটে) কি বাধিতে লাগিল, আবার তাহা খুলিল, আবার বাঁধিল, আবার খুলিল; ইত্যাদি প্রকারে পুনঃ পুনঃ খুলিতে খুলিতে ও বাঁধিতে বাঁধিতে গমন করায় দুইজন মুচি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সুবলকে জিজ্ঞাসা করিল "নাপিত খুড়ো! তোমার নামাবলীর খুঁটে ওটা কি?" সুবল বলিল "বাপুহে! এই অদ্ভুত জিনিষে তোমাদের কোনও প্রয়োজন সাধিত হইবে না, এই দেবদুর্ল্লভ পদার্থ বহুভাগ্যবলে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত হইলেও অত্যন্ত গোপ-নীয়।" মুচিরা আরও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিল "খুড়ো গো! এটা কি তা কহিতেই হবে।" নাপিত বলিল "বাপুহে! ইহা বল্‌বার কথা নয়। কিন্তু তোমরা আমার পরমবন্ধু, বিশেষতঃ তোমরা আমাকে ভালবাস, এই জন্য গোপনে তোমাদিগকে ব্যক্ত করিতে পারি, কিন্তু দেখিও অন্য কাহারও কাছে যেন ইহা প্রকাশিত না হয়।" অতঃপর একটু দূরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া চুপি চুপি কহিল "ভাইরে! তোমাদের গুরুদেবকে তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই, ইনি স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান। তোমরা উহাঁকে কেবল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়াই জান, কিন্তু আমি উহাঁর যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে উহাঁকে ভগবান বলিয়াই বোধ হয়।" মুচিরা বলিল "খুড়ো! বিস্ময়ের বিষয় এই যে,

আমরা উহার এত সেবা শুশ্রূষা করিলাম,কিন্তু তথাপি উনি আমাদিগের সমীপে স্বকীয় খাস্ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু অল্পক্ষণের আলাপে উনি উহাঁর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি তোমাকে দেখাইলেন এবং তোমাকে অদ্ভুত পদার্থ দান করিলেন।” নাপিত কহিল “বাপু হে, ভাগ্য বিনা কিছুই মিলে না।” যাহা হউক, অতঃপর ঐ অদ্ভুত পদার্থ সম্বন্ধে সুবল দাস যাহা কহিল,তাহা এই—“বাপু হে! গুরুদেবের মাথায়, হাতে, পায়ে, গায়ে, যে সকল চুল আছে,তাহা অপূর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ। তাঁহার এক গাছি রোম (রোঁয়া) কিম্বা এক গাছি চুল লইয়া যদি কেহ মাদুলীতে পূরিয়া তাহা গলায় অথবা হাতে পরিধান করে তাহা হইলে তাহার সাত পুরুষ পর্য্যন্ত মূর্খ বা দরিদ্র হয় না এবং তাহার দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহারও রোগ, শোক, বিপদ বা ভয় থাকে না।” এই কথা কহিয়া যুবক চলিয়া গেল। এদিকে মুচিদ্বয় তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতিদিগকে ডাকাইয়া সুবলের কথা ব্যক্ত করিল। সকলেই সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসিল। পর দিবস মধ্যাহ্ন কালে আহারের অল্প ক্ষণ পরে মুচি-গুরু হলধর মাদুরোপরে শয়ন করিয়া দিবানিদ্রার সুখ সম্ভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে প্রায় চারি শত মুচি তাহার নিকটে বসিয়া তাহার দেহকে জোরে ধারণ পূর্ব্বক মাথার, পায়ের, হাতের, বুকের চুল ছিঁড়িতে প্রবৃত্ত হইল। যে ব্যক্তি চুল পাইল না, সে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল “আমি পাই নাই, আমি পাই নাই।” মুচিরা তাহার সর্ব্বশরীরের লোম পর্য্যন্ত ছিঁড়িতে বাকী রাখিল না, কারণ সেখানে অসংখ্য মুচি, সুতরাং সকলেরই জন্য অন্ততঃ এক গাছাও চুল চাই! দেখিতে দেখিতে হলধরের সর্ব্ব শরীর রক্তে ডুবিয়া গেল, তথাপি সকলের ভাগ্যে রোঁ মিলিল না। কেহ কেহ নাকের ও কাণের এবং কেহ বা ভ্রূ স্থানের ও গোপনীয় অংশের রোঁ ছিঁড়িতে লাগিল। রক্তে সর্ব্ব স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। হলধরের ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইতে লাগিল। বেদনায় সর্ব্ব শরীর ভিস্তির মশকের মত ফুলিয়া উঠিল।

উত্তমরূপে চুল ও রোঁ ছিঁড়িয়া লইয়া মুচীরা হলধরকে ছাড়িয়া দিল। হলধর প্রাণভয়ে দৌড়িয়া গিয়া একটা পুকুরের জলে দেহ নিমজ্জন করিয়া অসহ্য বেদনা হইতে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। তদনন্তর উত্তমরূপে কোমরের কাপড় কষিয়া যখন দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন নাপিত-কুলশেখর সুবল দাসকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল “বাপু হে! কাণে ও নাকে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও এই গ্রামে আমি প্রবেশ করিব না।

আমার যেমন কর্ম্ম, ঠিক তেমনি ফল হোয়েছে।” এই কথা কহিয়া, প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীমান হলধর পণ্ডিত, একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল, সেই অবধি আর তাহার সমাচার পাওয়া যায় নাই।

অশোক ও তুনতুন্

যে সকল সুতীক্ষ্ণ অক্ষমান এবং উদার চেতস্মান পণ্ডিত পুরুষ খৃষ্ট ধর্ম্মের উৎপত্তি, উন্নতি, প্রচার, প্রপ্রথা ও প্রকীর্ণতার ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পৃথিবীর কোনও প্রাচীন, প্রখ্যাত, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সমৃদ্ধিশালী বা সমুন্নত জাতি অথবা জনপদ, খ্রীষ্টধর্ম্মকে গ্রহণ, পালন বা অবলম্বন করিয়া যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরপুত্রত্ব সমর্থন করেন নাই। যে প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও পরাক্রমী য়ীহুদি জাতি হইতে ঈশা উদ্ভুত হইয়া ছিলেন; সেই সমৃদ্ধিশালী য়ীহুদি জাতি যীশুখ্রীষ্টকে স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, এবং স্বধর্ম্মাপলাপকারী স্থির করিয়া তাঁহাকে শূলোপরি স্থাপন পূর্ব্বক নিহত করিয়াছিল। প্রাচীন য়ীহুদি, প্রখ্যাত পারস্য, বিক্রমী আরব, স্বদেশমদমত্ত মিসর, গর্ব্বিত গ্রীশ, রণপ্রিয় রোমক, কলাবিদ্যাধিকারী কোরিশ বংশ, ইহাদের কেহই ইস্রাইলের ঈশা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। সনাতন হিন্দু যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তিব্বত ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি খ্রীষ্টিয় প্রভাবের সীমায় অবস্থিত ছিল না। সেমিটিক্ য়ীহুদি ও আর্য্য হিন্দু যেমন শাশ্বত ছিল, এখনও তেমনি আছে; মিশর এখন মুসলমানে সমাচ্ছন্ন; পারস্য, আরব্য ও তুরস্ক প্রভৃতি ইস্লামের উপাসক; সুতরাং এ কথা অবিসম্বাদীরূপে বলা যায়, দরিদ্র অশিক্ষিত অসভ্য ও অনুন্নত জাতিগণের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, উন্নত, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত জাতিবর্গের উপরে ইহা তাহার সহস্রাংশের এক অংশও বিস্তার করিতে পারে নাই।

আমেরিকা ও ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম যখন প্রকীর্ণ হইয়াছিল, তখন এই সকল জনপদ অত্যন্ত অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিবৃন্দ কর্তৃক নিবসিত ছিল। বাস্তবিক অনুন্নত বা ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি ও অসভ্য জাতির জন্যই যীশুর আবির্ভাব; যীশু নিজেই কহিয়াছেন—I have come to call the sinners to righ-

teousness. I have come for the sick and not for the whole who need no physicians. "আমি পাপী-তাপীর জন্যই আসিয়াছি, উন্নত বা ধার্ম্মিক-পুরুষের জন্য আসি নাই।" যীশুর সমস্ত জীবন দরিদ্র, কলুষিত ও অশিক্ষিতের সঙ্গেই যাপিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীমৎ সাধু পল (St. Paul) লিখিয়াছেন,—

"Not many wise, not many prudent, not many high, are called by the Lord, but the low, the abject, the neglected, the cast-out and the lost and the sinners are called by Christ." অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীভুক্ত বা বিদ্যাবিভবসমন্বিত জনগণকে খ্রীষ্ট আহ্বান করেন না, পরন্তু নিম্নশ্রেণীর পরিত্যক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্যই যীশু আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর কোনও সভ্য জনপদ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিয়া "খৃষ্টান দেশ" (Christian country) মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, পরন্তু আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইউরোপ প্রভৃতির ন্যায় বহুল প্রাচীন অসভ্য জনপদ খ্রীষ্টান দেশমধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে। কোনও মুসলমান, হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ বা অগ্নিউপাসক পার্সী প্রদেশ একেবারে "খ্রীষ্টান" হয় নাই। কিন্তু অনেক খ্রীষ্টীয় রাজ্য একেবারে মুসলমান রাজ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে, এমন দেখা যায়। সে কথা পরে বিবৃত হইবে; ইহাতে বুঝা গেল, ইস্রাইলের ঈশা এবং তাঁহার ধর্ম্ম, নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত যেমন সম্পর্কীভূত, উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তেমন হয় নাই। প্রচারক পল (St. Paul) যখন গ্রীশে গমন করেন, তখন তদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বাক্যকল্পতরু (Talkative Babbler) আখ্যায় উপহাস করিয়াছিলেন; রোমকেরা যীশুর কথা সমূহকে সুরাপানমত্ত মানবের অর্থশূন্য প্রলাপ বলিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। পন্তিয়শ পাইলট নামে যে শাসনকর্ত্তা যীশুখ্রীষ্টের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তিনি রোমক ছিলেন।

পাঠক মহাশয়েরা খ্রীষ্টধর্ম্মেতিহাস হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া যদি বৌদ্ধেতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, খ্রীষ্টের ও বুদ্ধের প্রচার প্রথা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। নীচ জাতি ও নীচ ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য। উচ্চ ব্যক্তি ও উন্নত জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা বুদ্ধের উদ্দেশ্য। সামান্য এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিকে ধর্ম্মজ্ঞান দিয়া চরিত্রবান ও ঈশ্বরভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানী করা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য; আর পাণ্ডিত্যাভিমানী তার্কিক পুরুষের গর্ব্ব খর্ব্ব করা বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য। চীন, সিংহল, শ্যাম,

তিৰ্ব্বত,আনাম,যাবা প্রভৃতি দেশে যখন বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল না তখন এই সকল দেশ বিক্রম, বিভব, ধন, ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, সুশিক্ষা, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতায় সমুন্নত ছিল। খ্রীষ্টান ধৰ্ম্মের যাহা রীতি ও নীতি, তাহা নিম্ন জাতির বা সামান্যাবস্থার লোকের পক্ষে সহজায়ত্ত, বুদ্ধের রীতি ও নীতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন তার্কিকের পক্ষেই প্রশস্ত। বৌদ্ধশাস্ত্র শরীরের রক্ত, মাংস, অস্থি ও কঙ্কাল হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত, কেবল এই শাস্ত্রশরীরের নূতন হৃদয় বুদ্ধের নিজের। বৌদ্ধধৰ্ম্ম হিন্দুধৰ্ম্মের অন্যতম শাখা (offshoot) রূপে উৎপন্ন হইয়াও ইহা চিরকাল বেদ ও ব্রাহ্মণের বিদ্বেষী। খ্রীষ্টধৰ্ম্ম য়ীহুদির শাস্ত্র ও ধৰ্ম্মের শাখা বটে, কিন্তু ইহার হৃদয় নূতন। বৌদ্ধধৰ্ম্ম হিন্দুধৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াও ইহা "ধৰ্ম্ম" বলিয়া কখন গণ্য হয় নাই। বুদ্ধের মতকে "বিজ্ঞান" বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা "ধৰ্ম্ম" নহে—Budhism may be, and truly it is a philosophy—even of the grandest possible type —but not a Religion. বৌদ্ধমতকে সাধারণ বিজ্ঞান বা বিশেষ বিজ্ঞান বল ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহা "ধৰ্ম্ম" নহে, কারণ ধৰ্ম্মের যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, রীতি, নীতি, ভাব ও লক্ষণ থাকে, বৌদ্ধ মতে তাহা নাই। একজন লেখক লিখিয়াছেন,A national religion is good but a rational religion is better and grander ; বৌদ্ধধৰ্ম্ম national এবং rational ইহাদের কাহারও সীমার মধ্যে নাই। যে প্রথায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব, পরলোক, পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ, জন্মান্তর, অদৃষ্ট, কৰ্ম্ম, প্রভৃতি হইতে মানব হৃদয়কে স্বতন্ত্র করে, সে প্রথাটা কি কখনও ধৰ্ম্মপ্রথা বলিয়া সাধু সমাজে গণনীয় হইতে পারে ?

হিন্দুধৰ্ম্ম হইতে যেমন বৌদ্ধমতের সৃষ্টি, য়ীহুদি হইতে তেমন খ্রীষ্টমতের উৎপত্তি। বৌদ্ধ মত হিন্দুর বিরোধী, খ্রীষ্টমত য়ীহুদির বিরোধী। বুদ্ধদেব যীশু খ্রীষ্টের পঞ্চশতাধিক বৎসর কাল পূৰ্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধের অনেক মত, অনেক কথা, অনেক নীতি, অসংখ্য উপদেশ, খ্রীষ্ট শাস্ত্রে ও খ্রীষ্টধৰ্ম্মে প্রকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধের জীবনের অনেক প্রধান ঘটনা ও প্রধান উক্তি, খ্রীষ্টের জীবনের অনেক প্রধান ঘটনা ও প্রধান উক্তির সমতুল্য, কিন্তু তাহা হইলেও মৌলিকতত্ত্বে বৌদ্ধধৰ্ম্ম এবং খ্রীষ্টানধৰ্ম্ম এতদুভয়ে পরস্পর জলস্থলবৎ প্রভেদ। খ্রীষ্টধৰ্ম্ম ঈশ্বরবাদী, হতভাগ্য বৌদ্ধমত নিরীশ্বর।

পরিজ্ঞাত পৃথিবীর ধৰ্ম্মেতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই,

কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নিজের চেষ্টা ও যত্নে কোনও ধর্ম্ম প্রকীর্ণ হইতে পারে নাই। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এতদুভয়ের নব মত প্রচার জন্য দুইজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতির সহিত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। যে দুইজন নরপতির অনিত অধ্যবসায়, অজস্র অর্থব্যয় এবং বিবিধ প্রকার সাহায্যে উভয় ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল,তাঁহাদের একের নাম অশোক, অপরের নাম তুন্‌তুন্‌। ইউরোপীয় ইতিহাসে নরপতি তুন্‌তুন্‌,কনষ্টান্‌টাইন (Emperor Constantine) নামে প্রখ্যাত। ইঁহার প্রকৃত আদি নাম তুন্‌তুন্‌, আরব্য ভাষায় ও প্রাচীন আরব্য গ্রন্থে এবং তুর্কী ভাষায় ইনি তুন্‌তুন্‌ নামেই প্রসিদ্ধ। ইনি রোমক বংশ সম্ভূত ছিলেন ; ইউরোপ ইঁহার নিকটেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য ঋণী। ইঁহার শাসন সময়ে তুরস্ক দেশ বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক নিবসিত ছিল। কিন্তু তুরস্কের জলবায়ুর উৎকৃষ্টতা, ফলফুলের প্রচুরতা, প্রাকৃতিক শোভার মনোহারীতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ইনি তুরস্কান্তর্গত একটি নগরে স্বনামে রাজধানী স্থাপন করেন, উহার ইংরাজী নাম কনষ্টান্টিনোপল, প্রকৃত আদি নাম তুন্‌তুনিয়া। আরব্য ভাষায় ইহার পর্য্যায় তান্‌তানি, পারস্য ভাষায় এস্‌তাম্‌পোল, তুর্কী ভাষায় ইস্তাম্বুল এবং গ্রীক ভাষায় ইহা এস্‌টাম্‌পলাস্‌ নামে পরিচিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্মরক্ষক ইস্তাম্বুলের রোমক সম্রাট তুন্‌তুনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মরক্ষক রাজা অশোকের জীবন অতি আশ্চর্য্য প্রকার তুলনায় সম্পর্কীভূত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নরপতির জীবনের সমতুল্যতা দেখাইতে আকাঙ্ক্ষা করি। রাজা অশোক, রাজগৃহ গিরির পার্শ্ববর্ত্তী জনপদে রাজ্য রক্ষাকারী সমরকুশল ক্ষত্রিয়বর্গে ও বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট তুন্‌তুন্‌ (Emperor Constantine) ভেলেশিয়া গিরি প্রান্তরে টাসেলপল্লী মধ্যে এক প্রাচীন বীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, উভয়ের জন্মদিনে ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং উভয়েই নিশীথ কালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

সম্রাট তুন্‌তুন্‌ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র বর্ব্বর তুরস্ককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ; ক্রমে ক্রমে তুরস্ক একটি প্রধান খ্রীষ্টান রাজ্যে পরিণত হয়। অবশেষে মুসলমানেরা প্রবল পরাক্রমী হইয়া তুরস্ক জয় করতঃ ঐ দেশ মধ্যস্থিত সমুদয় খ্রীষ্টানকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া দেয় এবং স্বল্পকালমধ্যে সমগ্র তুরস্ককে মুসলমান রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এখন সেখানে খ্রীষ্টানত্বের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। * রাজা অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র মগধকে বৌদ্ধমতাবলম্বী

---

* মুসলমানেরা এইরূপে খ্রীষ্টানপ্রধান মিসর (Alexandria), কায়রো,

করিয়াছিলেন; কাল প্রভাবে হিন্দুপ্রভাব প্রবলভাবে প্রকীর্ণ হইয়া সমস্ত মগধদেশকে পুনরায় হিন্দুরাজ্যে পরিণত করে। এখন সমগ্র বিহার হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী জনগণে পরিপূর্ণ, সেখানে বৌদ্ধের রাজ্য বা বসতি নাই।

সেনাপতি ডাইয়ক্লীশীয়ানের তৃতীয় পুত্র তুন্‌তুন্, চন্দ্রগুপ্তের তৃতীয় অপত্যের নাম অশোক। ডাইয়ক্লীশীয়ান পুরাতন "নভস্‌ক্" নামক নবাগত জাতিকে দূরীভূত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকগণকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মগধ হস্তগত করেন। তুনতুনের মাতা হোটেলের প্রধানা পরিচারিকা ছিলেন, অশোকের মাতা জাতিতে নাপিতকন্যা ছিলেন। গল্ দেশে গিয়া তুন্‌তুন্ রোমাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তদনন্তর মাকশেটীয়সকে নিহত করিয়া তাহার মুকুট হরণ করেন; রাজা অশোক উজ্জয়িনী নগরে গমন পূর্ব্বক পাটলীপুত্রাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তথাকার নরপতির বহুমূল্যবান হীরক-খচিত স্বর্ণ কিরিট করায়ত্ত করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশোপরি মৃত্যুর স্বপ্ন দর্শন করিয়া তুন্‌তুন্ খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। পালী ভাষায় লিখিত বহুল বৌদ্ধেতিহাসে পাঠ করা যায় যে, নিদ্রাবস্থায় রাজা অশোক বুদ্ধকে শূন্য দেশে স্বর্ণ সিংহাসনে মহাগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার শরণাগত হয়েন। নাইশীনগরীতে সমগ্র খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদিগকে সমবেত করিয়া সম্রাট তুন্‌তুন্ এক জগদ্বিখ্যাত মহাসভার অধিবেশন করিয়াছিলেন, * রাজা অশোক পাটলী-পুত্র নগরে তদ্রূপ এক দরবার করেন।

তুনতুনের প্রথমা পত্নীর গর্ভে যে সন্তানোৎপাদন হয়, তাহার নাম ক্রশ্‌পশ্। প্রথমা পত্নীর বিয়োগে তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন, এই দ্বিতীয়া পত্নীর সহিত ক্রশ্‌পশের গুপ্ত প্রণয় জন্মে; সম্রাট তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রের মস্তক ছেদনের অনুজ্ঞা দেন। অশোকের প্রথমা পত্নীর পুত্রের নাম কুনল; কুনল অত্যন্ত সুন্দরদেহ ছিল, বিমাতা তাহার প্রণয়াকাঙ্খিণী হইলে কুনল তাহা

মার্ভ, গজনি, আফগানিস্থানের কিয়দংশ, আসিয়া মাইনরের অধিকাংশ, স্পেনের কিয়দংশ প্রভৃতি অনেক জনপদকে খ্রীষ্টরাজ্য ও খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া একেবারে ইসলাম জনপদে পরিণত করিয়াছে। মৎপ্রণীত "Yogi and His Message" নামক ইংরাজী পুস্তক দেখুন——লেখক।

* খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, এই মহাসভায় ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।---লেখক।

অস্বীকার করে, অবশেষে রাজা অশোক ইহা জানিতে পারিয়া দ্বিতীয়া পত্নীকে জীবিতাবস্থায় অগ্নিতে দাহ করিবার আজ্ঞা দেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তুন্‌তুন্‌ রোম পরিত্যাগ করেন এবং প্রধান পুরোহিতকে (পোপ্‌কে) রাজ্য শাসন জন্য প্রধান উপদেশক নিযুক্ত করেন। বৃদ্ধাবস্থায় রাজা অশোক তাহাই করিয়াছিলেন। সমুদয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদিগকে আহ্বান করিয়া, অশোক যাহা কহিয়াছিলেন, জনৈক ইংলণ্ডবাসী সুকবি তাহার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদটি সঠিক হওয়ায় তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"This earth encinctured by its sapphire zone,
This earth, bedecked with gleaming jewels rare,
This earth, of hills the everlasting throne,
This earth, of all creation mother fair
I give to the assembly"

এইরূপে আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, রাজা অশোক ও সম্রাট তুন্‌তুনের জীবনে অতীব আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল বটে কিন্তু প্রকৃতিতে ও ফলে একতা ছিল না। বুদ্ধ যে নবীন মত প্রচার করিয়াছিলেন সেই মতের অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহার মনোমধ্যে যে ধারণা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল সেই ধারণা ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অশোক যথার্থ "দেবত্বে" পৌঁছিয়াছিলেন কিন্তু christianity did not elevate Constantine, but on the other hand Constantine elevated christianity খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তুন্‌তুন উন্নত হন নাই পরন্তু তুন্‌তুনের আশ্রয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম উন্নত হইয়াছিল। কনষ্টানটাইন যে সকল দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা এক্ষণে ঘোরতর সাংসারিকতায় পরিপূর্ণ; বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোকের প্রভাবময় দেশসমূহ সাত্ত্বিক ভাবে উন্নত। দৃষ্টান্তরূপে বর্ত্তমান তুন্‌তুনের চরিত্র অপেক্ষা অশোকের চরিত্র শতগুণে বিমলতর ও অনুকরণযোগ্য। জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লিপিকুশল, চিন্তাশীল এবং আসাধারণ পণ্ডিত-লেখক জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, We can find no Christian sovereign worthy to be compared with King Asoka খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কোনও নরপতি, রাজা অশোকের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। আমিও প্রবন্ধের উপসংহারে এই নিরপেক্ষ লেখকের সহিত একমত হইয়া কহিতে পারি, প্রাচীন ভারতের সনাতন হিন্দু-কুলোৎপন্ন ভূমিপদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সমকক্ষ হইবার যথাযোগ্য সময়, খ্রীষ্টান বংশে এখনও আইসে নাই।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

অভিমতাবলী।

OPINIONS AND APPRECIATIONS,

অসংখ্য অভিমতের মধ্যে কয়েকটিমাত্র সন্নিবিষ্ট হইল। প্রকাশক। দিক্‌-দিকন্তবিশ্রুতনামা, স্বদেশহিতৈষী, অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,বি, এ; আই, সি, এস, মহোদয় তাঁহার ভুবনবিখ্যাত ইংরাজি "বেঙ্গলী" সম্বাদপত্রে ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলীর প্রথমখণ্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—(The "Bengalee," 26th July, 1903.)

"We have been reading the first volume of the Bengalee Essays of Swami Dharmananda Mahavarati. These essays originally appeared in various magazines and we think the Swamijee has been well adviced in reprinting them in a collected form. They embrace a wide range and variety of subjects such as history, biography, philosophy, philology, theology, literature and travels. Every page of the book breathes that spirit of pure patriotism and is characterised by that deep reading and high thinking which the Bengali world has learnt to associate with the nane of the venerable author. It is a book which must be read by every educated Bengali, for its perusal will not only make one a wiser man but also a better and happier man. The Venerable Swamiji has travelled over Europe, Africa, America, Australia, Japan, Siam, China, Persia, Turkey, Ceylon, Burma, Affganistan, Egypt and many other countries. He is learued in most of the languages of the hermispheres. He has himself acquired certain power upon which he loves to dwell in introducing to his readers, some of the saintly characters he has come across in his wanderings over the wide world. One rises from a persual of this book with a weird sensation as if he had glimpses of the world lying beyond the human ken. It is a remarkable book but the man is perhaps more remarkable than his work."

যশোহর মিউনিসিপ্যালীটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান এবং সেই দিকবিগন্ত

বিশ্রুত নামা উকিল, লেখক, পণ্ডিত ও জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার "হিন্দুপত্রিকা"য়, ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। (১৩১০ সালের মাঘ মাসের হিন্দুপত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।) "ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।" প্রথম খণ্ড। এই গ্রন্থের প্রণেতা মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। পরিব্রাজক মহাভারতী মহোদয় একজন অসাধারণ পুরুষ। স্বদেশে—বিদেশে—তাঁহার কর্ম্মজীবন সমভাবে সমাদৃত। ভারতের আর্য্যশাস্ত্রের গভীর গবেষণা এবং পাশ্চাত্যের নবপ্রতিভাময়ী প্রণোদনা, এই উভয়ের অপূর্ব্ব-সমাবেশে তাঁহার জীবন, এক মহত্ত্বের নিলয়, এবং তাঁহার জ্ঞান,এক বহুদর্শনের বিকাশস্বরূপ হইতে পারিয়াছে। মাসিকপত্রের পাঠক মাত্রেই এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষের পরিচয় অবগত আছেন, এবং ইহাঁর ওজস্বিনী তত্ত্বভারগুর্ব্বী লেখনীর প্রসাদে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করিতে পারিয়াছেন। বহু মাসিক পত্রিকায় সুদীর্ঘকাল—ইনি যে সকল স্বদেশ বিদেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সুফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির অশেষ উপকার সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারই কতকগুলি এই প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার বৃহৎ। বিষয়গুলিও গুরুতর। এই পুস্তক পাঠে অনেক অভিজ্ঞতার অধীশ্বর হওয়া যায়। "হিন্দুশব্দতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ, মহাভারতী মহোদয়ের অতুল প্রতিভার অমূল্য সৃষ্টি। ইহাতে ১৯টী প্রবন্ধ আছে। এই সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি বহুভাষায় অনুবাদিত হইয়া, এবং ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূরদেশে প্রমাণিকরূপে আদৃত হইয়া অপূর্ব্ব গৌরব প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্গে কি এ রত্নের আদর হইবে না? আমরা আশা করি, প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু বঙ্গবাসী ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন। এই পুস্তকের প্রচার প্রার্থনীয়। "অনুসন্ধান" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখুন—আমরা শ্রীযুক্ত মহাভারতীর মহাশয়ের ১ম খণ্ড প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলাম, "এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া শোভার ভাণ্ডার সৃষ্টি হইল।" দ্বিতীয় খণ্ড দেখিয়াও বুঝিতেছি, এই গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে মুকুটমণি মধ্যে স্থান পাইবে। পাণ্ডিত্য, গবেষণা অনুসন্ধিৎসা, সর্ব্ব বিষয়েই গ্রন্থখানি সাহিত্যের সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটীই অভিনবতত্ত্বে পূর্ণ। কিছু না কিছু নূতনতত্ত্ব—কিছু না কিছু শিক্ষনীয় বিষয়—সকলটীর মধ্যেই প্রতক্ষী-

ভুত। দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকার মহাশয় তরঙ্গবেগে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন,—অথচ তাহারই মধ্যে মণি—মাণিক্য দ্যুতি প্রতিভাত হইতেছে। গ্রন্থকার অশেষ শক্তিশালী পুরুষ। তাঁহার রচনা পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় আকর্ষণী শক্তিবিশিষ্ট,অথচ জ্ঞানদানে দর্শন—ইতিহাসের সমকক্ষ। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" ঘরে ঘরে পঠিত হইবার যোগ্য। আমরা উহার বহুল প্রচার কামনা করি। (অনুসন্ধান ২৯ শ্রাবণ। ১৩১১)

"সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থ সম্বন্ধে ভুবন বিখ্যাত "বেঙ্গলী" সমাচার পত্র লিখিয়াছেন :—The Bengalee, 24 February, 1904.

"Swami Dharmananda Mahavarati's" "Siddhanta Samudra" is just out. The task which the swami has undertaken is a stupendous one, but it must be admitted that he is eminently qualified for it by his uncommonly vast eruidion and his liberal sympathies."

বিশ্ববিখ্যাত "অমৃতবাজার" পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

"Siddhanta Samudra" Vols. I, II, III, IV, V. and VI respectively, by Swami Dharmananda Mahavarati. This is a complete social history of Hindu castes and subcastes with enthnolgical accounts of several tribes and Puranic accounts of religious sects of the Hindus. The work is unique in its character and when complete is likely to be a valuable addition to the Bengali language and litarature. It supplies a great social desideratum and we expect that the publication will be well received by the public. Every page of the book is an unassailable proof of Swami Mahavarati's profound learning, varied researches, deep study, extensive experiences and indefatigable labors. The first volume gives a complete social history of the Gopes, the Sadgopes, the Kaibartas and the Gandhabaniks. The volumes under review contain eleborate social accounts of Soobarnabaniks, the Baruis, the Vaidyas, the Telis, the Tamoolis, the Moyras (confectioners) the Oograkhatrias or the Agooris, and also Sahas. In the succeeding volumes the auther intends to publish a complete history of the Brahmins, the Kaysthas and various other Hindu castes. All the volumes are highly interesting and we

are of opinion that they are a safe guide to the Hindu public of Bengal on matters social and ethnological. In these days of caste agitation and revival of Puranic Dharma, a book like the "Siddhanta Samudra" is a real gain to the Hindu society. (Amrita Bazar Parika. 15 September, 1904.)

সিদ্ধান্তসমুদ্র সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। একাধারে অনন্ত-গুণের সমাবেশ মহাভারতী মহোদয়ে প্রচুর রূপেই প্রতিভাত হয়। বহুদেশ ভ্রমন বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু বিষয়ে পরিচিন্তন, বহু লোকসহ আলাপ, সম্ভাষণ প্রভৃতি হইতে তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ তিনি দয়া করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃতই বঙ্গ-সাহিত্যের উপকার করিতেছেন। তাঁহার সুধামধুর আলাপে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি বৃন্দ যেরূপ সন্তুষ্ট, তাঁহার গবেষণা পূর্ণ বিবিধ বৈচিত্রময় প্রবন্ধ সমূহ পাঠে পাঠকগণ প্রকৃতই পরম প্রীতিলাভ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি অতি সুন্দর কাগজে, মূল্যবান মলাটে এবং শুশোভন অক্ষরে সিদ্ধান্তসমুদ্র নামক বৃহদায়তন গ্রন্থের কয়েক খণ্ড প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সমুদ্র. বঙ্গ দেশবাপী সমুদয় হিন্দু জাতির পুরাতন ও আধুনিক সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস; ইহাতে ব্রহ্মকুলোদ্ভূত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে অস্পৃশ্য অন্তজ জাতিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই শাস্ত্রীয়, সামাজিক, ঐতি-হাসিক ও রাজনৈতিক বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহুল গ্রন্থ পাঠ, বহু স্থান ভ্রমণ এবং বহু চিন্তা করিয়া এই বিপুলাকার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার আদ্যন্ত বিবিধ নূতন, চিন্তাশীল, জ্ঞানময় এবং গবেষণাময় বিবরণে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমুদ্র অতীব উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। জাতিতত্ব বলিয়া এক- খানি উপযুক্ত গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে এখনও কোন কৃতী লেখক দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। মহাভারতী মহোদয়ের চেষ্টায় এই অভাব নিরাকরণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা। ৭ই আশ্বিন। ১৩১০ সাল)

"মুক্তমাধব" নাটক সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ হিতবাদী সম্পাদকের মত। মুক্ত-মাধব—প্রণেতা বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। প্রণেতা বহুদর্শী বিচক্ষণ ও ধর্ম্মা-নুশীলন ব্রতী। গ্রন্থকারের বহুদর্শিতার ফলস্বরূপ বিবিধ তত্ত্ব ও ধর্ম্মোপদেশ

নাটকাকারে বিবৃত। নীতি-শিক্ষা-দানের জন্য মহাভারতী মহাশয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, নাটকচ্ছলে তিনি সেই মহানীতি শিখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। হিতবাদী। ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১১।

সিমুলতলা হইতে জগদ্বিখ্যাত অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,"প্রিয় মহাশয়! আপনার মুক্তমাধব নাটক অতীব মনোযোগ সহ পাঠ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহারা নাটক পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ চিত্ত হইতেছেন।"

"অনুসন্ধান"পত্র সম্পাদক মহাশয় ১৩১১ সালের ১৮ই ভাদ্রের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মুক্তমাধব নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন। আজি কালি কলিকাতা এবং মফঃস্বলে পিউরিটি সোসাইটি (সুনীতি সভা) প্রভৃতি কর্ত্তৃক থিয়েটারের বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে এই প্রকার ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ ধর্ম্মনীতিময় মনোদ নাটকের প্রণয়ন, প্রচার ও অভিনয় সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। নাটকখানি আদ্যন্ত আধ্যাত্ম তত্ত্বে পরিপূর্ণ। অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া প্রবীণ মহাভারতী মহাশয় এই নাটকখানি বিরচন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কলিকাতা ও মফঃস্বলের রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ এই অভিনব সুন্দর নাটক খানি পাঠ ও অভিনয় করিয়া দেখিবেন!" সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার অভিমত।—

Dharmananda Mahavarati needs but little introduction at our hands, for he is too well known to the public. He is a devout Vaishnava, a man of great erudition and force of character. It is therefore natural that a book from his facile pen can not but be useful and interesting, as the book under notice is. "Mukta Madhab" is a dramatic record of the glorious triumph of virtue over vice, and the wonderful conversion of hardened sinners, atheists, misers and rioters into peaceful citizens, pious saints and faithful worshippers of the living and loving God. The delineation of different character of the different types of humanity is almost perfect, and we are quite charmed with the characters of Sanyasi, his boy disciple aod the Goswami. which. we err not, is a true reflection of that of the author himself. Every one ought to have a copy of the book and read and tudy it for his benefit. (Amrita Bazar Patrika.)

"সুপণ্ডিত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় যেরূপ গবেষণা পূর্ণ বিষয় সমূহের আলোচনা করেন, তাহাতে তিনি এইরূপ একখানি সুখপাঠ্য নাটক লিখিয়াছেন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এই নাটক পাঠে নিতান্ত সুখী হইয়াছি।" ইন্দিরা। ভাদ্র ১৩১২। স্বামীজি প্রণীত "Yogi and Message" নামক ইংরাজী পুস্তক সম্বন্ধে কে কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন।

৯৩। "The Yogi and his Message is an interesting little Book by Swami Dharmananda Mahavarati * * It is a curious sign of the times that lectures on such subjects should have been delivered by an orthodox Hindu,and there is very much in them that will be useful in quarters where Christian literature does not usually penetrate. Ths author is full of enthusiasm for the charcter of Christ, and no Christian could surpass the admiration with which he speaks of the Bible; it is evident from this book that the author knows a great deal about Christianity.'—The Epiphany 30 July' 1904.

৯৪। "The book is admirable, remarkable and splendid. The author is a well known speaker, a voluminous writer and a great traveller of vast acumen and experience. The swami has the merit of speaking out everything boldly and correctly. He has read and studied a dood deal of Christian literature. He quotes the holy Bibie with great accuracy and adroitness.–Bombay Catholic Examiner 16 July, and 30 July 1904.

৯৫। "Swami Dharmananda Mahavarati is an authority among Hindoos; he tells us much in this little volume which may be made of great use to missionaries in dealing with Hindoos and Mahomedans. It is profitable for us to look at these things from the standpoint of a learned Hindu, and we advise those who have to do with all classes of native Christians to read this intersting little book."—Indian Witness, Calcutta 11 August 1904.

৯৬। "The Yogi and his Message is the title of a remarkable little booh we have received. The book contains a reprint of two lectuers delivered by Swami Dharmananda Mahvarati. The lectures are very inspring to read. Unoffensfve, sweet and Majestic the sentiments so beautifully expressed in the lectures appeal to the higher self of the man. The reader

feels himself elevated and he closes the book a better and a wiser man. Swami Dharmananda Mahavarati is a great scholar, and a profoundly religious man. This small book deserves to be widely read. We have read the book with very great delight."—Madras Standard 14 July, 1904.

৯৭। "The Yogi and his Message" is an intersting little book, as throwing light upon the working of an acute Hindu mind brought into contact with Western ideas, while trammelled by an apparently real devotion on the contemplative side of Hindooism. * * The Swami is an educated man and his life is a life of action."—Indian Standard, (Ajmere, Rajputana) September, 1904.

This is a remarkable little pamphlet by an orthodox Hidoo and learned Sannyasi. The writer (Swami Dharmananda Mahavarati) is a man of desp learning possessing a most intimate aquaintance with the Christian as well as other sacred scriptures, and having travelled through many countries the Swami possesses a rich store of knowledge and experience which he happily brings to bear on his treatment of his subjects. Both the lectures in the pamphlet are extremely interesting and worth careful persual by both Hindoos and Christians." Christian Patriot Madras 30 July 1904.

These lectures are well worth reading by all."—The Baptist Missionary Review, Madras, August, 1904.

"This little book has been causing a great stir in the religious world of India. Singularly oriental in its setting it is doing remarkable service in this country. * * The author is a learned writer. He has travelled widely and has mixed with all classes of persons and religions. There is much in the lectures that must appeal to the Hindoo mind. The lecturer is evidently a man in close touch with the religious thought and progress of India."—Bombay Guardian. 13 August, 1904 and 27 august 1904.

Extract from a letter from (the eldest son of Sir Justice Chandro Madhav, Judge, High Court, Calcutta) The Honorable Baboo Jogendro Chandra Ghose, M. A., B. L., Pleader, High Court, and Honorary Secretary to the Scientific and

Industrial Association—"I read your (Swami's) articles with much interest and I am one of your greatest admirers."

Extract from a letter from the manager of the Amrita Bazar Patrika dated the 16, september, 1905 "your letters in the patrika are always read with more than ordinary interest."

"It is said that a chair of Hindu Philosophy has been established in the university of Cambridge. He would be the real teacher of Hindu Philosophy who would be fit to discharge the functions of a *Guru*. He must teach his doctrines from the Hindu stand point, explain the assumptions according the purposes of the philosophy, and seek to inclucate the art of practising it. Baba Srimat Dharmananda Mahavarati, if he cared to be a lecturer, would have been a competent lecturer."—Indian Nation. "The first number of the monthly under review contains some very learned articles from such eminent writers as Pundit Dharmananda Mahavarati and others."—Bengalee 10th October, 1903.

"I have known him (Swami Dharmananda) for a long period during which I do not remember to have heard a couple of words from him to which I could take exception."—Sir Colonel Trevor, C. S. I. Agent to the Governor General (Rajputana.) "We are glad to appreciate Swami Dharmananda Mahavarati's undoubted Intellectual and spiritual merits through his book the Yogi and His Message :—(Theosophist. October. 1904.)

"Swami Dharmananda Mahavarati's articles are a rate attraction,"—Indian nation, 16 June, 1902. "Swami. Dhar mananda hardly touches a religious topic without illumina ting it for the popular readers. He is a scholar of singulary wide learning,gread profoundity in thought,and a real insight into the mind of ancient Indian sages'—Indian Nation. 2nd June, 1902.

"Swami Dharmananda is a man of vast information. He studied Mahomedanism with the reverence of a Mahomedan and accepted all the good that it contained. In the same manner, he benefitted himself by a deep study of Christianity.—A.B. Patrika. 12 December 1904."Swami Dnarmananda Mahavarati is an authority among Hindoos.—Indian witness. Calcutta 11 August of 1904. "Swami Dharmananda has travelled widely in various Parts of the world and is well known for his extensive linguistic and theological attainments—A. B. Patrika. 15 September, 1904. "The name of Swami Dharmananda has much authority among Hindoos—Fpiphany, 19 March of 1904. বিলাতের টাইম্‌স্‌ পত্র হইতে উদ্ধৃত।

Extract from an article on the progress of Christianity in India, contributed by Lord Radstock to the"Times"(London)

"During the course of my travels in India in last cold weather I visited a remarkable Hiudu ascetic inBengal by name Swami Dharmananda Mahavaratee. He had a large number of disciples from among the highest classes, including Magistrates, Law-years, Judges, Zemindars, Merchants and Scholars. He learnt Hebrew and Greek in order to read the Bible in original, he learnt Arabic to read the Koran, he travelled in Europe, spent a long time in Rome, went to Constantinople, and from thence to Arabia, China, Japan, Australia, Ceylon and many other countries of great historical interest. He believes that Jesus Christ was a Mahapooroosh and he has very ably proved the Messiaship of Christ in his excellent and interesting English book entitled the "Yogi and His Message". The Swami expressed to me his opinion that India owed her modern civilization and her modern education to the Christian Missionaries. Such a testimoney to the excellency of Lord Jesus Christ from an orthodox Hindu Sannyasi of profound learing, deep thought, and of such high birth, that Brahmans take a low place before him, and who has in an amulet the dusts of two hundred and thirty holy places in India in which he has been a pilgrim, can not fail to awaken a yet deeper inquiry among the twenty crores of Hindus in India, and is an evidence of how profound is the impression of the truth of Christian faith made by the present condition of Christianity in India, * * We had large meetings in the Callcutta Town Hall in which eighteen hundred Christians— English, Eurasian, American, Bengalis—from the Lieutenant Governor to the humblest native Christian, all joined in the prayer and silent worship closing with hymns. In prominent place was the learned Swami Dharmananda, close by the Lieutenant Governor of Bengal, who seemed to have been moved. Race distinctions and denominational diversity of method were all forgotten and all merged as they sat under the same banner "We are all one in God."

বামড়া রাজ্যের অধিপতি মহামান্ত মহারাজা সার সুচন্দ দেও, কে, সি,এস, আই বাহাদুর এবং তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতপ্রবর মহাশয়গণ লিখিয়াছেন—"শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ পরিব্রাজকণা নানা শাস্ত্রেরভ্যঃ সঙ্কলয্য নানা প্রমাণানি যদেতং সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত সমুদ্রং তদেত মীমাংসাসুগতয়া সমীচীন মস্মাকং প্রতিভাতি। বহুলি গ্রন্থাণ্যালোচ্য সঙ্কলিত মিদম্ সিদ্ধান্ত সমুদ্রম্ অতীবোপাদেয়তরং'।

"স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় উদার প্রকৃতির লোক। ইনি একদেশদর্শী নহেন; ইহাঁর কথাগুলি সকলেরই মনেযোগ সহকারে চিন্তা করা উচিত।" আরতি। শ্রাবণ। ১৩০৯।

"স্বামী ধর্ম্মানন্দ প্রকৃষ্ট পাণ্ডিত্যশালী পুরুষ এবং বহু বিদ্যা, বহু শাস্ত্র ও বহু বহুভাষায় অভিজ্ঞ, জাতিতত্ত্বে তিনি অদ্বিতীয়; তিনি ঋষিতুল্য পুরুষ"।—নববিকাশ (ঢাকা)।

পূর্ব্ব বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ও লেখক এবং জয়দেবপুর রাজএষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "আপনার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া থাকি।" (পত্রের তারিখ ১০ নবেম্বর ১৯০৫)।

কলিকাতা বহুবাজারের বিখ্যাত জমিদার বাবু অক্রুর দত্তের বংশধর এবং সাবিত্রি-লাইব্রেরির লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বদেশ নামক সাপ্তাহিক সমাচার পত্রে আপনার লিখিত বৃন্দাবনের তরুবর শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে বিমোহিত হইয়াছি। গ্রীষ্মকালে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া লোকে যেরূপ স্নিগ্ধ হয় সেইরূপ স্নিগ্ধ হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র আয়তনের প্রবন্ধের মধ্যে আপনি এক ভাব আনিয়াছেন, যাহা ভাবিতে ভাবিতে আপনার উদ্দেশে কোটি প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। শত বক্তৃতায় যে কাজ না হইয়াছে আপনার প্রবন্ধ তাহা অপেক্ষা অধিক কাজ করিবে।" পত্রের তারিখ ১লা পৌষ। ১৩১২। অক্রুর দত্তের গলি, কলিকাতা।

কলিকাতার ভারতবিখ্যাত সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, মহাশয় ১৯০৫ অব্দের ৩রা আগষ্ট তারিখে স্বহস্তে লিখিয়াছেন—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিবেদন। আপনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির যেরূপ সাহায্য করিতেছেন তাহাতে আপনি সমগ্র বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন। আপনি দেশহিতার্থে যে মহৎব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আপনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আপনার ন্যায় সাহিত্য-গৌরব পুরুষ আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের এত সেবা করেন, ইহা দেশের পক্ষে গৌরব-জনক। পূর্ব্বতন সময় হইলে এজন্য আপনাকে রাজবৃত্তি প্রদত্ত হইত।" শ্রীযুক্ত "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সমাচার পত্রে লিখিয়াছেন—"আমরা শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়কে ঋষিতুল্য লোক বলিয়া জানি। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক।"

"বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" নামক পুস্তক সম্বন্ধে কে কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন।—কলিকাতার শ্রীযুক্ত "সময়" সম্পাদক মহাশয় ১৩১৩ সালের ১লা চৈত্র তারিখে উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন—"বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ পুস্তক পাঠ করিয়া

অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়। লেখক মহাশয় অনেক পুস্তকের প্রণেতা। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থ ভবিষ্য ইতিহাস রচনার পক্ষে সহায়তা প্রদান করিবে। * * * * শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধ সকল মধ্যে যেরূপ নূতন ও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সমুদয় পাওয়া যায় অপর কাহারও রচনায় তাহা দেখি না।"

বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ—মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। মহাভারতী মহাশয় একজন স্বনাম ধন্য মহাপুরুষ। দেশ বিদেশে মহাভারতী মহাশয়ের সমান আদর। আর্য্য-শাস্ত্রে ইঁহার ব্যুৎপত্তি অসীম। স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে ইনি পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও কম জ্ঞানলাভ করেন নাই। মহাভারতী মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি যে কতদূর বলবতী,বর্ত্তমান "বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই অসাধারণ পুরুষের পরিচয় মাসিকপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মহাভারতী মহাশয় বহুদিনের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের দ্বারা এই "বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সমস্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা ও রাণীগণের বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় জানিতে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে আমরা তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি"। মানভূম। ৭ই ফাল্গুন। ১৩১৩।

বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ ;—বঙ্গদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ রাজা, মহারাজা রাণী ও মহারাণীগণের ইতিহাস। পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক ৪৭টী রাজবংশের ইতিহাস আছে। এজন্য ইহা ইতিহাস প্রিয় পাঠকগণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজাগণের কীর্ত্তি মেখলায় বঙ্গদেশ সমলঙ্কৃত, প্রায় তাঁহাদের সকলেরই জীবন-কথা ইহাতে পরিলক্ষিত হইল। পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নাটক নভেল অপেক্ষা অধিক আমোদপ্রদ বোধ হয়। পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে মহার্হ রত্নস্বরূপ হইয়াছে। বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত নর নারীকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি"। পল্লীবাসী। (কালনা) ২৭শে চৈত্র ১৩১৩।

বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত।মহাভারতী মহশেয়ের লেখনী বঙ্গে সুপরিচিত। এই পুস্তকের সূচনায় মহাভারতী মহাশয় আপনার পুস্তককে ভাবী জাতীয় ইতিহাসের সোপান মাত্র বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকে ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যতীত পাঠোপযোগী বহু বিষয় সন্নি-

বেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজবংশেরই একটী একটী ইতিহাস আছে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেক মহানুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের রাজনৈতিক বা বৈষয়িক ঘটনা সমূহ ছায়া দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা অনেক সময় অমূল্যরত্ন বলিয়া বোধ হয়। এই পুস্তকে এ সমস্ত কথার যতদূর সম্ভব সমাবেশ হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে অনেক পড়িবার বিষয় আছে"। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭।

১৩১৩ সালের ২৯শে মাঘ তারিখের "নীহার" পত্রিকা লিখিয়াছেন—বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক পরিব্রাজক সন্নাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় এই পুস্তকখানির প্রণেতা। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজা ও রাণী মহারাণীগণের ইতিবৃত্ত সুন্দর জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। মহাভারতী মহোদয় বহু আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া অনেক অনুসন্ধান ও চেষ্টা দ্বারা নানাস্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রত্নতত্ত্ব সমুদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, মহাভারতী মহোদয়ের গভীর গবেষণায় তাঁহাদের বংশবলীও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে সাধারণে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। পুস্তকখানি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। যাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের পূর্ব্বাপর অবস্থা ও প্রাচীন বৃত্তান্ত অবগত হইতে বাসনা করেন তাঁহারা এই পুস্কখানি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন। পুস্তকখানি বহুল প্রাচীন জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ রহিয়াছে। পরিব্রাজক মহাভারতী মহোদয় একজন অসাধারণ পুরুষ। তিনি নানা-স্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নানা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রভূত কল্যাণ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাঁর কর্ম্মময় জীবন স্বদেশে বিদেশে সমভাবেই সমাদৃত। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই এই স্বনামধন্য পুরুষের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং ইঁহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। ইঁহার সুলেখনী-প্রসূত পুস্তকও যে সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। মহাভারতী মহোদয় কাটিয়াবাড়ি প্রদেশের গহন অরণ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে মহর্ষির নিকট জ্ঞানোপদেশ পাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি সেই পরমারাধ্য মহা-

পুরুষের উদ্দেশে ভক্তি সহকারে উৎসর্গ করিয়াছেন।" ১৩১৩ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখের বীরভূম হিতৈষী হইতে উদ্ধৃত। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত—এই গ্রন্থে মহাভারতী মহাশয় বঙ্গের ৪৭টী রাজা বা মহারাজা উপাধিধারী ব্রাহ্মণ রাজ বংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রাচীন জমিদার বংশাবলীর ইতিহাস, তাঁহাদের পারিবারিক কিম্বদন্তি, আচার পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইলে কালে তাহা হইতে জাতীয় ইতিহাসের বিবরণ সংগৃহীত করিবার আশা থাকে। সুতরাং মহাভারতী মহাশয় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বহু অনুসন্ধান, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি অর্থ সাপেক্ষ। এ বিষয়ে মহাভারতী মহাশয় অগ্রণী ; সুতরাং তাঁহাকে পদে পদে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য বঙ্গভাষা সমূহ ঋণী রহিবে।" লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। ইহাতে সর্ব্ব শুদ্ধ সাত চল্লিশটি রাজ-বংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে লেখককে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তা ইহা হইতে যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন। পুস্তকখানি প্রকৃত সময়োপযোগী হইয়াছে"। যশোহর পত্র। ১৭ই মাঘ। ১,৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ (শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী বিরচিত) শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তিনি এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট শ্রমশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সাতচল্লিসটী ব্রাহ্মণ রাজা ও জমিদারবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ ভূস্বামিগণের বংশ পরিচয় জানিতে প্রয়াসী তাঁহারা এই পুস্তক হইতে বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। অনেক গ্রন্থের মূল্যও বেশী নহে, একটাকা মাত্র"। খুলনাবাসী। ২৬শে মাঘ। ১৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ—অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক রাজা মহারাজা রাণী ও মহারাণীদিগের ইতিহাস। প্রণেতা শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। কলিকাতা ২০১ নং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশে মুসলমান শাসন সময়ে যে সকল দেশোজ্জলকারী হিন্দু রাজা ও রাণীগণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান কালে মহামান্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সকল ব্যক্তি বিদ্যাবত্তা, সাহস, ধনবল অথবা পরোপকার জন্য রাজা কিংবা মহারাজা উপাধি

প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত, বংশের উৎপত্তি, ইতিহাস এবং তৎসঙ্গে পুণ্যময়ী কীর্ত্তিমালার বিস্তৃত বিবৃতি লিপিবদ্ধ আছে। আমরা যতদূর জানি বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে ইহাই সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। বহু পরিশ্রম, অনুসন্ধান এবং নানাবিধ পুরাতন কাগজপত্র পাঠ করিয়া গ্রন্থকার ইহা প্রচার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, পাঠকগণ এই সুপরিচিত গ্রন্থকারের নবীন পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এবং সাহিত্যজিবী গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইহার এক একখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন"। স্বদেশ। ২১শে মাঘ। ১৩১৩। শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় অনেক শ্রমস্বীকার করতঃ বঙ্গদেশের বর্ত্তমান এবং বিলুপ্তপ্রায় ৪৭টী রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা সরল ও সুবোধ্য। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে বিশেষ সহায় হইবে। আশা করি গ্রন্থ খানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। তমালিকা। ২রা চৈত্র। ১৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এই গ্রন্থের প্রণেতা। পরিব্রাজক মহাভারতী মহোদয়ের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুবিদিত। ইনি ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, উপন্যাস, জীবনচরিত, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইহাঁর লিখিবার শক্তিও যথেষ্ট আছে। বহু দেশ দর্শন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু বিষয়ে পরিচিন্তন, এবং বহু লোক সহ আলাপ,—সম্ভাষণ করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই ফলে বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজ বংশের সৃষ্টি। গ্রন্থকার বঙ্গদেশীয় ৪৭ জন প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ রাজা, মহারাজা, রাণী ও মহারাণীর বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া টীকা, টিপ্‌পনীও আছে। অনেক অনুসন্ধান, চেষ্টা, অর্থব্যয়, পরিশ্রম সাবধানতা এবং অনেক প্রকার পুস্তক ও কাগজ পত্রাদি পাঠ, নানা স্থানে ভ্রমণ এবং বহুবিধ সংশয় ছেদনের পর যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নব্য পাঠকগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, বহুদর্শী ও পরিশ্রম পরায়ণ মহাভারতী মহোদয়ের গভীর গবেষণা পূর্ণ বিবিধ বৈচিত্র ময় প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিয়া আমরা যেমন প্রীতিলাভ করি ; বঙ্গীয় প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ বংশের পরিচয় পাঠ করিয়াও তেমনই সুখী হইতে পারিয়াছি। এই পুস্তকের প্রচার প্রার্থণীয়"। রত্নাকর। ২৩শে চৈত্র। ১৩১৩। ব্রাহ্মণ রাজবংশ। ইহার প্রণেতা স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তক খানিতে বঙ্গদেশীয় সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজা রাণী মহারাণীদিগের ইতিহাস সংগ্রহে ভারতী মহাশয় বিশেষরূপঃক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য ভারতী মহাশয় সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের বিবরণ অবগত হইতে অভিলাষ করেন তাঁহারা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। হাওড়া হিতৈষী। ২৯শে মাঘ। ১৩১৩। "বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় প্রণীত। প্রাচীন কালাবধি এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজা ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত উপাধিতে সমলঙ্কৃত,মহাভারতী মহাশয়ের এই পুস্তকে সেই সকল বংশের বিবরণ বিশেষ সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ণনাগুলি সুখপাঠ্য ও বিশদ হইয়াছে। এই পুস্তকে ৪৭টী রাজবংশের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ মহাভারতী মহাশয় প্রত্যেক রাজবংশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আলোচ্য পুস্তকে সুচারু রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম"। জন্মভূমি (মাসিক পত্রিকা) মাঘ, ১৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ—শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। পুস্তক খানিতে বঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ রাজা, মহারাজা, রাণী ও মহারাণীদিগের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আজি কালি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ইতিবৃত্ত পাঠ করিবার জন্য সমাধিক আগ্রহান্বিত, বিশেষতঃ দেশের যাঁহারা স্তম্ভস্বরূপ সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের পুণ্য কাহিনী শুনিতে সকলেই সমুৎসুক। শ্রীযুত মহাভারতী মহোদয় নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গের বাহিরে ও ভিতরে ছোট বড় যে সকল রাজ পরিবার আছেন সকলেরই প্রাচীন আধুনিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া পুস্তক খানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যে সকল মহাত্মা প্রাচীন কালে নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে কত বিষয় বৈভব অর্জ্জন করিয়া জগতে কত সংকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। এই প্রকারের পুস্তক যতই প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে। যখন এই প্রকারের ইতিবৃত্ত পুস্তক বহুলভাবে লিখিত হইতে আরম্ভ হইবে তখন বুঝা যাইবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গঠন আরম্ভ হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল। প্রসূন (কাটোয়া) ৬ই বৈশাখ। ১৩১৪।

অভিমতাবলী সমাপ্ত।